


প্রথম প্রকাশ

আষাঢ় ১৩৬৩

প্রকাশক

বামাচরণ মুখোপাধ্যায়

করুণা প্রকাশনী

১৮এ, টেমার লেন,

কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর

শ্রীঅনিলকুমার ঘোষ

দি অশোক প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

২০১এ, বিধান সরণী

কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ শিল্পী : মদন সরকার

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত

ত্রিশ টাকা

আমার সমস্ত প্রিয়জনকে

যাঁরা আছেন যাঁরা নেই

—নমিতা বসু মজুমদার

# ভূমিকা

সবশিল্পীই সার্থকনামা নন। তবু তাঁরা শিল্পী; শিল্পের প্রতি এক-বুক ভালোবাসা। এই উপন্যাসের নায়িকা বনানী রায়চৌধুরি সার্থকনামা লেখিকা হতে হতেও হলেন না। ছোট বয়েস থেকেই চারপাশে ছড়ানো বাধার পাথর। তবু কোন এক আকুল বাসনায় ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে পাথর ভাঙছিল ছোট্ট মেয়েটি। ছোট্ট ঝর্নার মত। তার তিনসঙ্গী। একসঙ্গী মা, একসঙ্গী প্রকৃতি, আর এক সঙ্গী বই। তিন সঙ্গীই চেয়েছিল: ছোট্ট ঝর্না, নদী হোক, সাগর হোক।

বেণু বনানী হল। এলো বন্ধুরা এলো নারী সমস্যা, সমাজ-সমস্যা, তার আপন আত্মিক সংকট। ইতিমধ্যে বেশ কিছু লিখেছে সে। এলো প্রেম। সেই সময়ও এলো—মন্বন্তর, দাঙ্গা, স্বাধীনতার আনন্দর সঙ্গেই দেশবিভাগের বুকভাঙা ব্যথা একযোগে যে মেয়েটি নদী হয়ে উঠছিল হঠাৎ একরাশ মরুবালুতে গেল হারিয়ে।

চুল যখন শ্বেত; বুকে অসম্ভব আগুন জ্বলল। এত আগুন চাপা ছিল জানা ছিল না। বনানী রায়চৌধুরির বুকের মধ্যে হারানো নদীর তৃষ্ণা। কেন থেমে গিয়েছিল? সে কি সত্তা? সে কি নিরাশা? সাহিত্যের হিমালয় সদৃশ রূপকল্পনার কাছে নিজেকে ক্ষুদ্র অদ্রি ভাবা? না, সময়কে চিনতে না পারা। আগুনজ্বালা বেদনাতেই বনানী রায়চৌধুরির আত্মস্মৃতিচারণ।

আঙ্গিক: বনানী রায়চৌধুরি, উত্তর প্রজন্মের দুই নারী পুরুষ, জার্নালিষ্ট তথাগত, সমালোচিকা-পাঠিকা ঋতাবরী, তিনের ত্রিবেণী। আর সকলেই রয়ে গেছে বনানী রায়চৌধুরির জীবনে।

লেখিকার অন্য বই :

হংসবলাকা ( ছোট গল্প )

তবু প্রেম, তবু প্রাণ ( কবিতা )

রবীন্দ্রনাথ, শান্তিনিকেতন, আমি-আমরা ( স্মৃতিচারণ )

# জার্নালিস্ট-উক্তি

## এক

আত্মস্মৃতিচারণ, যাকে বলে অটো-বায়োগ্রাফী, এই পাণ্ডুলিপি ঠিক্ তাই কিনা বলতে পারব না। ডায়ারীও নয়। লেখিকাকে যতটুকু জেনেছি। মনে হয়েছে, বাস্তব পরিবেশে মেশাতে চেয়েছেন রি-ক্রিয়েশন। বাস্তব পরিবেশ সম্পর্ক অবহিত থেকেও লরেন্স যাকে বলেছেন create dangerously, সেই ডেঞ্জারাস ইচ্ছাতেই। এমন কমপ্লেক্স চরিত্রের পঞ্চাশ উত্তীর্ণ মহিলা খুব বেশী দেখিনি। জার্নালিস্ট হিসেবে যেসব লেখিকা, কর্মী, শিল্পী মহিলাদের সঙ্গে মেলামেশা, তাঁরা সমকালের। তাঁদের চিনি, বুঝি, অনুভব করতে পারি। ওঁকে আমি পুরো চিনি না, বুঝিও না। তবু অনুভব করি আশ্চর্য-আকর্ষণ। একটা কথা বুঝেছি, ওঁর অবিরাম প্রয়াস। Struggle for aesthetic existence, স্ব-জটিলতা সম্পর্কে সচেতনা। জটিলতার জালসমূহকে একটা প্যাটার্ন দেবার : সমস্ত এলানো-ছড়ানো। ইতস্তত বিচ্ছিন্ন খণ্ডসমূহ। কোনো একসূত্রে গেঁথে তোলবার প্রাণপণ প্রয়াস, যখনি দেখেছি, ঠেকেছে অচেনা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষের বেশ কয়েকবছর পরে আমার জন্ম। জটিলতার জালসমূহই আমার বাস্তব পরিবেশ। অনেক মস্তিষ্ক, হৃদয় খরচ করেও কোনো এক সিম্পল ইকোয়েশনে আমার জীবনকে সহজ, সরল করে তুলতে পারব না। জটিলতার জালে জড়িয়েই কোনো কোনো প্রাপ্তির দিকে আমাকে হাত বাড়াতে হবে। বিচ্ছিন্নতার বেদনায় ব্যথিত-বেদন সময় বইয়ে দেবার মত সময় আমাদের হাতে নেই।

অথচ আশ্চর্য বিচ্ছিন্ন খণ্ডসমূহের লবণাক্ত উত্তাল তরঙ্গে বেদনার্ত নারীটিকে কখনো মনে হয়নি অভিনয়-নিপুণতা অথবা বুদ্ধিহীন পীড়ায়

আক্রান্ত। জীবনকে অখণ্ডে গেঁথে তোলবার প্রয়াসকে মনে হয়েছে রিয়্যাল। এই ধারণাটি ওঁকে দেখেই উদ্ভূত। তার আগে আমি এই সব শব্দ এবং শব্দগত ভাব, রূপ, নিয়ে মাথা ঘামাইনি। কতবার উচ্চারণ করেছেন ভৈরবী-মীড়ে, বেহাগ-বেদনায়, কখনো উদাত্ত-মন্ত্রোচ্চাণের উচ্চকিত উচ্চারণে।

উচ্চারণের বেদনায়, সবচেয়ে বেশী সততায় ( কী আশ্চর্য। বিশ শতকের শেষ দশকগুলিতে দাঁড়িয়ে আমি, আমিও প্রগাঢ় উচ্চারণ করলাম ; "সততা" আমাদের এই ভয়ংকর বিচলিত যুগ, একি তার বুকের ভেতরকার সুরটিকে বিনষ্ট করেনি ? করেনি পঙ্কিল, পিচ্ছিল অথবা রক্তাক্ত। না, এই সব শব্দ কখনো হারায় না, কখনো হয় না মৃত। কিছুদিনের মত নিহত মনে হলেও মৃত্যুর শবস্তূপ ঠেলে দেখা দেয়। দেখা দেয় তার জীবনে **for whom the bell tolls.** এই শব্দগুলির মধ্যে কোথায় যেন থেকে যায় রেসারেকসানের ইংগিত ), আমিও কখন একটু একটু ওর খণ্ড-অখণ্ডের শরিক হয়ে পড়ি, জানতে পারি না।

কখনো মনে হয়েছে, লেখিকা প্রধানত কবি। শব্দে নিটোল মায়া, প্রতীকে গভীরতা এনে দেবার প্রয়াস টলটলে স্বচ্ছ জলের আকাঙ্ক্ষার মত। জল শব্দটিকে বড়ো বেশী ভালোবেসেছেন। ন্যস্ত করেছেন বিশ্বাস। ব্যবহার করেছেন টোনের বহুবিধ ধাপগুলি। জলের গভীর, জল-গহন, হালকা জল, জলধারা, জলকালো, জলের আলো, নিহত-জল। জল ঝিরিঝিরি, ঝরোঝরো, ঝম্‌ঝম্‌। জলবিন্দু, জল-সিন্ধু, জল—জল—জল। বিশ শতকের ভয়ংকর রক্তমাখা যুগে স্নাত হবার প্রয়োজন বুঝেছেন সবচেয়ে বেশী।

কখনো মনে হয়েছে Socio-political-conditionএ দারুণ ইনটারেস্ট। তখন বদ্ধমুঠি দৃঢ়। আবার মনে হয়েছে, মানুষের সভ্যতার ভাঁড়ারে জমানো তিল তিল, হাজার হাজার বছরের, কখনো মিশরের, মহেঞ্জোদড়োর, গ্রীসের, ইতালীর, ভিন্ন ভিন্ন ঘর, ভিন্ন ভিন্ন স্বরের সমুখে সুনম্রা, কিশোরী-অনুরাগী। এই মুগ্ধ অনুরাগই তাঁকে

পথ হাঁটায় অতীত-মায়ায়, বর্তমানের সুখবেদনায়, দুখবেদনায়। ভবিষ্যতের শঙ্কিত, কম্পিত আশায়। প্রেমের করুণ কোমলতামাখা মানুষটির সঙ্গে দৃঢ়বদ্ধ মুঠির মানুষটির মিল, টপ্পা-ঠুংরীর মিল নয়, ধ্রুপদ-টপ্পার মিল।

কখনো সামাজিক। সাজানো বৈঠক। কবিতা, গান, হাসি-আলাপ, চা-কফি। ঝলমলে আলো। কখনো অন্ধকার। জ্বলছে না আলো। হাসি-গান, ধূমায়িত পেয়ালা, পেয়ালার ঠুন্‌ঠুন্ শব্দ, কিছুই নেই। চুপ করে বসে নিরন্ধ্র-অন্ধকারে। একটু একটু করে উঠে আসছে অন্ধকার। পায়ের তলা থেকে, মুখের চারপাশ থেকে, বুকের গভীর থেকে। মুড়ে ধরছে বিষণ্ন-বিষাদ।

একটা কথা না বললে অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। শুনেছি, ভেরিয়ার এলউইনের আত্মজীবনী যেন প্রশান্ত হেমন্ত-হ্রদ। সেই বই পড়বার সুযোগ হয়নি। দেখেছি চিল্কাকে হেমন্ত-সূর্যাস্তে। হঠাৎ একদিন ওঁকে দেখে মনে পড়েছিল, সূর্যাস্তের গোধূলি আলোয় মাখা চিল্কাকে। মনে হয়েছিল, বহু বেদনা, বহু ব্যর্থতা সত্ত্বেও হেমন্ত-হ্রদ-প্রশান্তি নেমেছে তাঁর অস্তিত্বে। পুঞ্জ পুঞ্জ অন্ধকার, ব্যর্থতার, বেদনার, অনেক পিছনে ফেলে রেখে এই মুহূর্তে বসে আছেন একটি স্বর্ণালি সিল্যুট-ফ্রীজে।

একটুও ঢেউ উঠছে না জলে, একটিও পাতা ঝরছে না, একটুও কাঁপছে না তাঁর জল।

## দুই

বিশ শতকের বিশবছরের বেশী পার করে দিয়ে বনানী রায় চৌধুরীর জন্ম। অতীত-মায়া তাঁকে অনেক পথ হাঁটিয়েছিল। জীবনানন্দীয় মোটিফে নন, হন নি ক্লান্তপ্রাণ, চারদিকে তখনো ঘিরে ধরে নি সমুদ্র-সফেন। উনিশ শতকের বাঙলা প্রদীপশিখায় আলোকিত

করেছিল অ্যাডোলেসেন্স। এগারো-বারোতেই পড়তে শুরু করেছেন, রামমোহন, বিদ্যাসাগর, ডিরোজিও এবং ইয়ংবেঙ্গল। সে সময়ের প্রিয় বই "রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ।" চোদ্দ বছরেই স্থিরীকৃত তিনচরিত্র ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির পুরোধারূপে। তাঁর জীবনে সমগ্র স্মৃতি, সত্তা ও ভবিষ্যৎ জুড়ে রইলেন এই ত্রয়ী: রামমোহন, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ।

১৯৩৯ পর্যন্ত স্থির আলোর কাল। আঠারো বছরের জলাশয়ে ঢেউ লাগলেও উন্মাদ-উত্তাল হয় নি জলরাশি। তাঁর অভিজ্ঞতায় বিক্ষিপ্ত বিশশতক হানা দিলো দ্বিতীয় মহাযুদ্ধশেষের কালোবাজারে, পঞ্চাশের মন্বন্তরে, রক্তাক্ত দ্বিখণ্ডিত বাঙলায়। হঠাৎ আলোর ঝলকানির মতই ঝল্‌মল্‌ করে এলো স্বাধীনতা। সঙ্গে উদ্বাস্তু। আরো উদ্বাস্তু। আরো অগণিত অসংখ্য দিনের উদ্বাস্তু। দীর্ঘ-প্রলম্ব-চলমানতা। এপার-ওপার দুই-বাংলাতেই। ছিন্নমূল মানুষগুলি অসহায়। অসহায়তার সঙ্গে জোড় মিলিয়ে এলো শয়তান পাপ। জোচ্চুরি পাপ, জালিয়াতি পাপ, নষ্ট-চরিত্র-শয়তান-পাপ। কালো বাজারের রাশি রাশি কালো টাকা, কালো শকুনডানায় হাটে, মাঠে, গঞ্জে, বাজারে, ঘরের ছাদে, কার্নিশে, জানলার আলসেয়। ডিম পেড়ে পেড়ে ছেয়ে ধরল। বনানী রায় চৌধুরীর কিশোর কালের প্রত্যয়, কৈশোরে অর্জিত নন্দনবোধ, খণ্ড, টুকরো হয়ে গেল। ঝোড়ো রাতের অন্ধকারে তাঁর উনিশ-শতকী-শুভবুদ্ধির আলো পথ দেখায় না। শুধু পথ হাতড়ায়। অসহায় বনানী ভাবেন: এবার কি থেমে যাবেন? না, এখনো আছে অনুসন্ধান?

এই সময় তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয়। পরিচয় যখন গভীর। একদিন বললেন: তথাগত, মনে হয় এখনো নিঃশেষ হই নি। এই বইখানি আমাকে এখনো সান্ত্বনা দিয়েছে। ছোট বই, মেরুন-মলাট দিলেন আমার হাতে:

—পড়ে দেখো।

পড়েছিলাম। অসাধারণ বই। নাম: Burning conscience

লেখক Claude Eatherly—Brighter than thousand Suns আর Children of Ashes-এর লেখক রবার্ট য়ুঙ্ক-এর লেখা ফোরওয়ার্ড। বাট্রাণ্ড রাসেলের ভূমিকা। পড়ে মনে হল, জীবন-ধারণায় নতুন একমাত্রার সংযোজন ঘটল।

তর্কচ্ছলে বলেছি :

—আমাদের এই সময়টাকে আপনি ভালোবাসেন না। বিশ্বাস করেন না।

—না—না। বিচলিত।—ঠিক্‌মতো বোঝাতে পারব না। আমি কখনো বলব না—আমার কৈশোর-যৌবনের কালটাতেই ছিল পরম প্রাপ্তি। আমি জানি, সময়মাত্রই ব্যথা-জর্জর। অপ্রাপ্তির তীরবিদ্ধ। সবসময়ের তাই উচ্চারণ : আরো চাই, আরো কিছু।

স্মিত হেসেছিলেন :

—একটা কথা বলব তোমায়। ভালোবাসা যদি বা সহজ, understanding সহজ নয়। ঠিক বুঝে উঠতে পারিনে তোমাদের এই সময়টাকে। কখনো মনে হয়, অনেক পেয়েছ তোমরা, কখনো মনে হয় একটা আত্মঘাতী পাগলামিও আছে। একটা instance দিই। তোমাকে ঠিক বুঝি এখন বলতে পারব না। কিন্তু, তুমি এলে এত ভালো লাগে। ঠিক্ এমনি হোত, যখন আমার ছেলে আসত আমার কাছে।

বুকের মধ্যে থম্‌থমে গলা। ওঁর ছেলেটি মৃত সতর্ক উচ্চারণ করলাম :

—তাকে তো চিনতেন।

—পাগল! অদ্ভুত হাসলেন : ভালো করে চেনবার আগেই সে ক্রুদ্ধ, রাগী হয়ে গেছে। Angry young man আঠারো বছরের দুঃসহ-যৌবন। কামনা করছি, কল্পনা করছি দুঃসাহসের গৌরবে-জ্বলবে—সে হানা দিচ্ছে mad houseএ, এল. এস্. ডি. মারিজুয়ানায় আচ্ছন্ন।

চুপ করে আছি। উনিই কথা বলুন।

—আমার মেয়ে, ষোলো বছর বয়েস, সেই বয়েসেই কোথায়

চলে চলে যেত। আমি তাকে খুঁজে ফিরতাম এক ডিসকোথে থেকে আর এক ডিস্‌কোথে। কতজনকে জিজ্ঞাসা করেছি : আমার মেয়েকে দেখেছ? ষোলো বছর বয়েস, এখনো অপাপবিদ্ধতার আভাস ঘিরে আছে তার মুখকে। তারা হেসেছে।

ক্ষণকাল স্তব্ধ। স্তব্ধতা ভেঙে বললেন :

—ভালোবাসা যত সুন্দরই হোক, একটি ফুলমাত্র। আকার, রঙ, পেলবতা, লাবণ্য, সুগন্ধ। কিন্তু, সে ঝরে যায়, ঝরে খসে যায়। ভালোবাসাকে ফলে পরিণত করতে পারে **understanding**, করতে পারে বীজবহ, বৃক্ষ। সেই সুসংবদ্ধ সংবেদনা ছাড়া ভালোবাসা যে কত ব্যর্থ, আমি জেনেছি।

আমি জানি, ওঁর ছেলে কোনো এক ঝগড়ায় মৃত। মেয়েটি ষোলোতেই পালিয়েছে। আমার বোন ঋতাবরীর অভিমত অন্য। বলে :—কিছু জানো না তুমি। মহিলার কোনো ছেলেমেয়েই হয়নি। এটা ওঁর সিম্বলিজম।

একদিন বলেছিলাম : আধুনিক মানসের পুঞ্জীভূত চঞ্চলতাকেও রূপ দিতে পারেন।

পরের দিনই এনে দিলেন কবিতা।

নিহত জল

জল দাও না কেন শিকড়ে?
অভিযোগ প্রত্যুত্তরে তখনি জানায়
দেয়া দায়, স্বচ্ছ জল কোথাও তো নেই
এবং এবম্বিধ প্রয়াসেই বিষণ্ণ নিঃশ্বাস।
সে আমারো জানা।
স্বচ্ছ জলের নিশানা নেই প্রায়।

জীবন পবিত্র জানি। পঙ্কোদ্ভব হলেও।
ভয়ংকর অগ্নিগিরি। অরুন্তুদ লাভা-সমারোহ
শিকড়ের মন্ত্রজপা :—জল।

জল কোথায়? গহন-গভীর জলশব্দ?

মায়াজালের মায়া, চকমকি খেল,
হাতের কারসাজি। লাগ্ ভেলকি লাগ্
অজস্র শব্দ-স্রোত-ধারা। অথচ
তৃষ্ণা মেটানো দায়।

রাশিকৃত অবিশ্বাসে বিশ্বাস ন্যস্ত করতে রাজী নন। চিন্তার ভিতরে, চিত্তের ভেতরে, বিশ্বাসের মধ্যে কোথাও রয়ে গেছে পুনরুত্থান-সঞ্জীবন। তলস্তয়ের রেসারেকসানের মত, গ্যেটের আলোক-অভিযান, দান্তের নরক-উত্তীর্ণ প্রেম, রবীন্দ্রনাথের সুন্দর-ন্যায়-সত্যের সামঞ্জস্য-অন্বেষণ। কিংবা, এসমস্ত কিছুই না। তিনি গ্যেটে, দান্তে, তলস্তয়, রবীন্দ্রনাথ, আইনস্টাইন, রলঁ্যা, রাসেলের ধারে কাছেও যান না। সার্ত্র, গর্কী, এহরেনবুর্গ, এমনকি, তাঁর দেড়-দশক পূর্ববর্তী লেখিকা সার্ত্রবান্ধবী সিমোনে দ্য বোভোয়াও নন। আবার এ সমস্তের সমবেত কিঞ্চিৎ কিছু। বিশশতকের সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারে অতি-সাধারণ জীবনযাপন করা—অথচ সভ্যতার সঞ্চয়ে, সংস্কৃতির দৌলতে পাওয়া অসাধারণ ইচ্ছার লালনে—হয়তো বা কিছু-পরিমাণে প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও, চরিত্রের সততাবোধে, কিংবা সময়ের পাঠ নিতে না-পারায়, প্রতিষ্ঠা অর্জনে সর্বস্ব পণ করতে অপারগ—ব্যর্থতার প্রচুর বোঝা বহেই জীবন ক্ষয়িত। সেই ক্ষয়িত, অপচয় হয়ে যাওয়া সংবেদনময় কাহিনী।

তাঁর এবং তাঁর সময়ের আরো অনেক মহিলার।

# লেখিকা-কথন

## এক

আত্মস্মৃতিচারণ অধিকার সার্থকনামাদের। স্বনামধন্য এবং ধন্যরা তাঁদের স্মৃতিচারণের প্রাথমিক পৃষ্ঠাগুলিতে এমন সব কাহিনী লিপিবদ্ধ করেন, পড়ে আমরা চমকে উঠি। এ যে আমারি জীবন-কাহিনী প্রায়। প্রায়, তার বেশী কিছু নয়। আমাদের ব্যর্থজীবনের অনেক-খানিই ধুলোয় মোড়া, অনেক অংশই চোখের জলের কাদায় ভেজা। সূর্যাস্তর শেষ আলোটুকু এসে পড়ে আমাদের অপচয় হয়ে যাওয়া জীবনে: উজ্জ্বল না হয়ে থরোথরো ম্লান-বেদনায় রেখা টেনেই ডুবে যায় অতল-অন্ধকারে। খ্যাতনামাদের অখ্যাত কাহিনীটুকুর এসে পড়ে খ্যাতির ঝলমলে আলো। মুচ্‌কি হেসে আলো প্রশ্ন করে, বন্ধু, আছ তো ভালো? ফেলে আসা সেই ব্যর্থজীবনটুকু বেদনায় অতলান্ত ত্যাগ করে ঝলমলে হাসির আঁচলের পাড়ে, নানারঙের নকশা কেটে কমেডিই হয়ে যায়।

আত্মস্মৃতিচারণ ' অধিকার সার্থকনামার। অন্ধ গহ্বর-ফুঁড়ে, খ্যাতির আকাশ জুড়ে হঠাৎ জেগে ওঠা আত্মস্মৃতিচারণ চার্লি-চ্যাপলিনের, ইসাডোরা ডানকানের। চমৎকার। সাক্‌সেসফুল। কয়েকখানি আত্মস্মৃতিচারণ, স্মৃতি নয়, আত্ম, সাক্‌সেস্‌ফুল যাদের বলা যায় না, কোনোদিনও বলব না। জীবন-গভীরে আত্ম-উদ্‌ঘাটন। সেন্ট অগাস্টিনের কনফেশন্‌, গান্ধীজীর আত্মচরিত—পাপ ধুয়ে ধুয়ে পুণ্য—অন্যায়কে রুখে রুখে ন্যায়, ব্যর্থতাকে মেজে মেজে প্রজ্ঞা।

আর একখানি জীবনস্মৃতি:

"স্মৃতির পটে জীবনের ছবি কে আঁকিয়া যায় জানি না। কিন্তু, যেই আঁকুক সে ছবিই আঁকে।"

জীবনরসের এই রসিক পুরুষটি হবার পরেকার ছবিখানিই

দান করেছেন আমাদের। হবার কারখানা ঘর রেখেছিলেন বন্ধ। কারখানা ঘর খুলেছিলেন গর্কী, ডিস্টয়েভস্কি। মাই এপ্রেনটিস্‌শিপ, নোটর্স-ফ্রম-আণ্ডারগ্রাউণ্ড। অন্ধকার কারখানা ঘর। ভাঙাচোরা, পিচ্ছিল। আমরা অবতরণ করি, চলছে গড়াপেটা, ঢালাই-পেটাই। আরো অবতরণ করি, অদ্ভুত বেদনায় বিদ্ধ হই, অভাবিত যন্ত্রণায় বিদীর্ণ অথচ শুদ্ধ, কেননা তা সর্বৈব মানবিক, কোথাও জান্তব নয়।

আবার, হঠাৎ হাসির ঝলকানি লেগে ঝলমল করে চিত্ত। সাত্র্ তাঁর words শুরু করলেন হাসির ঝলক লাগিয়ে। আমি ভুলতে পারিনে রলাঁ্যার অমল-উপহার Journey Within, সেই অন্তর্ভ্রমণ খানি উপহার দিয়েছিলেন ভিয়েনার গাছটিকে। ঘরের জানালার পাশে গাছটি, মাটিতে শেকড়, আকাশে ডালপালার উল্লসিত আন্দোলন। আশাবাদী রলাঁ্যা আশা করেছিলেন, ভিয়েনা থেকে শান্তি-আন্দোলন দূরপ্রসারী হবে।

আর একখানি আত্মজীবন, তাকেও ভুলব না। বিশ শতকের towering monument, অত্যন্ত ব্যক্তিক অথচ international, মমতায় প্রগাঢ়, মননে উজ্জ্বল, আত্মসত্য-উদঘাটনে সৎ। আমি "দি অটোবায়োগ্রাফী অফ্‌ বার্ট্রাণ্ড রাসেল"-এর কথাই বলছি।

জীবনের ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে এঁদের অবস্থান। কিন্তু একজায়গায় এঁদের মিল। সকলেই দীপ্তমধ্যাহ্ন সূর্যের মুখোমুখি। দাঁড়িয়ে সোজা খাড়া দুই পায়ে, শক্ত ঘাড়, উঁচু মাথা। চারদিকে খ্যাতির জ্বলজ্বলে আলো, চারপাশে বয় সার্থকতার সুবাতাস। সাক্‌সেস্‌ এঁদের পিছনে ছায়েবানুগতা।

আমাদের মত মানুষ, সাধ ছিল, সাধ্য হল না। বসন্ত-মেলায় শুকনো পাতা, ঝরাফুলের মতই হয়ে রইলাম অথচ বলতে পারলাম না বাউল-নিরাসক্তিতে, বিনষ্টিতেও ধন্য। জীবনের অনেকখানি সময় অতিবাহিত করলাম, নিষ্ঠুর পুরুষটির সন্ধানে। যে একদিন আঙুল-ইশারায় ডাক দিয়ে কোথায় গেল মিলিয়ে। চিত্তে লেগে থাকল নিবিদ্ধ

প্রণয়ের তৃষ্ণাভরা ইশারা। সেই আমরা কি একেবারে পরাজিত? সাক্সেসের মাপকাঠিতে যখন হার মেনেছি।

তবু আমি যখন exist করছি, আছি। আছে আমার অস্তিত্ব। আত্ম আছে বৈকি! আমি যখন পিছনে ফেলে এসেছি, আমার সুখবেদনায়, দুখবেদনায় ভরা দিনগুলি, রাতগুলি। স্মৃতি আছে বৈ-কি। আর আমি যখন ইন্‌ডিভিডুয়াল ব্যক্তি, অধিকার আছে চারণের:

আত্ম এবং স্মৃতির।

## দুই

কে আমি? কী আমি? আমার: existence, individuality, আমার personality. আমি বনানী রায়-চৌধুরী, যদিও এ নাম আমার পছন্দ নয়, নামের দায় পূর্বপ্রজাতির। প্রাকবিবাহ পর্বে ছিলাম বনানী রায়। আমি মেয়ে। জন্ম নিয়েছি ব্রিটিশ শাসনের টলোমলো অধ্যায়ে। পরাধীন দেশের পুরুষ-সমাজের অধীন আমরা কৈশোর যৌবনের সন্ধিক্ষণে সাফ্রেজিস্ট আন্দোলনের আকাঙ্ক্ষা বহন করেও বন্দীজীবন কাটিয়েছি। বন্দীবিহঙ্গ পাখা ঝট্‌পট্‌ করেছে মাত্র, উড়তে পারেনি। বিবাহান্তে নাম লিখেছি, বনানী রায় চৌধুরী। তবু সাড়া দিতে হয় বনানী চৌধুরী নামেই। মধ্যবিত্তের একটু উঁচুচূড়ায় আমি শুধুই—মিসেস চৌধুরী। আমার অনেক কিছুই আমার ইচ্ছার নয়।

নাম, পিতৃগোষ্ঠী, স্বামীগোষ্ঠী ছাড়াও আমার পরিচয়: নানাধর্ম ও অসংখ্য জাতি বিভক্ত দেশে আমি হিন্দু এবং কায়স্থনামে উপজাতি। কিছু কিছু জাতবদলের পালা কোনো কোনো পরিবারে চললেও এখনো জাত-বন্ধনের এক্তিয়ারই পাকা। এ-হেন বনানী রায়-চৌধুরী আমি বাঙালী।

উত্তরে কাঞ্চনজঙ্ঘা মুকুটে আদিগন্ত হিমালয়, দক্ষিণ-ধৌত সমুদ্র-নীল বঙ্গোপসাগরে, পূর্বে চিরসজল চিরশ্যামল আসাম, পশ্চিমে রক্তিম ঢেউখেলানো ছোটনাগপুর বিহার এই সীমানায় ঘেরা অখণ্ড বাঙলা—এই অখণ্ডেই আমার জন্ম।

আপাদমস্তক বুকের গভীর পর্যন্ত বাঙালী হয়েও আমি ভারতীয়। ভারতের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, সম্মান-অসম্মান, ঐক্য-অনৈক্য সমস্তই আমাকে গভীরে স্পর্শ করে। আবার আমি বিশ্ব-মানবের অন্তর্ভুক্ত মানুষ। বিশ্বের স্বদেশের যা কিছু মানবিক, সাংস্কৃতিক, বৈজ্ঞানিক, নান্দনিক অবদান, আমার জ্ঞান, বোধ, আনন্দ ও ব্যবহারের এলাকা বিস্তারিত করে। হয়তো বা বেদনারও। আশ্বাস এবং হতাশারও। সেই সঙ্গে প্রশ্নও। বিজ্ঞানের কলাও কারুকলার যুগে বিশ্বজনীনতা আমাদের প্রায় সকলেরই দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে। কোন বিশ্বজনীনতা? এক বিশ্ব স্বপ্নের? ঐক্যের—না, বিচ্ছিন্নতা ও অনৈক্যের? নেশন, দেশ রাজ্য, ধর্ম, সীমিত সম্প্রদায়ের? টেকনোলজির উন্নততর প্রাপ্তির সঙ্গেই কম্পমান আশঙ্কা—সর্বনাশা ধ্বংস?

আমার প্রশ্ন: এই সব সমবায়ের সমভিব্যাহার আমি কতখানি নিয়েছি। কতখানিই বা বর্জন করেছি। আর এই ঝাড়াই-বাছাইয়ের কাজে অর্থাৎ selection এ আমি কতখানি individual যে আমি ঐতিহ্য বহন করে চলেছি পিতামাতার ক্রমে, সেই ব্যক্তিটির জন্ম ও ধারাবিবরণীই আমার কাহিনী? আমি যা পেয়েছি পূর্বনারী, পূর্বপুরুষ, পরিবেশ, পরিপার্শ্ব, দেশকাল থেকে সেই তথ্যগুলিই আমার অস্তিত্ব—না আরো সত্য আছে দূরপ্রসারী যার আবিষ্কারেই আমার ব্যক্তিত্ব।

জন্ম ১৯২১এর আঠারো অক্টোবর। নিঃসন্দেহে জন্মদিবস নয়, মাতৃজঠর থেকে বিচ্ছিন্ন হবার দিনমাত্র। তার আগে অনেক দিনরাত কেটেছে মাতৃগর্ভে। সেই আমার অন্ধকার দিনরাতে জন্মের ল্যাবরেটরীতে অনেক বিভাজনে সেল ভেঙে ভেঙে, অনেক সংযোজনে সেল জুড়ে জুড়ে, অনেক জন্ম সমবায়ে একটি জন্ম-প্রস্তুতি।

তারও আগে অদ্বিতীয় একক আশ্চর্য ঘটনাটি ঘটেছিল। দ্রুত ধাবমান অসংখ্য স্পারমাটাজুনের একটি প্রতি ক্রোমোসমের আধেক ঝরিয়ে দিয়ে, প্রতি ক্রোমোসমের আধেক ঝরানো মাতৃগৃহাতে প্রতীক্ষিতা ওভামের অভ্যন্তরে প্রবেশ করল। কেন ওই স্পারমাটা-জুনই সক্ষম হল কে জানে। কে জানে, কী ছিল বিধাতার মনে? এমন সব সময় বিধাতার দায় মানা ছাড়া উপায় থাকে না। এমনও হ'তে পারে; যারা সক্ষম হল না, আর ঝরানো হল যে-গুলিকে তাদের মধ্যেই রয়ে গেল আমার বুক তোলপাড় করা ভালো-লাগার সব উপাদান। যারা সক্ষম হল, যারা আমার জীবনে **responsible for the transmission of hereditory characters**, তারা আমার বুক দুলিয়ে দিতে পারল না আমার আকাঙ্ক্ষার মত। হায়রে। যা হই, নিজের ইচ্ছের মত হইনে। তাই না হতে পারার যন্ত্রণাময় বেদনা নিজের মধ্যেই যত, তত আর কোথাও নয়। সৃষ্টির এই রহস্যময় কর্মটিতে আমার ইচ্ছা, বুদ্ধি, বোধি, ভালোলাগা, ভালোবাসার কোনো জায়গাই নেই। মাতৃজঠরের কারখানা ঘরে সৃজিত আমি: রক্তমাংস, অস্থি-মজ্জা-মেদ, রুচি-অপরুচি, দোষ-গুণ, স্বাস্থ্য-অস্বাস্থ্য, বুদ্ধি নির্বুদ্ধিতা, স্থূলে-সূক্ষ্মে মেলানো আমি জানি:

আমার নিজেকে আমি পাইনি আপন মনের মত।

সৃষ্টির এই উচ্চহাস্যে আমার বাবা-মায়েরও ইচ্ছা, বুদ্ধি ও বোধ-সমূহ স্ব-স্ব-এক্তিয়ারে ছিল না। তাঁরাও এসময় ছিলেন একান্ত ক্রীড়নক মাত্র। কিন্তু কার?

অনেক তথ্য জানাসত্ত্বেও প্রশ্ন রয়ে যায় যে। বুকের ভেতর মোচড় খেয়ে ওঠা প্রশ্ন। আমি কি সৃষ্টিতে একটা অ্যাকসিডেন্টের ফলস্বরূপ মাত্র? **Heredity** তত্ত্বের পুতুল? দেশ-কাল-পরিবেশে তরী খেলনা? অথচ আমি বনানী রায়চৌধুরী তা চাইনে। চাইনে বলেই প্রশ্ন উত্তাল। আমি কি পারিনে নিজেই নিজেকে সৃষ্টি করে নিতে? আমার **making**-এর ওপর **remaking**? এইখানেই

আমি আমার সৃষ্টিকর্তা। এই সৃজনের প্রশ্নেই আমার সার্থকতা; আমার ব্যর্থতা।

## তিন

এহরেনবুর্গ তাঁর আত্মজীবনীতে স্ব-জীবন স্থাপন করলেন জনজীবনের পশ্চাতে। people and life, বিরাট ক্যানভাস্। স্তরে স্তরে পৃথিবীর রূপরেখা। লিখছেন :—১৮৯১এর ১৪ জানুয়ারী আমার জন্ম। এবছর সাধারণ মানুষের চরম-দুর্দশা আর আঙুর ও মদ্যব্যবসায়ীদের সুখের দিন এনেছিল। উনিশটি প্রদেশে দুর্ভিক্ষ। তলস্তয়, চেখভ, কোরেলেঙ্কো ক্ষুধার্ত-বছরে সস্তার Soup-kitchen স্থাপিত করে চেষ্টা করেছিলেন, মরুতে বারিবিন্দু সেচনের। যেহেতু খরায় আঙুরের ঔৎকর্ষ তাই সাধারণ মানুষের সর্বনাশের সঙ্গেই এসেছিল মদ্যব্যবসায়ীদের পৌষমাস।

১৮৯১। রাশিয়ায় তৃতীয় জার, ব্রিটেনে রানী ভিকটোরিয়া গ্লাডস্টোনের বক্তৃতাবলী, জার্মেনীতে বিসমার্ক। জীবিত এঙ্গেল্স্, পাস্তুর, ভেরলেইন, মপাসাঁ আর হুইটম্যান। তখনো জন্ম হয়নি মায়াকভস্কি, জোলিওকুরি বা পল এলুয়ারের। হিটলার দু'বছরের শিশুমাত্র। বিশ্ব শান্ত, যুদ্ধ নেই। ইউরোপে ব্যালান্স অফ পাওয়ারের চেষ্টা চলছে। রাশিয়ায় প্রবল প্রতাপান্বিত জার। সামারায় গভীর অভিনিবেশে লেনিন পড়ছেন মার্ক্স।

প্রতি মানুষের জন্মলগ্নেই আছে ইতিহাস। আমি-শ্বনানী রায়-চৌধুরী পোড়া বাঙলাদেশের পড়তি জমিদার পরিবারে জন্ম নেওয়া মেয়ে, আমার জন্মলগ্নেও ছিল সর্বশক্তিমান সময়।

ভয়ংকর বিশ্বযুদ্ধের পরেকার সময়। আমার জন্মের আগেই পৃথিবীর হৃদয়বান মানুষেরা দিকে দিকে উচ্চারণ করেছিলেন : শান্তি। শান্তি যুদ্ধের উর্ধ্বে। শুধুমাত্র স্বদেশের জন্যই করেন নি, সমস্ত দেশের

জন্য। আমার গৌরব বাঙ্‌লাও পিছিয়ে ছিল না। বাঙ্‌লার হৃদয় উচ্চারণ করেছিল যুদ্ধের মধ্যেই, ১৯১৬ সালে :

"স্বাজাতিক সংকীর্ণতার যুগ শেষ হয়ে আসছে। ভবিষ্যতের জন্য যে বিশ্বজাগতিক মহামিলনযজ্ঞের প্রতিষ্ঠা হবে তার প্রথম আয়োজন ওই বোলপুরের প্রান্তরেই হবে। ঐ জায়গাটিকে সমস্ত জাতিগত ভূগোল বৃত্তান্তের অতীত করে তুলব।"

আমার জন্মের আগেই বাঙলার সাহিত্য-আকাশ, রবীন্দ্র-আকাশ। লেখা হয়ে গেছে গোরা, চতুরঙ্গ, ঘরে-বাইরে, গল্পগুচ্ছের গল্পগুলি। লেখা হয়েছে বলাকা, পলাতকা, শিশু-ভোলানাথ। ধর্ম, শান্তি-নিকেতন, **Nationalism, Personality,** গীতাঞ্জলির নোবেল পুরস্কার সংবাদ পুরানো হয়ে গেছে। বিশ্বভারতীর কাজে ব্যাপৃত রবীন্দ্রনাথ। সমস্ত লেখা, শান্তিনিকেতনের সকল কাজে, বিদেশ ভ্রমণের অন্তরালে রসের যোগান দিচ্ছে নিত্যনবরচিত গানের ঝর্ণাধারা।

তবু পরাধীন বাঙলা, পরাধীন ভারতবর্ষ। গ্রেটব্রিটেনের রাজা পঞ্চম জর্জই ভারতের সম্রাট। সেই সম্রাট-দেশেও মেয়েদের অবস্থা সম্মানের ছিল না। তাঁদের ভোট ছিল না। তাদের মানা হোত, **"infants, criminals** আর **lunatics"**এর সমগোত্রীয়। ১৯১৪তে এলো যুদ্ধ। সেই মহাযুদ্ধে অভাবিত দক্ষতাপূর্ণ কাজ দেখিয়ে, ১৯১৮তে অর্জন করলেন ভোটের অধিকার। ১৯১৮তে যুদ্ধশান্তি। ১৯১৭তে রাশিয়ায় বিপ্লব। ১৯২১।২২ অভূতপূর্ব বছর ভারতবর্ষের। গান্ধীজীর স্বরাজ ঘোষণা। অসহযোগ আন্দোলনের তরঙ্গিত সমুদ্র। ঢেউ পরে ঢেউ। একদলকে ধরে জেলে পুরতে না পুরতেই আর একদল তৈরী। হাজার হাজার মানুষ ব্রিটিশ কারাগারে। অন্যদিক থেকে এগিয়ে আসছে শ্রমিক, কৃষক আন্দোলন। আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ে ধর্মঘট। মেদিনীপুর, গুন্টুরে, **no-tax** অভিযান। চৌরি-চৌরা গ্রামে পুলিশ-জনসাধারণ সংঘর্ষে ২২জন পুলিশের মৃত্যু ঘটল। গান্ধীজী আন্দোলন বন্ধ করে দিলেন। আশা এবং আশাভঙ্গ এরি

সঙ্গমে আমার জন্ম। আমাদের মধ্যবিত্ত মানসচরিতও এই। অনেক ইচ্ছা, অনেক অপূরণ। আশ্বাসে নৈরাশ্যে খণ্ডিত।

জমিদারীর রাজাগিরি আমি দেখিনি। দেউড়ীর দরোয়ান তখন রূপকথা, জমিদারী বিক্রি হয়ে গেছে, জ্যাঠামশায়রা শেষ টাকা কটা ফুঁকে দিচ্ছেন, কোন আয়ের চেষ্টা নেই। বিছানার চাদর অভাবে পাতা হচ্ছে বিয়ের বেনারসী জোড়। জ্যেঠিমা, পিসিমারা রুপো-কাঁসার বাসন বাঁধা রেখে রসগোল্লা, কাঁচাগোল্লার মিষ্টিমুখ করছেন। বাবা বিবাহান্তে ল' পড়ছেন শিক্ষাবিদ শ্বশুরের গৃহে থেকে, এমন সময় আমার জন্ম।

১৯১৮ থেকে ১৯২৮ এই দশবছরে যাদের জন্ম, তারা আমার বড়ো কাছাকাছি। পিঠোপিঠি ভাই-বোন সব। আমরা অনেকেই এক-যোগে বহু বিশ্বাস গড়তে গড়তে, হারাতে হারাতে, আঁকড়াতে আঁকড়াতে, তরঙ্গের পর তরঙ্গে উঠেছি আর নেমেছি। কারুর আশ্রয় এক ঢেউ, কারুর আশ্রয় অন্য তরঙ্গ। রথচক্রতলে পিষ্ট প্রায় অল্পবিস্তর সকলেই। আমাদের মুখে বুকে প্রায় এক জাতীয় যন্ত্রণার কৃষ্ণছায়া, একজাতীয় আশ্বাসের সুনীলআনন্দ।

তবু আমরা প্রত্যেকে স্বতন্ত্র। আমাদের বুকের মধ্যেকার কী এক গভীর সে—যে আমাদের স্ব-স্ব-যন্ত্রণা, বেদনার তাপে, আনন্দ-উত্তাপে বিশেষ করে তুলছে। এক পরিবেশ, এক দেশ, এক ভাষা, এক সময়ের মিল, তবু প্রত্যেকেই এক অন্য অন্য—অনন্য।

## শৈশব ৮

ঘৃণা নয়, বিপন্ন-বিস্ময়

খণ্ড করে দিতে পারে শৈশবের সুখ

"Almost all the writers, I know love their childhood, I hate mine." Andre Malreux-এর Anti-memoirs-এর এই উক্তিতে অনেকে বিচলিত হলেও আমি হইনে। আমার শৈশবকে দেখেছি বিপন্ন-বিস্ময়ে। ভালোবাসতে পারি নি। এমন কম ঘটনা আছে, যাকে ফিরে দেখতে চাই, স্মৃতিসুধারসে জারিয়ে তুলতে চাই। আমার শৈশব অনাদৃত। মা তাঁর তীব্র ব্যাকুলতায় আমাকে দু'হাতে জড়িয়ে রাখছেন ; সহজ ছিল না সেই ভালোবাসা। শিশু-সত্তায় চেয়েছি সহজ-শৈশব, যা পেলে বলতে পারতাম, my golden days, আমার সোনালী দিনগুলি।

এই পর্বটুকু একেবারে মুছে দিলে কী হয় ? পারিনে। এতবড় অসত্যে পা রাখাও যায় না। পর্ব থেকে পর্বান্তরের এই তো প্রথম ধাপ। নিশ্চিহ্ন করতে পারিনে। চাইলেও পারিনে।

আত্ম-উন্মোচনে আমি যেন আপনাকে আত্মছায়ায় আবৃত না করি। বেণুকে দেখাতে চাই আমার সৃজিত চরিত্রের মতই। যদিও জানি, পুরোপুরি পেরে উঠব না। একটু মায়া জড়িয়ে যাবেই একটু ঘুমঘোর। তবু, আত্মস্পর্ধায় যেন স্পর্ধিত না করি।

প্রথম স্মৃতি, তিনবছর বয়সের। সেদিন আমি কেঁদেছি খুব কেঁদেছি। দূরে ছুঁড়ে দিয়েছি ফ্রক। হাত-পা ছুঁড়ছি, হাঁ-মুখ, ছোট মামার মত হাফ্‌প্যান্ট-হাফ্‌শার্ট চাই। মা নাস্তানাবুদ। দিদিমা, বড়মাসি, ছোটমাসি হিমসিম। সেদিন অনেক হাসাহাসি। ছেলেদের পোশাক পরলেই যদি ছেলে হওয়া যেত, ভাবনা ছিল না। সকলেই হয়ে যেত ছেলে, কেউই বা মেয়ে থাকত। হয়তো শিশুমানসগহনেই

জেনেছিলাম জগৎ সংসারের অধিকাংশই পুরুষ একিয়ারে। পরে ফ্রক ধরেছি, জেনিছি নিষ্ঠুর সত্য, আমি মেয়ে। আমার সদ্য জাগ্রত নারীসত্তাটুকুকে ভালোবাসতে চেয়েও পারি নি। একটা বাঁকা ব্যথায় মোড়া সে। একই অন্যায়ের শাস্তি ভোগ করতে হয়েছে আমাকে—সঙ্গী ছেলেদের কসুর মাপ হয়ে গেছে। আরে ওরা যে ছেলে।

আর এক স্মৃতি, স্মৃতি নয় সত্য। আশ্রিত আমি। দাদামশায়ের বাড়িতে বড়ো হচ্ছি। দাদামশায়ের দুই মেয়েই বিবাহান্তে পিত্রালয়ে। বড়মাসি তবু গরমের লম্বা ছুটিতে শ্বশুরবাড়ি যায়। মা যান না। তার ওপর বড়মাসির তিনটিই ছেলে। আমিই মায়ের মেয়ে। ছোটমাসির এখনো বিবাহ হয়নি। তার ওপর আমিও একটা খরচের দায় নিয়ে এসেছি।

অস্পষ্ট অনুভব আমার। অস্পষ্ট কিন্তু তীব্র। বড়মাসির মধ্যে দর্পিত অহংকার—মা দংশিত-মর্যাদায় ম্লানকাতর। শুধুই কাতরতা নয়—কোথায় যেন লেগে যায় হীনমন্যতার ছায়া। আমি থেকে থেকেই ভীরু হই, মায়ের ছায়া ছায়া ফেলে আমার অস্তিত্বে। আমাকে অনেক কিছুই মানায় না। আমার শিশুসুলভ চপলতাগুলো—উঃ, কী হতচ্ছাড়া, পাজী মেয়েটা।

আচ্ছা, বাবা-মা-আমি, আমাদের নিজেদের বাড়ি, সে কেমন জিনিস? তেতলার ঘর আমাদের-পূবদক্ষিণ খোলা, খুব আলো হাওয়া। তবু আমার মনে হয়, ঘরটা ভূতে পাওয়া। সে ঘরে আমরা তিনজন উঠি, বসি, শুই, ঘুমোই, মানুষের মত নয়, প্রেতচ্ছায়ার মত। আলো ঝলমলে ঘরটাও যেন মৃত কালো। আমাদের মধ্যকার যা কিছু ভালো, যা কিছু সুন্দর, চাপা পড়ে গেছে মৃত কালোয়।

মৃত অন্ধকারটাকে আমার বড়ো ভয়। দিনরাত্তির। রাত্তিতে সেটা বাড়ে। শোবার আগে মাকে জড়িয়ে ধরি: মা গল্প বলো। মা শুরু করেন: লালকমল-নীলকমলের গল্প, অরুণ-বরুণ-কিরণমালার। গল্পের ডানায় চড়ে আমি বেরিয়ে যাই আমাদের ঘর থেকে। কিন্তু

গল্প যখন না থাকে ? হাঁউ, মাঁউ খাঁউ, মানুষের গন্ধ পাঁউ। থরথরিয়ে কাঁপে ঘরটা। এক একদিন সাহসী হয়ে ওঠে বেণু। কেঁ জাঁগেরে ? এই প্রশ্নের জবাবে তলোয়ার ঘুরিয়ে হাঁকে। লালকমলের আগে নীলকমল জাগেরে। আবার চোখ বুজে ঘরের এপ্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে চলে যাচ্ছে। দুর্গমের পথে কিরণমালা দুরূহের অন্বেষণে। পিছনে কত না হাঁকডাক, কত না প্রলোভন, পেছনে ফিরছে না, চলেছে জীবন-জলের সন্ধানে।

আর একটা দিন। দাদামশাই অফিস গেলেন না, নামলেন না নিচের বৈঠকখানায়, শোবার ঘরেই থাকলেন আবদ্ধ। খেলেন না। বাবা আর বড়মামা কোথায় যেন ঘুরে ঘুরে বাড়ি ফিরলেন ক্লান্ত। কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা করা যায় না, বেণু জানে, বড়োদের জীবনচর্যায় ঔৎসুক্য প্রকাশ ঔদ্ধত্যের শামিল। মাও সবকথার জবাব দিতে চান না। ইষ্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের খেলার দিনে বাবা-বড়মামার মুখে একটা আলোছায়ার খেলা সে দেখে। মুখ খুশি খুশি না হয়ে যেদিন অন্ধকার, মায়ালতা বলেন: আজ আর বই নিয়ে বাবার কাছে পড়তে যেও না, ওঁর মন ভালো নেই। বেণু বোঝে, মোহনবাগান হেরে গেছে। আজকের ক্লান্তমুখে যেন বেশী কিছু, যেন ছড়িয়ে পড়েছে যন্ত্রণাযুক্ত একব্যথা।

সামনের ফাঁকা জায়গাটায় তাদের জটলা। চারবছরের বড়ো বড়দা বলল: দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন মারা গেলেন।

নতুনমামা বলল: দার্জিলিং গিয়েছিলেন, সেখানেই।

বেণু বলে বসল: কলকাতায় কবে আসবেন ?

ছেলের দল হোহো হাসল। মুহূর্তে বুদ্ধু সে। বড়দা বলল:

কী হাঁদারে। মরে গেলে কেউ আবার ফিরে আসে ? মরে গেলে ফুরিয়ে যায়। দেখলি না, মেসোমশাই আর বড়মামা মুখভার করে ফিরলেন। শেয়ালদ গিয়েছিলেন মৃতদেহ দেখতে। এরপর দাহ করবে। দেহটা পুড়ে ছাই হয়ে গেলে আবার কিছু থাকে নাকি!

বুকের মধ্যে অননুভূত যন্ত্রণা। কান্নার মত কষ্ট। মৃত্যু, ফুরিয়ে যাওয়া, মৃতদেহ, দাহ, পোড়ানো, অদ্ভুত অজানা কষ্টে মোড়া শব্দগুলো। ঠোঁট কাঁপছে, হয়তো দু'চোখ উপচিয়ে জল পড়ত গড়িয়ে, ছোটমামার উক্তিতে সংযত হল।

—কত বুদ্ধি আর হবে? মেয়েমানুষ তো?

রাত্রে মাকে জিজ্ঞাসা: দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন কে মা?

—খুব বড়ো হৃদয়-মনের মানুষ। নিজের সর্বস্ব দেশের জন্যে দান করেছেন। দেশের মানুষ তাই ভালোবেসে নাম দিয়েছে দেশবন্ধু।

আচম্‌কা অদ্ভুত প্রশ্ন:

মৃত্যু কি মা? কাকে বলে মারা যাওয়া?

মায়ালতার হাত এতক্ষণ বেণুর চুলে, কপালে, ঘুরছিল, ফিরছিল, থমকে থেমে গেল। অল্পক্ষণের জন্য নির্বাক। বললেন:

—কে বলেছে এসব কথা?

মায়ের প্রশ্নের জবাব না দিয়ে আরো প্রশ্ন করে বসল:

—তিনি নাকি মারা গেছেন? কাল তাঁর মৃতদেহ এলো দার্জিলিং থেকে ট্রেনে, বাবা-বড়মামা দেখতে গিয়েছিলেন। মৃতদেহ দাহ করবে? আগুনে পুড়িয়ে ছাই করে দেবে? সত্যি মা?

মায়ালতা বেণুকে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন:

—ছোটদের এসব বলতে নেই। শুনতেও নেই।

একদিন কিন্তু, মাই মুখে মুখে মুখস্থ করিয়েছিলেন, ছোট কবিতা:

"এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন-প্রাণ
মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান।"

পুড়িয়ে ছাই করে ফুরিয়ে দেবার সঙ্গে মৃত্যুহীন-প্রাণের সামঞ্জস্য করে উঠতে পারছিল না কিছুতেই। কিন্তু, নিঃশেষ অপেক্ষা মৃত্যুহীনতাই তাকে টেনেছিল।

বেণু বোঝে যন্ত্রণাময় শব্দগুলি থেকে মা তাকে রক্ষা করতে চান সযত্নে। এমনি আর এক শব্দ দাঙ্গা। কিন্তু, পারেন নি। পারেন না। ভালো হোক, মন্দ হোক জীবন না জেনে বুঝেও সত্য তথ্য

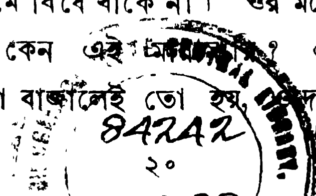
সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হ'তে চায়। সেই দিকেই তার অভীপ্সা। হয়তো দুঃখ পায়, কষ্ট, তবুও।

তখন তার সাড়ে চার বছর বয়েস। টাইফয়েডে ভুগছে। ফাল্গুনে পড়েছিল, এখন চৈত্রমাস। বিছানায় মিশিয়ে গেছে, চোখ চাইতেও পারে না, মাথায় আইসব্যাগ. দিনরাত্তির পাশে বসে মা। একটু ভালোর দিকে। একটু বোধে এসেছে। বোধ সর্বাঙ্গে জড়ানো ধূসরতা। দেখে ধূসর-পাণ্ডুর, শোনে দূরাগত সুদূর, যা খায় স্বাদহীন ছায়া ছায়া। দূরাগত—"আল্লা হু আকবর" আর আশেপাশেই বেজে কাঁসি, শাঁখ "বন্দেমাতরম্" ধ্বনি একই রকম লাগত। চমকে উঠত। জিজ্ঞাসা করত—কিসের গোলমাল মা? মায়ালতা বেণুকে জড়িয়ে ধরতেন, বলতেন:

—কিছু নয়, তুমি ঘুমিয়ে পড়ো।

বেণু অস্পষ্টভাবেই বোঝে কী যেন রয়ে গেল গোপনে।

সেরে উঠলে দল জ্ঞানদান করেছিল। দাঙ্গা হয়েছে রায়ট। হিন্দু-মুসলমানে মারামারি। মসজিদের সামনে বাজনা বাজানো নিয়েই শুরু। মুসলমানপাড়ায় ভাবত হিন্দুরা আসছে, অমনি "আল্লা হু আকবর"। মুসলমানরা আসছে সন্দেহ হলেই বেজে উঠত কাঁসি, শাঁখ, সবাই গলা ছেড়ে হাঁকত "বন্দেমাতরম্।" সব বাড়ির সবপুরুষরা ছুটে যেত গলির মুখে—গলি আটকাও। খেতে বসেছে, শব্দ উঠল ছুটে যাও—শুয়ে পড়েছে কাঁসি বাজল—ছুটে যাও। রুখতে হবে পাড়ায় ঢোকার মুখেই। বড়দা বলল: ইস্, আর কয়েকটা বছর বেশী হলে আমিও ছুটে যেতে পারতাম। ছোটমামা হাসল—বেণু?—আর কয়েকটা বছর বেশী হলে বেণু ঘোমটা মাথায় রান্নাঘরে। বড়দার উক্তিতে আবার সমবেত হোহো। বেণুর মন খারাপ হয়ে যায়। কিন্তু, এই খারাপভাবটা স্থায়ী হয় নি। পরিহাসটা তেমন মর্মে বিঁধে থাকে না। ওর মনে একটা অন্য ভাবনা প্রবেশ করেছে। কেন এই মারামারি? এগুলো তো বিশ্রী। মসজিদের সামনে না বাজালেই তো হয়, ওদের ধর্মে বারণ যখন,



কিংবা একটু বাজনা শুনলেই বা ক্ষতি কি ? হিন্দুধর্মে বাজনা যখন পূজার অঙ্গ, উৎসব-অঙ্গ। বেণু যেন আভাসে অনুভব করে—এটা বহিরঙ্গ, গোলমালের মূল কারণ এখানে নয়—অন্য জায়গায়।

পাঁচ পূর্ণ হয়েছে। বিস্মৃতি অপেক্ষা স্মৃতির জাগ্রত অধিকার। পৌষমাস। বেশ শীত। দাদামশায়ের বন্ধু আমানুল্লা সাহেব এলেন। সাদা ফ্লানেলের সাহেবী পোশাক পরনে। বৈঠকখানায় বসিয়ে দাদামশায়কে, খবর দিলো। তিনি এলেন, খদ্দরের প্যাণ্ট-শার্টের ওপর গরম কোট চাপিয়ে। আমানুল্লা সাহেব ফিট্‌ফাট্‌, ফর্সা-কাটাকাটা চোখমুখে খানদানী চেহারা। দাদামশায় এলোমেলো, দেখতেও কালো। এলাহাবাদে একসঙ্গে পড়েছেন। কলকাতায় শিক্ষা বিভাগেই দুজন। লোভী বেণু যাওয়া-আসা, জলখাবার আনার ছুতোয় শুনছে সংলাপ। ওঁরা বলছিলেন : এবার গৌহাটি-কংগ্রেস-অধিবেশনে নেতারা সাম্প্রদায়িক মিলনের কথাটাই বড়ো করে ভাববেন। এমন সময় দুজন ভদ্রলোক প্রবেশ করলেন।

কী যেন বললেন তাঁরা। ছেলেমানুষের মত কেঁদে উঠ্‌লেন দাদামশায়। হঠাৎ কেমন যেন অবনতমস্তক হয়ে গেলেন আমানুল্লা সাহেব। পরে শুনেছে শ্রদ্ধানন্দজীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আলাপ ছিল দাদামশায়ের। তিনিই নিহত হয়েছেন দিল্লীতে মুসলমানদের হাতে। যে বছর বেণুর জন্ম, সেই ১৯২১ সালে দিল্লীর জুমামসজিদের জমায়েত হিন্দু-মুসলমানের সামনে ভাষণ দিয়েছিলেন শ্রদ্ধানন্দজী, স্তব্ধ হয়ে শুনেছিল সকলে। সেই মানুষটিই মাত্র কয়েকবছর পরেই নিহত হলেন ! অথচ ভালোমানুষ, বড়ো মানুষও আছেন। বিভেদের সংবাদে মর্মাহত, মুখ তুলতে পারছেন না। তবু কেন বিভেদ আসে ? ভালোমানুষগুলির শক্তি কি এতই কম ? বেণু ভাবতে চায়, বিভেদের মাঝখানকার কথাগুলো কী তবে ?

সব স্মৃতিই উচ্চাঙ্গ নয়।

হাতেখড়ির দিন স্পষ্ট মনে আছে। সকালবেলাতেই স্নান সারা, কিছু খায়নি, অঞ্জলি না দিয়ে খেতে নেই। শঙ্খলতা, গোলপদ্মের

আলপনা। দিয়েছেন মা। জলচৌকিতে ফ্রেমে বাঁধানো ছবি। হংসবাহিনী, বীণাপাণি, দেবী সরস্বতী। একপাশে গাদা করা বই, সব পড়বার বই আছে, বেণুরও। বেণু তো এখন কথামালা, বোধোদয় পড়ে। ছোটমাসি পাশে এস্রাজটাও রেখেছে। বীণাপাণির ছোঁয়া লাগে এস্রাজে হাত খুলুক। পুরোহিত মশাই মন্ত্র পড়াচ্ছেন, সমস্বরে বলেছে সকলে :

জয়জয় দেবী চরাচর সারে
কুচযুগ শোভিত মুকুতাহারে
বীণারঞ্জিত পুস্তক হস্তে
ভগবতী ভারতী, দেবী নমস্তে।

নমস্কার করে ছুঁড়ে দিয়েছিল হাতের অঞ্জলির গাঁদা ফুল। ঘটেই পড়েছিল, ঝক্‌ঝকে কাঁসার ঘটে মুকুলসাই আম্রপল্লব। সরস্বতী পূজায় তিনটি জিনিস চাই-ই। আমের ডাল মুকুলধরা, সবুজকুল আর লাল লাল পলাশ ফুল। একখানা পাথরে খড়ি দিয়ে বড়ো অক্ষরে অ, আ, ক, খ, লিখে পুরোহিত মশাই বেণুর হাতে ধরে দাগা বুলিয়ে দিলেন। খুব হাসি পাচ্ছিল। সে এখন ছোটখাট চিঠি লিখতে পারে। জানে কাকে শ্রীশ্রীচরণকমলেষু লিখতে হয়, কাকে পরম-কল্যাণীয়েষু বা কল্যাণীয়াসু। ওপরে লিখতে হয় শ্রীহরি। ঠাকুমার চিঠিতে কিন্তু লেখা থাকে শ্রীশ্রীগোপীনাথশরণম্। হাসি পেলেও হাসেনি। হাসলেই বকুনি খেতে হত।

রাত্রে শুয়ে মাকে জিজ্ঞাসা :

—ভগবতী ভারতী কে মা ? ভগবতী তো দুর্গার নাম।

—দেবী সরস্বতীর এক নাম ভারতী। আর মা দুর্গার মেয়ে, ভগবতীর অংশই। তাই ভগবতী-ভারতী।

—আমিও তো তোমার মেয়ে। আমাকে তাহলে মায়া বেণু বলে না কেন ?

—কীসে আর কিসে। তুলনা কি হয় ? আমরা মানুষ, ওঁরা দেবতা। ঈশ্বর, ভগবান।

বেণুর ধাঁধা লাগে, ঈশ্বর অনেক তাহলে। এই সব দেবদেবীরা ভগবতী, ভগবান, ঈশ্বর-ঈশ্বরী। কোনো এক বা দুই ঈশ্বর-ঈশ্বরী নেই তাহলে? সরোজিনীও ওকে বলেছিল:

—তোদের হিন্দুদের অনেক দেবদেবীরে ভাই, মনে রাখতে মাথা ঘুরে যায়। দেখতে কিন্তু বেশ ভালো লাগে। কী সুন্দর দেখতে মা দুর্গা, সরস্বতী, লক্ষ্মী, কার্তিক ঠাকুর?

তোদের অনেক ভগবান নেই?

না ভাই, আমাদের শুধু গড্ দি ফাদার, গড্ দি সান্।

গড্ দ্য হোলি ঘোস্ট। রাজারা ক্যাথলিক তাই ওর মা, মা-মেরীর পূজা করেন। মা-মেরীও খুব সুন্দর দেখতে।

বেণু শুনেছে হিন্দুর তেত্রিশ কোটি দেবতা। তাছাড়া মানুষও নাকি দেবতা। পিতৃদেব, মাতৃদেব, আচার্যদেব। বাবা-মা ছাড়া শিক্ষকও নাকি দেবতা। এই দেবতারাও ভগবান কিনা জিজ্ঞাসা করবে। মায়ালতা বললেন:

—এমন উশখুশ করছিস্ কেন, ঘুমো। রাত হল।

অতঃপর চোখ বুজল। বুজেই ফের খুলে:

—কুচযুগ মানে কি মা?

মা দু'একবার ঢোক গিললেন। বললেন:

—এখন না। বড়ো হ, বুঝতে পারবি।

একটা শব্দের অর্থ জানবার জন্য বড়ো হতে হবে ভেবে অবাক লাগল তার। তাছাড়াও সে দেখেছে বড়োরা যেকথা জানাতে চান না, সেকথা জানতে চাইলেই বলেন—বড়ো হ আগে। মায়ালতাও তাই বলেন। তাই বললেন।

মাসের প্রথম সপ্তাহে সরস্বতী পূজা। চতুর্থ সপ্তাহেই ছোট মাসির বিয়ে। স্মৃতি সতত পুঙ্খানুপুঙ্খের বিবরণ দাখিল করে না। খুব ভালো মনে আছে সামিয়ানা সাজানো হয়েছিল, সানাই বেজেছিল। ছোটমাসি কেমন সেজেছিল মনে নেই। নতুন মেসোমশাই গাড়ি থেকে নামতেই দাদামশায়ের আদেশ হল গুরুজনদের প্রণাম করো। গলায় ফুলের

মালা, টোপরটা বাঁহাতে। প্রণাম করতে করতে আমানুল্লা সাহেবকেও প্রণাম করলেন। তাঁর কুচকুচে কালোদাড়ি। লাল লাল ফেজ টুপি আর একটা অন্য ধরনের পাঞ্জাবি, পাজামা। পাজামাটা এত সরু মনে হচ্ছে আমানুল্লা সাহেবের পায়ে আঠা দিয়ে আটকানো। এ পোশাক বেণু কখনো দেখেনি তাঁর। মণিমাসি শ্বশুরবাড়ি থেকে ফিরে এসে বলেছিল : পাজামা-পাঞ্জাবি নয়তো, চুড়িদার চুস্‌ত আর শেরওয়ানী।

—মেসোমশাই, এক আনা পয়সা দেবেন ?

—পয়সা দিয়ে কি করবে : বেণু ?

—বরফ খাব।

—আমাকেও। বলেন রমেন, বলল ছোটমামা।

—তোরা কেন নিবি ভাই ?

—তুই যে নিচ্ছিস।

—আমার বাবার তো চাকরি নেই। বেণু দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

—হ্যাঁ, চাকরি নেই বললেই হল। জামাইবাবু রোজ কোর্টে যান। তার মানে কি ?

আঃ তোমরা ঝগড়া করো না। আমি তোমাদের সবাইকে বরফ খাওয়াবো।

বাড়ির সকলে ছিলই। তাছাড়াও রাজা, সরোজিনী, টেপী। কোয়ালিটি, হ্যাঙমোর, কাসটা, ফ্রুট আইসক্রীম, পিস্‌তা, চকোলেট বার নয়—প্লেন সাদা বরফ।

বরফওলা টুকরো বরফ ভেঙে নিল। সাদা ছোট ন্যাকড়ায় জড়িয়ে পুঁটুলি করে নিল। ছোট হাতুড়ির ছোট ছোট ঘায়ে সুন্দর চুরচুর করে ভেঙে ছাঁচে ঢালল। গোলাপী সিরাপ ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিতে দিতে গানের গলায় বলল :

—এই নাও খোকাবাবুরা, খুকুমণিরা : পাখি, উড়োজাহাজ, গোলাপফুল।

বেণুর মন নিত্য চেনা জগৎ থেকে নিমেষে উধাও। বরফ-সাদায়

অল্পরাঙাছটা, গন্ধ, বরফওলার ভাঙা ভাঙা মোটা গলার গান, সমস্ত মিলে একটা খুশি খুশি ভাব, যে অনুভব ওর খুবই কম। খুব ভালোমানুষ নতুন মেসোমশাই। মধ্য ভারতের রায়পুর না বিলাসপুর কোথায় যেন থাকেন। দাদামশায়ের তেমন ইচ্ছে ছিল না, মোটে ম্যাট্রিকুলেশন পাস। ডাকাবুকো মেয়ে ছোটমাসি বলল দিদিমাকে, এখানেই বিয়ে দাও মা। দিদি, মায়াদির মত দিয়ো না।

দিদিমা থতমত : তার মানে ?

—মানে বিয়ের পরও বাপের বাড়ি পড়ে থাকব না। বি, এ; এম, এর দরকার নেই।

কাঠের ব্যবসা নিশ্চয়ই ভালো কাজ। কিন্তু, বরফওলার কাজ আরো ভালো। —বরফ চাই—চাই বরফ—কেমন দুপুর রোদ্দুরে হেঁকে হেঁকে দুপুরের গরমটাকে সুরেলা ঠাণ্ডায় জড়িয়ে দেয়। দুপুর আর বিকেলটা বেণুর ভারী মিষ্টি হয়ে থাকল।

সন্ধ্যার একটু আগেই বাবা কোর্ট থেকে ফিরলেন। মা কালো কোর্টটা গা থেকে খুলে নীরবে আলনায় ঝুলিয়ে রাখছেন। পকেটে হাত দিলেন না। আগে দিতেন, এখন দেন না। থাকলে বাবাই দেবেন। ওঁরা দুজনেই একান্ত নীরব। বেণুও চুপ।

—জামাইবাবু জামাইবাবু, বেণু না—

হঠাৎ ঘরে ঢুকেছে ছোটমামা।

—কি করেছে বেণু ? বাবার স্বর গম্ভীর।

বেণুর অন্তরাত্মা চমকে উঠেছে। বাবার গম্ভীর স্বর, ছোটমামার গলায়, চোখে মজা দেখবার খুশি ওর বুকের মধ্যে হাতুড়ি পিটতে লাগল।

—নতুন জামাইবাবুর কাছে পয়সা চেয়েছে।

শূন্য পকেটের মতই শূন্য ছিল বাবার চোখ। ক্লান্তি, হতাশা বা তারও শেষ কিছু। সেই শূন্য চোখে ছুটে এলো আগুনের শিখারা। বাবা জ্বলন্ত। আগুন বাবার চোখে, মুখে, হাতের আঙুলে। কান ধরে টানলেন : কেন চেয়েছিস ?

কান থেকে আগুন লেগে যাচ্ছে বেণুর শরীরেও। ছড়িয়ে যাচ্ছে, পুড়ে যাচ্ছে। বুকের ভেতর লেগেছে আগুন। আবার কানে মোচড় : বল।

—বরফ খাবো বলে। শুকনো গলা বেণুর।

বরফ খাবি, তার জন্য ভিক্ষে চাইলি ? জিভ টেনে ছিঁড়ে ফেলব।

ঠাস্ করে প্রচণ্ড চড় পড়ল গালে। চোখ অন্ধকার, মাথা ঘুরছে টলমল করছে পা, মনে হচ্ছে পড়ে যাবে। সেই অন্ধকারেই দেখতে পেল ভয়ংকর রুদ্ররোষে আবার উদ্যত হাত। পড়ে যাবে, মা ছুটে এসে জড়িয়ে ধরলেন। কান্না জড়ানো গলায় বললেন :

—মেয়েটা যে মরে যাবে। তার চেয়ে একটু বিষ এনে দাও, খাইয়ে দেব।

উদ্যত হাত নেমে পড়ল। মা বললেন :

—তোকে তো বলেছি, করুর কাছে ভিক্ষে চাইবিনি। আমরা গরীব হ'তে পারি, ভিখিরি নয়। যা নিচে।

—না, নিচে নয়। ওই কোণে দাঁড়িয়ে থাক্ কানধরে একপায়ে। ঠিক একঘণ্টা।

বাবা ভাঙবেন, তবু মচ্‌কাবেন না। একঘণ্টা খাড়া একপায়ে, দু'হাতে দু'কান, সে কিছুতেই ভাবতে পারছে না। পৃথিবীতে এমন ঘটনাগুলো কেন ঘটে। মায়ের কাছে শুনেছে, যখন ছোট ছিল বাবা আদরে জড়িয়ে রাখতেন বুকে। এমন সময় সেকথা মিথ্যা মনে হয়। ভয়, আতংক, যন্ত্রণা মিলিত হয়ে তাকে পা বদল করার কথাও ভুলিয়ে দেয়। দণ্ডবিধান করে বাবা বেরিয়ে গেছেন, দিদিমা মাকে ডেকেছেন রান্নাঘরের কাজে। ছোটমামা সঙ্গীদের খবর দিতে গেছে ঝড়ের বেগে, পা বদল করলে কেউ জানতেও পারবে না—তবু করল না। শুধু চোখের জলে দু'গাল ভেসে গেল।

—বেণু, অ বেণু, পাশ ফিরে শো। অমন কাঁদছিস কেন ? দুঃস্বপ্ন দেখছিস বুঝি ?

মা নাড়া দিয়ে জানালেন মাঝরাতে। দুঃস্বপ্ন নয়, অদ্ভুত স্বপ্ন। মরে গেছে সে। মরে গিয়ে হাল্‌কা, ছোট্ট একটা দোয়েল পাখী। ফুরুৎ উড়ছে, শিষ দিচ্ছে, গান গাইছে। উড়ে উড়ে এখানে, সেখানে, নীল আকাশে। হঠাৎ একটা মেঘ এলো, হঠাৎই একটা নদী, সবুজ বনভূমি, সুন্দর একটা ঘর—অনেকটা রূপকথার মত। হঠাৎ বেণু আর দোয়েল নয় বেণুই। খিলখিল করে হেসে উঠল : কী মজা। বলেই শুনতে পেল, একটা কান্না, করুণ– তীব্র। কোথা থেকে আসছে? উঁকি দিল ঘরে। কেউ কোথাও নেই—সুন্দর একটা খাট তার জন্যই অপেক্ষা করছে, ডাকছে : এসো, বসো। কিন্তু, কান্নাটা? কষ্ট লাগছে তার। ডাইনে দেখল, বাঁয়ে। দেখল ওপরদিকে। নিচে তাকাতেই দেখতে পেল তাদের ঘরটাকে। তাকে মরতে দেখে মা মাথা কুটছেন, উন্মাদিনী, চুল খোলা, কাপড় আলুথালু, তার মরা-দেহটাকে দু'হাতে ধরেছেন জড়িয়ে। মরা বেণু মাকে সান্ত্বনা দিতে চাইছে : মরে গিয়ে সে ভালো আছে, এখানকার চেয়ে অনেক ভালো —অথচ বলতে পারছে না। সেটাই আঁ আঁ শব্দে বেরিয়ে এসেছে।

ঘুম ভাঙতে একটা ক্লান্তি। মা-বাবা আগেই উঠেছেন। মা তার ডান গালটায় হাত বুলিয়ে দিলেন। বাবা সেদিকে তাকিয়েই যেন মাথা নুইয়ে ফেললেন। চা খাচ্ছিলেন, আধখানা খেয়েছেন, সরিয়ে দিলেন পেয়ালা। কোর্টে যাবার আগে ভাতে হাত নাড়াচাড়া করে উঠে পড়লেন। মা বললেন :

—শরীর খারাপ লাগলে নাই-বা বেরুলে।

—না যাই।

বেরুবার আগে তার মনে হল, বাবা যেন আস্তে ডাকলেন—বেণু। এত আস্তে শুনতে পেল না, কিংবা চাইল না।

দুপুরের রোদ মরতে না মরতেই বেজে উঠল বায়োস্কোপওলার ঝুনঝুন্ ঘণ্টা। চৌকোনো বিরাট বাকসটাকে মাথা থেকে নামাল। কাঁধের গামছা দিয়ে মুছল কপালের ঘাম—তারপর ঘণ্টি বাজাতে বাজাতে নাচতে লাগল।

—দিল্লী দেখো, আগ্রা দেখো, দেখো বৃন্দাবন।

নতুন মেসোমশাই সকলকে ডাকছেন।

—বেণু, দেখবে এসো।

না। সে মাথা নাড়লে।

—তুমি তো আর দেখতে চাওনি. আমিই নিজের থেকে দেখাচ্ছি।

—মেজজামাইবাবুকে আমরা কেউ কিছু বলব না। দেখ তুই।

উদার ছোটমামাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করল। মেসোমশায়ের দিকে তাকিয়ে নির্বাক। তিনি দেখলেন মেয়েটার ঠোঁট কাঁপছে থরথর করে— ডানগালে কালসিটে পড়া মস্ত দাগ পাঁচ আঙুলের।

বাকসটার সামনে, পাশে গোল গোল চাকতি। সামনে তিনজন, দু'পাশে দু'জন, ঘিরে দেখছে সব। নাচছে বায়োস্কোপওলা, ছড়া কাটছে :

বাদশা দেখো, বেগম দেখো, কেল্লা দেখো আর
কৃষ্ণ দেখো, রাধা দেখো, দেখো রঙবাহার।

রঙের বাহারই বটে। বুকের মধ্যেটা লাফিয়ে উঠেছিল। দেখাই যাক না—ওইসব উজ্জ্বল লাল, নীল, হলুদ, সবুজ, বেগুনীর গাঢ় রঙীন ঢেউ। পরক্ষণেই নিজেকে নিরাসক্ত দার্শনিক ঔদাসীন্যে নিয়ে এলো। রঙ তার জন্যে নয়, সুর তার জন্যে নয়, সুন্দর তার জন্যে নয়। তার কাছে নিঃস্ব হয়ে আছে, রঙ, রস, সুরের তিনভুবন। তারা গরীব। তার বাবার রোজগার নেই। তবু সান্ত্বনা মেলে না, যে—মাত্র পাঁচ, ছ বছর বয়েস তার। আকাশ তাকে ডাকে, ডাকে পাখীরা, মেঘ; বৃষ্টি, রোদ্দুর। আবার বরফওলা, বায়োস্কোপওলা, আলু কাবলীওলাও।

সন্ধ্যায় ঘরে মা আর সে। বাবা ফিরলেন। হারিকেনের আলোয় দেখতে পেল বাবার হাতে একটা প্যাকেট। ডাকলেন :

—বেণু, এটা নাও।

প্যাকেট হাতে নিয়ে বেণু চুপ। বাবা বললেন :

—খোলো। খুলে দেখো।

খুলতেই বেরিয়ে পড়ল চোখ জুড়নো ঘন নীলরঙের মলাট, রূপালী অক্ষরে লেখা "ঠাকুমার ঝুলি"। আঃ কী সুন্দর। যেন নীল আকাশে উড়ে চলেছে একঝাঁক রূপোলী হাঁস পাখী। পাখীরা ডানার ঝাপটে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে, কাল সন্ধ্যা থেকে আজ সন্ধ্যা পর্যন্ত জমানো দুঃখ, যন্ত্রণা, হতাশাদের। বই নিয়েই ছুটে যাচ্ছিল। ছোটমামাকে দেখাবে। মা বললেন :

—বাবাকে প্রণাম করো। নতুন জিনিস পেলে প্রণাম করতে হয়।

বাবাকে প্রণাম করতেই তিনি বললেন : এবার মাকে।

মাকেও প্রণাম করল। খুশি খুশি মা :

—আজ কোর্টে টাকা পেয়েছ বুঝি ?

—হাঁ, বেণু তুমি নিচে যাও।

দরজা পার হতেই শুনল মায়ের গলা : আর টাকা কই ?

—আর নেই।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে পড়েছে। যদিও বাবা-মা তাকে শিখিয়েছেন : আড়াল থেকে কারুর কথা শুনবে না, শোনা খুব খারাপ। শোনেও না সে। তবু দাঁড়িয়ে পড়ল। শোনা গেল মায়ের গলা :

—অত দাম দিয়ে নাই বা কিনতে। হাসিখুশি এনে দিতে।

—সে ওর আছেই।

—না, ওই জাতীয় কিছু, তাহলে দুয়েকটা টাকা থাকত।

—থাকত না মায়া। টাকা আমি পাইনি।

—তাহলে ? অবাক্ মায়ের গলা।

—বইটা ধারে এনেছি। দোকানি আমার চেনা।

বেণুর পায়ে দু'টো সুখপাখি ডানা ঝাপটিয়ে প্রস্তুত হচ্ছিল উড়বে বলে, ঠোকর খেয়ে মুখ থুবড়িয়ে পড়ল। বইটাকে বুকে ধরে আস্তে আস্তে সিঁড়ি ভাঙল। ভাঁড়ার ঘরে। লণ্ঠন জ্বালিয়ে তরকারি কাটছেন মায়ের দূরসম্পর্কীয়া বালবিধবা পিসিমা, ছোটদিদিমা, তাঁর

মুখটাও দুঃখী দুঃখী। সেখানে বসে বইটা খুলতেই বেরিয়ে পড়ল—সুয়োরানী—দুয়োরানীর গল্প।

দুদিন বাদেই ছোটমাসি এসে জাঁকিয়ে বসল আমাদের ঘরে। এমনিতেই ভয়ডর ছিল না। বাঙলার বাইরে বিয়ে হয়ে ক'মাসেই বেশ ঝকঝকে হয়ে এসেছে। হিন্দী বুলিও রপ্ত হয়েছে। জল্দি, দুরন্ত, থোড়ি ইত্যাদি। ঘরে ঢুকল, একঝলক খুশির হাওয়া। আমাদের মৃতঘরটা চমকে উঠল।

—জামাইবাবু, কাল সবাইকে নিয়ে আমি কিন্তু সীতা নাটক দেখব। আপনাকে, মায়াদিকে, বেণুকেও যেতে হবে।

বাবার স্তিমিত কণ্ঠ : আমাকে বার বার অনুরোধ কোর না মণি, আমি যেতে পারব না। মাঝখান থেকে তুমি দুঃখ পাবে, আমিও। তোমার দিদি আর বেণুকে নিয়ে যাও।

বেণুর বুক উত্তাল। থিয়েটার কি বস্তু সে জানে না। বাবার কথায় আনন্দের হাওয়া বইছিল বুকে। মার কথায় থেমে গেল। গুমোট গরম। নিশ্বাস নিতেও কষ্ট। শুনল :

—আমারো যেতে ভালো লাগছে না, মণি।

ছোটমাসি সজোরে ঠোঁট কামড়ালো। জানাই ছিল, জামাইবাবু, অন্যের খরচে দেখবেন না—আর মায়াদিটা স্বামীর ছায়েবানুগতা। একটু ভেবে বলল :

—বেশ, আপনারা না-যান। বেণুকে অন্তত যেতে দিন।

মা নিঃশব্দে চাইলেন বাবার দিকে। মায়ের চোখের ভাষা বেণু পড়ল : আহা, ছেলেমানুষ। একটু খুশিই হোক না।

—বেশ, বেণুকে নিয়ে যাও।

থেমে যাওয়া হাওয়াটা বইল আবার। ঝুরুঝুরু, ঝিরিঝিরি। আঃ, কী ভালো মণিমাসি। কী ভালো মা-বাবা। খুব ভালো।

চারখানা গাড়ি ভরল। টাগুর-টুগুর, টাগুর-টুগুর, গলি পার হয়ে বড়োরাস্তা, তারপর ট্রামরাস্তা কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট—নাট্যমন্দিরের

সামনে এসে থামল। পুরুষদের নিয়ে মেসোমশাই নিচে বসবেন, ছোটমাসি মেয়েদের নিয়ে ওপরে। সতরঞ্চি পাতা গাড়ি বারান্দায় সকলকে নিয়ে মণিমাসি জাঁকিয়ে বসল, বেণুকে বসাল পাশেই। ডালমুট চীনাবাদামভাজা মণিমাসি ফরমাস্ করছেন, হুকুম তামিল করছেন মেসোমশাই। দুজনেরি হাসি হাসি মুখ।

—বেণু, হাত পাত।

—এখন থাক্। অস্ফুটে বলল।

—থাকবে কেনরে? এখনি নাটক শুরু হবে নাকি? ঘণ্টা বাজবে, পর্দা উঠবে, ঢের দেরি। এত আগে এসেছি সামনে জায়গা পাব বলে। নে ধর্।

হাসছে মণিমাসি। খুশিতে ঝলোমলো। সৌভাগ্যের ভরাপাত্র থেকে কিছু ছড়িয়ে ছিটিয়ে না দিয়ে পারছেন না। যার মধ্যে আর্তবেদনা, ম্লানমুখ, কোনো আনন্দে অংশ নিতেও পারেন না। বাবার ভালো আয় থাকলে মাও হতেন মণিমাসির মত। উজ্জ্বল না হলেও উজ্জ্বল। লালপাড় শাড়ীর ঘোমটা মাথায় দু'হাতে দিচ্ছেন সবাইকে, যেন অন্নপূর্ণা। বেণু কি কোনোদিনও সুখী করতে পারবে এই দুঃখী মাকে? হলই বা সে মেয়ে। হাতে করে খাবার ধরে বসে থাকা বিষণ্ন মেয়েটাকে মণিমাসি তাড়া লাগালেন:

—অমন দুঃখী দুঃখী মুখ করে বসে আছিস কেন? কী বোকা মেয়েরে। সীতা কি এখুনি পাতালে প্রবেশ করে গলেন। খা। খেয়েনে।

নুন. টক. ঝালঝাল ডালমুট, চীনাবাদাম ভাজার সোঁদা গন্ধে মুখ ভরে গেল। হঠাৎ নাট্যনিকেতনের পরিচারিকা উঁচু, তীক্ষ্ণ গলায় হেঁকে উঠ্ল:

—বাগবাজারের চৌধুরী বাড়ির কে এয়েচ গো, শোভাবাজারের দত্ত বাবুরা নিচে ডাক্চেন।

ফিক্ করে হেসে ফেলল বেণু। হাসতেই বিষণ্নতা বলল: এবার তবে আসি। মায়ের ম্লানমুখ মিলিয়ে যাচ্ছে ধীরে। জেগে উঠেছে

**নাট্যনিকেতন : গিসগিস করা লোকজন, উঁচুগলার পায়চারিকার হাঁকডাক, মণিমাসির হাসিগলা। সামনে বিরাট পর্দা, তাকে ফিস্‌ফিস্ করে বলছে :**

একটুও আনমনা হবে না—এখনি আশ্চর্যকে দেখাব।

ঘণ্টা বাজল ছন্দে—বেণু উৎকর্ণ, উদ্‌গ্রীব।

আবার বাজল—ঘরের অর্ধেক আলো নিভে গেল—আবার বাজতেই বাকি আলো নিভে অন্ধকার। ধীরে সঞ্চরমান যবনিকা। দু'চোখ নিবদ্ধ, উৎকর্ণ দু'কান, উত্তাল-হৃদয় বেণু দেখছে : স্থির পর্দা অস্থির—অস্থির কিন্তু সরছে ধীরে—একটা আলো ছড়িয়েছে মঞ্চে সবুজে-সুনীলে মেলা। সেই সবুজে-সুনীলে আশ্চর্য এক নারীমূর্তি। বেণুর মনে লাগল! সে আসেনি, সেখানেই দণ্ডায়মান ছিল আবহমান-কাল। পর্দা সরে গিয়ে তাকে উন্মোচিত করল। দীর্ঘ-তন্বী, রজনীগন্ধার দণ্ডের মত সতেজ-সরল স্থির প্রতিমা মুখর হল :

"কথা কও, অনাদি অতীত, অনন্ত রাতে, কেন বসে চেয়ে রও।"

জীবনে অভিনবকে প্রথম অনুভব করল।

গান থামলে, অভিনয়। যা দেখছে তাই আশ্চর্য। অবাক্ করা সব দৃশ্যপট। সীতা নিদ্রিত। মাথার পাশে বসে রামচন্দ্র তালবৃন্তে ব্যজন করেছেন। ঝালর লাগান কারুকাজে ভরা পাখাটি। কৃত্তিবাসের রামায়ণ সবেই শুরু করেছে। বলতে পারবে না, রামচন্দ্র জানকিকে তালপাখার হাওয়া করেছেন কি করেননি। ভারী মিষ্টি লাগছে। লেখা থাক বা না থাক্। ঠিক যেন ছোটমাসি আর মেসোমশাই। অবশ্য মেসোমশাই মাসিকে হাওয়া করেন কিনা, সে জানে না। দেখেছে মা হাওয়া করেন বাবাকে, তাকে। বাবাকে দেখেনি মাকে হাওয়া করতে। না-দেখলেও ভালো লাগল তার। বেশ নতুন, অবাক করা—মিষ্টি—দারুণ মিষ্টি!

একটা গুঁতোয় চমকে উঠল, মণিমাসি ফিস্‌ফিস্ করছেন—রাম সেজেছেন শিশির ভাদুড়ী, আর সীতা প্রভাদেবী।

ভালো লাগল না। সে-রাম-সীতাকেই দেখতে চায়, কেউ

সেজেছেন জানলে মিষ্টি ভাবটা চলে যায়। তারার দুমুখ, কাঁদতে কাঁদতে উর্মিলা—দুঃসংবাদ জেনেছে সে। আর একখানা আশ্চর্য, গান, নারীকণ্ঠ নয়—পুরুষকণ্ঠ। ভরাট দরাজ গলায় গম্‌গম্‌ করে বেজে উঠ্‌ল অতবড় প্রেক্ষাগৃহ।

"অন্ধকারের অন্তরেতে অশ্রু-বাদল ঝরে"

মীড় কাকে বলে জানে না বেণু, জানে না কাকে বলে গমক। তবু মীড়ের টানগুলোতে বুকে টান লাগল আর বাদলের ওপরকার কল্পনাটা ওকে ভেতরে ভেতরে কাঁপিয়ে তুলল।

সুরাহত বেণুকে আবার আহত করলেন মণিমাসি :—কানাকেষ্ট, কৃষ্ণচন্দ্র দে, চোখে দেখেন না। দেখছিস্‌ না একটা ছেলের কাঁধে হাত রেখে এসেছেন।

পিছনের মহিলা রেগে উঠলেন : যা বলবেন বাড়ি গিয়ে। আমাদের শুনতে দেবেন না ?

বড়ো হয়ে সমস্ত দৃশ্যপট স্মরণে আনতে পারবেন না। বনানী রায় এবং রায় চৌধুরী। আজীবন স্মরণে থাকবে ; যবনিকা সরতে থাকা, দাঁড়ানো তুলনাহীনা সবুজে-সুনীলে। সে কত দীর্ঘ ছিল, তন্বী, রজনীগন্ধার সরল সবল দণ্ড, অথবা রোমান স্টাচু মিনার্ভা কিংবা দণ্ডায়মানা ভারতী শ্বেত-সরস্বতী, বলতে পারবেন না। অনুভূতিটা কঠোর। উক্ত অপেক্ষা অনুক্তের।

ছোটমাসি, মেসোমশাই চলে গেছেন। বছর দেড়েক হয়ে এলো। চলছে দিন একই ভাবে। বাবার কালো কোট নীরবে তুলে রাখছেন মা। কোটের পকেটে হাত দিচ্ছেন না—ক্বচিৎ বাবাই বার করে দিয়েছেন। সকাল-সন্ধ্যা পড়া, কখনো পুরস্কার, কখনো শাস্তি। বিকালে খেলা, ছেলে সঙ্গীদের কাছে পাওয়া পরিহাস, অনেক সময়ই তার নামে আনা মিথ্যা অভিযোগ এবং প্রত্যুত্তরে পাওয়া প্রহার প্রচণ্ড।

নতুন কিছুর জন্য বেণু ব্যাকুল :

—মা, আমি স্কুলে পড়ব। সরোজিনী, টেঁপী, রিণি সবাই পড়ছে।

—ওরা তোর চেয়ে দু'তিন বছরের বড়ো। বড়ো হ' আগে।

বললেন বটে, কেমন যেন ঢোঁক গিলে। পরদিনই বাবা বললেন : স্কুলে তুমি যাবে না, মিথ্যে সময় নষ্ট, তুমি অনেক বেশী পড়ছ, পড়বে। এগারোতেই ম্যাট্রিক দেবে।

বই সে পড়ছে। ভালো লাগে রামায়ণে রামের বিলাপ

গোদাবরী তীরে আছে কমল কানন

সেথা কি কমলমুখী করেন ভ্রমণ ?

মনে পড়ে যায় সীতা নাটক। তবু স্কুলের জগৎ যে নতুন জগৎ। এই জগতের দরজাটা খুলবে না তার জীবনে ? একঘেয়ে জীবনে ভালো পড়া পারলে রবিবার পুরস্কার জোটে। হেদুয়ার পাশে চায়ের দোকানে নিয়ে যান। হরতনের টেক্কার মত কেকটা, খানিকটা চা ঢেলে নেন পেয়ালা থেকে। যেদিন টাকা বার করে দেন পকেট থেকে, তার পরের রবিবার কোনোদিন চিড়িয়াখানা, জাদুঘর বা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে। কখনো রিলিফম্যাপ এনে বন্ধুদের সামনে ডাকেন তাকে :

—বার করো নদী মিসিসিপি, একটুও দোনোমনো নয়, সোজা পেনসিল টেনে দেখাও।

তখন বাবার চোখে খুশি। গলার স্বরে গর্ব গর্ব ভাব জড়ানো।

—মা, আমরা দেশের বাড়িতে যাইনে কেন ? বড়মাসিরা তো যায়।

—যেতে আসতে অনেক খরচ, বেণু।

—তাহলে অনেকদিনের মত যেতে পারি। তুমি আর আমি।

—একবার গিয়েছিলাম।

—ওমা—কই, আমার মনে নেই তো ?

—তুই তখন আট মাসের। ছ'মাস ছিলাম, আর যাইনি।

—কেন ? অসম্ভব অবাক্ বেণু।

—ছ'মাস তুই দুধ পাসনি। বার্লি খাইয়ে রাখতাম। তোর অসুখ করল। জীবন-মরণ প্রশ্ন।

মায়ালতার দীর্ঘশ্বাস পড়ল। ফ্রকটা খুলে নিয়ে অন্য ফ্রক পরাবেন, বুকের হাড়ে আঙুল বুলিয়ে বললেন:

—এত রোগা তুই ছিলিনে বেণু। এর পর থেকেই রোগা হয়ে গেলি।

মায়ালতার কণ্ঠস্বরে বেণু কী বুঝল কে জানে। শুধু এইটুকুই বুঝল এর মধ্যে অনেক কথা রয়ে গেছে গোপনে। ঠিক্ করল আর কোনদিন এ প্রশ্ন করবে না।

ছোটমেয়ে বন্ধ দরজা পেলেই ঘা লাগায়

কে জানে, কোথায় আছে অবাক—ভুবন?

কলকাতা বাসের পাঠ উঠল। দাদামশায় অবসর নিয়েছেন। বাঁধাছাঁদা হচ্ছে। বড় বড় কাঠের বাকস ভরছে জিনিসপত্রে।

—তোরা কোথায় যাবি?

—রাজশাহী।

—অনেক দূর নারে? আমাদের জন্যে মন কেমন করবে?

—হয়তো জীবনে আর দেখাই হবে না।

জন্ম থেকে যে বাড়িতে সাড়ে ছয় বছর কাটল, সে বাড়ি ছেড়ে যেতে তার মনে কোনো দুঃখই নেই। কলকাতা ছেড়ে যেতেও তার কষ্ট নেই। তার আকাশ ঢেকে আছে অসংখ্য ইঁটকাঠের বাড়িতে অথচ তাদের জন্যে ছোট একখানা বাড়িও নেই। বড়ো নিষ্ঠুর শহর এই কলকাতা।

অবশ্য হঠাৎ হঠাৎ বাবা যখন তাকে নিয়ে যান, জল ছলোছলো সবুজ ঘাসের, ফুলের গড়ের মাঠে, মূর্তিভরা জাদুঘরে, পাখিডাকা, জীবজন্তুর হাঁকডাকে ভরা চিড়িয়াখানায়, তখন বেণু ভুলেই যায় তাদের বাড়ি নেই। তখন মনে হয়, কলকাতা তার বুকের ভেতর থেকে অনেক অনেক ভালোবাসা বাহির করে থরে থরে সাজিয়ে রাখছে। মনে মনে বলে: ওয়েসিস্। সম্প্রতি ভূগোলে পড়েছে:—বিস্তীর্ণ মরুরাশি মধ্যে কোথায়ও সঞ্চিত জলধারা, চারদিকে সবুজ গাছপালা। ক্লান্ত মানুষ, ক্লান্ততর প্রাণী জলসন্ধানী উট মরু পার হতে হতে দীর্ঘ-

গ্রীবা—আরও দীর্ঘ করে আসে সেখানে। এদিকে উট এখনো দেখেনি, দেখেছে ছবিতে। চিড়িয়াখানায় উটপাখি দেখেছে দীর্ঘগ্রীবা।

নতুন কিছু পেয়েও যেতে পারি, নতুন জায়গায়।

কদিন বেণু খুশি খুশি। তবু গাড়িতে চড়বার সময় চোখ জলে ভরে গেল। ভিড় করে দাঁড়িয়েছে সরোজিনী, টেঁপী, রিণি, রাজা আরও কতজন। এদের আর দেখতে পাবে না কোনোদিনও। বাবাও যাচ্ছেন না, একটা মেসে থাকবেন। মার ম্লানমুখ ম্লানতর। বাবা গাড়িতে যাচ্ছেন, শেয়ালদাতে ট্রেনে তুলে দেবেন। থেকে থেকেই বাবার হাত বেণুর মাথায় এসে পড়ছে, চলন্ত গাড়িতেও বুঝতে পারছে সে হাত কাঁপছে থরথর করে। হঠাৎ হুহু করে বেণু কেঁদে উঠল। বাবা তাকে বুকে টেনে নিলেন। তার মনে হল, বাবা যদি বুকের মাঝখানে একটা ছোট চিলতে ঘরও পেতেন, ধরে রেখে দিতেন, যেতে দিতেন না।

পরদিন রাতে রাজশাহী। কেমন দেশ বোঝাই গেল না। ভোরে ঘুম ঘুম চোখে ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে অবাক। উঠোন আলো করে ফুটে আছে সব ফুল। কোনটা নাম জানা, বেশীর ভাগই নাম-না-জানা। পাঁচিল ঘেঁষে ঘেঁষে ছায়াঘনানো বড়ো বড়ো গাছ—আমড়া, পেয়ারা, আম, কাঁঠাল, বাঁদিকে টিনের আটচালা—দুটো গোরু আধশোয়া, জাবর কাটছে—সতৃষ্ণনয়ন দুটো বাছুর দূরে দাঁড়ানো—সবকটাই দড়ি দিয়ে বাঁধা। কলকাতায় এসব ভাবাই যায় না। সেখানে দিদিমার পূজার ফুল আসত বাজার থেকে কলাপাতায় মুড়ে। গয়লানী ঘড়া করে দিয়ে যেত একঘড়া দুধ।

উঠোন পার হল, পার হল আলো করা ফুলের বাগান। বাগান পার হয়ে খোলা জায়গাটায় দাঁড়াতেই চমকে থমকে গেল। তারপর তরতরিয়ে নেবে এলো উঁচু পাড় থেকে নিচুতে। সামনেই নদী। বয়ে চলেছে—ছলাৎছল, ছলাৎ-ছল্, ঢেউ তুলে তুলে। ওপারে সীমাহীন সবুজ ক্ষেত, ছায়া ছায়া বড়ো গাছ দূরে—সবুজ লাগল না, লাগল নীলাভ। আকাশটা আশ্চর্য লাল—রাশি রাশি মুঠো মুঠো, জবাফুল

ছড়াচ্ছে আকাশ। লাল আলো মুখে, বুকে নদী ছুটে চলেছে, ওপারে সবুজ ক্ষেত, এপারে রাজশাহীর রামপুর-বোয়ালিয়া শহর। তীরে এলো বেণু, ছুটে নয়, নেচে চলেছে নদী। মুখ ঝুঁকিয়ে বস্‌ল। জলের আয়নায় তার মুখের ছবি তিরতির কাঁপছে। হাত দিয়ে ছুঁল জল। পুলক বয়ে গেল। আস্তে পায়ের পাতা দিল ডুবিয়ে। অজানিতেই বুকের ভেতর থেকে একটা শব্দ উঠে মুখ দিয়ে বার হয়ে পড়ল

—আঃ

—তোমাকে কখনো দেখিনি। কোথায় ছিলে এতদিন ?

জল জলতরঙ্গ বাজাল।

—কলকাতায়। কাল রাতেই এসেছি। এই সামনের বাড়িতে। বলেই বড়ো অতৃপ্তি জাগল, ঠিক জবাব দেওয়া হল না। জলের জলতরঙ্গের জবাব রিনিঠিনি সুরেই দেওয়া যায়। জল আবার রুনুঝুনু বাজল :

—তোমার নাম কি ? আমি পদ্মা !

—আমার নাম বেণু।

এবার জলের বাজনায় বেহালার ছড়ের মীড় :

—তোমার চোখ অত বিষণ্ণ কেন ? বেণু, তোমার বন্ধু নেই ? পদ্মার ওপর ঝুঁকে পড়ল, যেন হুমড়ি খেয়ে পড়ল.

অবুঝ গলায় বলল :

—আমার কোনো বন্ধু নেই। তুমি আমার বন্ধু হবে, পদ্মা ? পদ্মা বলল : হবো।

পদ্মাই তাকে জানিয়েছিল বন্ধুত্বের নিবিড় সময়।

—এরপর আমার আর মরবারও সময় থাকবে না। একরাশ লোক আসবে, স্নান করবে, চোখ বুজে পুজো করবে বুকজলে দাঁড়িয়ে। সূর্যস্তব, শিবস্তোত্র, বিষ্ণুস্তোত্র আবার কেউ কেউ দেবী সুরধুনী, ভগবতী গঙ্গে।

—সক্কলেই ? বেণু প্রশ্ন করেছিল।

—সকলে নয়। স্কুল-কলেজের ছাত্ররা, ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা স্নান করবে, সাঁতার কাটবে, ঝাঁপাই-ঝোড়। জলঘোলা করে, পাড় কাদা করে ছাড়বে। আমার খুব ভালো লাগে ওদের দুষ্টুমি।

বেণুর মনে হল পদ্মা যেন মা। তবু লজ্জা। মুখ নিচু, বলল :

—আমি ডুব দিতেই জানিনে।

—কিছু ভেবো না। আমি তোমাকে হাত ধরে সব শিখিয়ে দেব।

বেণু আসে দুপুরে। মধ্যাহ্ন-অপরাহ্নের মধ্যবর্তী সময়ে। ঘাটে বিরাট মহাজনী নৌকাগুলো বাঁধা। দেশ-দেশান্তর থেকে এসেছে। মাঝি-মাল্লারা খাওয়া-দাওয়া আরাম করছে। স্তব্ধ, নির্জন। পদ্মা হেসে বলল :—বোসো।

পা ডুবিয়ে বসল আরাম করে

—বেণু, তুমি গান জানো?

—গান? শিখেছিলাম ছোটমাসির কাছে একটা, দুটো। তেমন ভালো শিখিনি।

—গাও না। আমার কাছে লজ্জা কিসের। আমি তো বন্ধু।

বেণু সরু গলায় গান ধরল :

দূরদেশী সেই রাখাল ছেলে
আমার বাটে বটের ছায়ায়, সারাবেলা গেল খেলে। আ—হা।
গাইল কী গান সেই তা জানে
সুর বাজে তার আমার প্রাণে
বলো দেখি তোমরা কী তার কথার কিছু আভাস পেলে। আ—হা।
আমি তারে শুধাই যদি কী তোমারে দিব আনি
সে শুধু কয়, আর কিছু নয়, তোমার গলার মালাখানি
দিই যদি সে কী দাম দেবে
যায় বেলা সেই ভাবনা ভেবে
জেগে উঠে দেখি ধুলায় বাঁশিটি তার গেছে ফেলে। আ—হা।

—সুন্দর—খুব সুন্দর। বেণু, তুমি এর মানে বুঝতে পারো ?

—মানে—মানে —বেণু আম্‌তা আম্‌তা করছে।

—না, ঠিক্ ঠিক্ মানের কথা বলছি না। ওই আভাস পাওয়া।

—তোমাকে তবে সত্যি বলি ভাই, ছোটমাসি যখন শেখালেন কিছু বুঝিনি। আরো ছেলেমানুষ। তাছাড়া তখন রাখালও দেখিনি, দেখিনি পথের ধারে বটগাছ ঝুরিনামা।

—আর এখন ?

—এখন দেখেছি গোরু চরানো রাখাল ছেলে তুপুর রোদ্দুরে আরাম করছে ঝুরিনামা বটের ছায়ায়।

বেণু বলে উঠল :

—জানো পদ্মা, তোমার এই ধুধু থরথর কাঁপা চরে তোমাকে গান শোনাতে গিয়ে কেন জানিনে এই গানটাই মনে পড়ল। মানে যদি বলতে বলো, বলতে পারব না। কিন্তু, মনে হল, এই গানটা, এইখানে, এই রোদ্দুরে খুব মানায়।

পদ্মা হেসে উঠল : বেণু, তুমি কবি হবে।

কদিন পরেই দ্বিতীয় গান।

জীবনে যত পূজা হোল না সারা
জানিহে জানি তাও, হয়নি হারা॥
যে ফুল না ফুটিতে ঝরেছে ধরণীতে
যে নদী মরুপথে হারালো ধারা
জানিহে জানি তাও হয়নি হারা॥

শেষ হবার পর তুজনেই নির্বাক দূরাগত বেহালার ছড় টেনেছিল পদ্মা :

—গানটা বড়ো তুঃখের। এ গান তোমাকে কে শেখাল ?

—মা শিখিয়েছেন।

—তোমার ছোটমাসি খুব হাসিখুশি মা তুঃখী তুঃখী।

—কী করে জানলে তুমি ? কাউকেই তো দেখনি।

—তোমার ছোটমাসি দেব কি দেব না দোনমনা হয়েও বাঁশি

পেয়ে গেলেন। আর মায়ের পুজা সারা হল না। তাঁর নদীজল হারিয়ে গেল মরুবালু পথে।

—জানো পদ্মা, আমার মা বড়ো দুঃখী।

—হয়তো সবটাই নয়। তোমার মা কিন্তু দুঃখটাকে হাল্‌কা করতে চেয়েছেন, ভাবতে চেয়েছেন দুঃখেই সব শেষ নয়।

পদ্মা সান্ত্বনা দিল। বেণু বলে উঠল:

—তোমাকে একটা কথা বলি। সেদিনের গান আর আজকের গান এক মানুষেরি লেখা।

—সেকী। অবাক পদ্মা। নাম কি তাঁর?

—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

খুব সম্ভ্রমে উচ্চারণ করল বেণু শ্রদ্ধায়। একটি একটি স্পষ্ট উচ্চারণে গভীরতা দিলো জড়িয়ে।

—বাবা-মা দুজনেই বলেন, রবিবাবু। মা বলেছেন, অত বড় কবি আর নেই।

—জানো বেণু যাঁরা খুব বড়, তাঁদের হৃদয়ের মধ্যে অনেক জায়গা। অনেক সুখের—দুঃখের, আনন্দের—ব্যথার। ধৈর্যের, আশ্বাস-আশ্রয়ের। তাঁদের ভাবনাগুলো, চিন্তাগুলো, কথাগুলো, চারদিকে বিচ্ছুরিত হতে থাকে। যেন গ্রীষ্মের দুপুরে ঝুরিনামা বটগাছ, মাঘের শীতে সূর্যের কিরণ। অনেক মানুষ অনেক রকম অবস্থায় আশ্রয় পেয়ে যায়।

বেণু আস্তে বলে: যেমন তুমি। কতজনকে আশ্রয় দিচ্ছ। কত মানুষ স্নান করছে, খাচ্ছে তোমার জল। তোমার বুকের ওপর দিয়ে কত নৌকা দেশ-দেশান্তরী।

পদ্মার জল ঈষৎ রাঙা হল। খুশি খুশি বাজল জলতরঙ্গ:

—কীযে বলো। কার সঙ্গে কার তুলনা। আমি কি করি? আমি নদী।

এত বন্ধুত্ব সত্ত্বেও একটা কথা জিজ্ঞাসা করে উঠতে পারে না, মাঝে মাঝেই এমন সর্বনাশা মূর্তি তার হয়ে যায় কেন? কাল-

বৈশাখীতে অতবড় নৌকো, যেন কাগজের নৌকো। দুলছে, টলছে, মাঝিমাল্লার ভয়ার্ত চীৎকার—হেঁই সামালো—গাজী বদর বদর—পাল টেনে নাবাচ্ছে। উলটিয়ে গেল—মাঝিমাল্লারা সাঁতার কেটে ওঠে এ-তীরে, ও-তীরে। একজন আর ওঠে না। ভরা বর্ষা। পাড় ভেঙে ভেঙে পড়ছে প্রতিদিন—কাল যেখানে ভাঙা ছিল আজ জলের ঢেউ। দল বেঁধে এলো ছেলেরা—ঝপাং ঝপাং। রব উঠল—গেল গেল—ডুবল—ডুবল। একজন পড়ে গেছে ঘূর্ণীতে—পাক খাচ্ছে। বন্ধুরা সাঁতার কেটে কাছে যাবার আগেই—দু'হাত তুলে শেষ চেষ্টা—তলিয়ে গেল অতলে। বুকের মধ্যে অঝোর কান্না: পদ্মা, কেন এমন করলে তুমি? কেন ফিরিয়ে দিলে না ছেলেটিকে? কি লাভ হল তোমার। মানুষের সর্বনাশে তোমার আনন্দ? পদ্মা প্রমত্তা তখন উন্মাদিনী। এলোচুলে খলখল হেসে ছুটে চলেছে। তখন তার জলে হাজার ঢাকের বাদ্যি। বেণুকে চিনতেও পারছে না। পদ্মার রাক্ষসী রূপের সামনে বেণু স্তম্ভিত। বড়ো জটিলতা। একটা অস্পষ্ট অনুভব হয় তার।

এই পৃথিবী, প্রকৃতি, মানুষ সমস্তই সৃষ্টি আর ধ্বংসের জটিলতায় জড়ানো।

জীবনে যে দরজাটা খুলবে না ভেবেছিল, খুলে গেল সেটাই। মায়ালতা বেণুকে স্কুলে ভর্তি করলেন। সুন্দর লালরঙের বাড়ি। চমৎকার কম্পাউণ্ড। সবচেয়ে সুন্দর ক্লাসটিচার সুষমাদি। যেমন মিষ্টি চেহারা তেমনি মিষ্টি স্বভাব। লোভনীয় অজানা শব্দগুলি এখন তার খুব চেনা। ক্লাসটিচার, হেড্‌মিস্‌ট্রেস্‌, পীরিয়ড, ডাস্টার, ব্ল্যাকবোর্ড, টিফিন, মনিটর। জানে, পড়া বলতে হলে কিংবা কোনো প্রশ্নের জবাব দিতে বেঞ্চ ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে হয়। ক্লাসের প্রথম পীরিয়ডেই নাম ডাকল সুষমাদি। খাতা খোলেন, বেণু জানে কখন আসবে তার নাম। প্রস্তুত হয়।

—কুমারী বেণু রায়।

—প্রেজেণ্ট প্লিজ। তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়েছে বেণু।

প্লিজ শব্দটির প্লিজিং সোনালী অনুভব তিরতির করে ছড়িয়ে পড়ছে বেণুর মনে। কোনো একদিন একেই কি সে বল্‌বে, "মাই গোল্ডেন ডেজ্"। আমার সোনালী দিনগুলি।

একে একে দরজা খুলছে। খুলেছে পদ্মা-প্রকৃতির দরজা। খুলেছে স্কুলের। এবার খুলল লাইব্রেরীর। স্কুল লাইব্রেরী ছাড়াও পাড়ার লাইব্রেরীর। লাইব্রেরীটা ভারী মজার, চাঁদা নেই। থাকলে মা আর চাইতে পারতেন না দিদিমার কাছে। স্কুলের মাইনের জন্যেই মরমে মরে আছেন। সামনের বছর স্কলারশিপ তাকে পেতেই হবে। মজার লাইব্রেরীর উদ্ভাবন কয়েকজন যুবকের। প্রত্যেক বাড়িতে একটা করে হাঁড়ি রেখে আসেন, দু'বেলা দু'মুঠো চাল। রবিবার সংগ্রহ-দিবসে হাঁড়িতে জমে চোদ্দমুঠো চাল—পরিবর্তে একটা ফ্রী-মেম্বারশিপ। বেণু লুব্ধ হয়ে উঠেছে। স্কুল থেকে ফিরে জলযোগ সেরেই লাইব্রেরী। বুক দোলানো সব বই। সুকুমার রায়ের, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শোভনলাল-মোহনলাল, ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়ের Kari the Elephant-এর অনুবাদ যুথপতি আর সেই মন মাতানো পায়রাটি চিত্রগ্রীব। বন্ধু শব্দটা উচ্চারণ করে বেণু। বন্ধু, বন্ধু, এক বন্ধু তার পদ্মা আর এক বন্ধু লাইব্রেরী। পদ্মা তাকে হাতে ধরে এক পৃথিবীর সঙ্গে পরিচয় করিয়েছে, যেখানে জল, স্থল, আকাশ, সূর্য-তারা, চাঁদ। যেখানে জ্যোৎস্না, অন্ধকার, মেঘ-রোদ্দুর-একঝাক পাখি—একলা ডাকা ঘুঘু। লাইব্রেরী তাকে নিয়ে যায় আর এক অকুলা জগতে। যেখানে অনেক অন্য অন্য ঘর, যেখানে অনেক অন্য অন্য মানুষের কণ্ঠস্বর। একদিন লাইব্রেরী না-যেতে পারলেই তার কষ্ট হয়। আবার এক একদিন লজ্জা এসে ঘিরে ধরে।

সেদিন সন্ধ্যা হয়ে যায়। আকাশ-গোধূলি। রাঙা আলোয় মাঝি-মাল্লারা গামছা বিছিয়েছে নৌকার পাটাতনে নামাজ পড়বে।

তীরে শিবমন্দিরে ঘণ্টা বেজে যায় সন্ধ্যা-আরতির। এইমাত্র কে যেন গান শেষ করল পুরবীতে :

বেলা গেল তোমার পথ চেয়ে।

বেণু বসে নতমুখ।

—অনেকদিন তোমার কাছে আসিনি। রাগ করোনি তো ভাই পদ্মা ?

—না না, রাগ করব কেন? এখন তোমার স্কুল, লাইব্রেরী, স্কুলের পড়া।

পদ্মা অনুধাবন করে বেণুর লজ্জা, অনুশোচনা। বলে :

—আমি জানি, সময় করতে পারলেই তুমি আসবে।

সোনালী অনুভব স্থায়ী হতে পারে না। বাবার জন্যে মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে আজকাল। মিথ্যে বলবে না। প্রথম প্রথম তার মনে হোত বাবা বরাবর কলকাতায় থাকেন, সেই ভালো। বাবা দূরে আছেন বলেই এমন স্বাধীনতার স্বাদ। পদ্মাতীরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, স্কুলে ভর্তি হয়েছে, লাইব্রেরীতেও যাচ্ছে। দু'চারটে বকুনি খেলেও এ ও তার কাছে, মার খেতে হচ্ছে না। কিন্তু মুহূর্তে মনে পড়ত চলন্ত গাড়িতে বাবার সেই বুকে চেপে ধরাটা। বুক হুহু করে উঠত তার। ও বেণু, তুমি এমন স্বার্থপর কেমন করে হলে ?

বাবা এর মধ্যে কয়েকবার এসেছেন। প্রতিবারই এনেছেন নতুন বই। যাবার সময় বেণুকে বুকে চেপে ধরেন। সেই দণ্ডদাতা পিতাকে কোথাও খুঁজে পায় না। এবার এনেছেন "কথা ও কাহিনী"। বই খুলতেই নিঃশ্বাস রুদ্ধ হয়ে এসেছিল। বেণু জানত না, সেই আশ্চর্য গানটি কবিতা।

"কথা কও, অনাদি অতীত, অনন্ত রাতে কেন বসে চেয়ে রও।"

যাবার সময় প্রতুলচন্দ্র তাকে বুকে চেপে ধরলেন। বেণু দেখলো কত রোগা হয়ে গেছেন বাবা। সুগোল মুখের ডৌল লম্বাটে হয়ে গেছে। তাঁর সুন্দর ঠোঁট দুটি হাসলে সুন্দর মানায়, নেবে পড়েছে

নিচের দিকে। যেন কান্না চাপছেন। শূন্য চোখ দুটি আর্ত। তার মনে হয়—বাবা অল্পবয়সে একটা স্বপ্ন দেখতেন, সুন্দর স্বপ্ন। সেই স্বপ্নটা ভেঙে গেছে। আর তাকে খুঁজেও পাচ্ছেন না। এখন কী ভাঙা মুখ, কী ভাঙা চোখ। বুকের মধ্যে তীব্রবোধ ফেনিয়ে উঠল — কষ্টের মত, ব্যথার মত, কান্নার মত। হঠাৎই দু'হাতে বাবাকে জড়িয়ে ধরল। ঠিক মেয়ের মত নয়।

প্রতুলচন্দ্র নিচু হয়ে তার মাথার ওপর মুখ রাখলেন। অস্ফুটে বললেন :—আমার ছোট্ট মা।

ছোটমাসি এলেন মধ্যভারত থেকে। সকলেই বলল—খুব সুন্দর দেখাচ্ছে মণিকে। বেণুর সুন্দর লাগল না। কোমর থেকে নিচের দিক অনাবশ্যক স্ফীত। বিশ্রীই লাগছে। অথচ তাই নিয়েই মণিমাসি ছলছলিয়ে বেড়াচ্ছে। বেশ গরবী গরবী। কত-যে নিষেধাজ্ঞা। ও-মণি অমন দাপিয়ে সিঁড়ি ভাঙিসনে। আবার চুপচাপ থাকলেও—অত শুয়ে-বসে থাকিসনে মণি, চলাফেরা কর্। দেখতে দেখতে বদলাচ্ছে ছোটমাসি। স্ফীতভাব বাড়ছে, ডাকাবুকো মাসি শিথিল, এলানো মনে হয়, আলসেমিও, হাই তুলছে থেকে থেকে। মাসির নিশ্চয় খুব অসুখ করেছে, যখন ভাবছে এমন কথা, একটা উৎসব হয়ে গেল। সুন্দর শাড়ী পরে কার্পেটের আসনে মাসি থরে থরে সাজানো থালা-বাটির সমুখে বসল। প্রদীপ জ্বলল, শাঁখ বাজল। দিদিমা বললেন :

—সব আগে একটু পায়েস মুখে দে।

মুখে দিয়েই ঠেলে দিল মণিমাসি। মিষ্টি ভালো লাগছে না। খাওয়া শেষে মাসিকে নিয়ে এলো বারান্দায়। দুটো ধামা উবুড় করে রাখা। বড়মাসি বললেন : মণি, তোল। মাসি একটু ইতস্তত করল। একটা তুলতেই মসলা বাটার নোড়াটা—কেন যে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে ধামা ঢাকা দেওয়া, তার মাথায় ঢুকল না। ততক্ষণ কলরব—ছেলে হবে, ছেলে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় বেণু আচম্বিতে দেখাই

যাক না কি আছে অন্যটায়। উলটে দিল অন্যটাকে। বড়মাসি ধমকে উঠলেন :

—কে তোকে হাত দিতে বলেছে? এই মেয়েটার সবতাতেই অঘটন। বেণু অপলকে দেখছে। একটা মাটির প্রদীপ তেলহীন, সলতেহীন, অগ্নিহীন অবস্থায়, না জ্বলেই চুপ্‌চাপ্‌। আবার ধমক বড়মাসির : —অনেক গুণ মেয়ের। দেখিস্‌ তোর কেবলি মেয়ে হবে।

বিভ্রান্ত বেণুকে মায়ালতা বললেন :

—বড়োদের মধ্যে থাকতে নেই। বাইরে যাও।

বাইরে এলেও সমস্যার সমাধান নেই। ভেবেই পেল না মাটিতে শোয়ানো চিৎপাৎ করা নোড়টা, আর না-তেল না-সলতে, যাকে জ্বলতেই দেওয়া হবে না। সেই না-জ্বলা প্রদীপটা কেন ছেলে আর মেয়ের প্রতীকত্ব অর্জন করল।

—কী বেণু, বাবা চলে যেতে খুব মন খারাপ হয়েছিল। কথা বলতে গিয়ে কেঁদে উঠেছিলে। আজ কী হল আবার?

—একটা বই পড়তে চাইলাম, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "নটীর পূজা।" লাইব্রেরীয়ান্‌ বললেন, ও বই তুমি পাবে না। শিশু বিভাগের নয়, বড়োদের নাটক।

—ওঃ এই। আমি ভাবলাম কী-জানি-কী। বেশ তো বড় হয়েই পড়বে। যে সময়ের যা।

—কবে বড়ো হবো। বলো তো পদ্মা? মাকে কিছু জিজ্ঞাসা করলেই বলবেন : বড়ো হও। এঁরাও তাই বললেন। মণিমাসি শুনে বললেন : আমার বিয়ে আর একবছর আগে হলে তোকে "নটীর পূজা" অভিনয়ই দেখিয়ে আনতাম।

—অভিনয় কী জিনিস?

—বারে, সেদিন তোমাকে সীতা নাটকের গল্প করলাম যে। সেইরকম। শান্তিনিকেতন আশ্রম-বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা কলকাতায়

করেছিলেন। তখন আরও ছোট, দেখলেই কি মনে থাকত কিছু ?
—হয়তো থাকত। যেমন সীতা নাটকের আরম্ভের গান আর একটা দৃশ্য তোমার মনে আছে।

—সে আমার সারা জীবন মনে থাকবে।

—এরও হয়তো তেমনি কিছু মনে থাকত, কোনো গান, কারুর অভিনয় কিংবা একেবারে শেষটুকু।

—যা বলেছ ভাই। মণিমাসি বলেছিলেন : শেষটা আশ্চর্য। নটীর চমৎকার নাচ তো আছেই, স্টেজে এসে দাঁড়িয়েছিলেন স্বয়ং শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গেরুয়া জোব্বা গায়ে।

—মণিমাসি "নটীর পূজা" দেখেননি। জানলেন কী করে ? পদ্মা হেসে উঠল। অপ্রস্তুত বেণু মুহূর্তে বিজ্ঞ :

—হয়তো খুব ভালো সমালোচনা পড়েছিলেন। দেখতে পাচ্ছিলেন সমস্ত। খুব ভালো লেখায় সব দেখা যায়। সব শোনা যায়—অনেক সময় মনে হয় আমিই সব করছি। আমিই বুদ্ধু-ভুতুম, বুড়ো-আংলা, যূথপতি, চিত্রগ্রীব।

—কী জানি। আমি তো পড়তে জানিনে।

বেণু বড়ো বেশী ঘামছে। ঘেমে স্নান করে উঠেছে প্রায়। মাসিকে সকলে নিয়ে গেছে সাফ্-সুতরো করে রাখা একটা ঘরে। সেজমামা ডাক্তার ডাকতে চলে গেছেন। মা একটা ডেকচিতে কি সব ফুটোচ্ছেন—দিদিমা বাক্স থেকে বার করে দিচ্ছেন ধোওয়া কাপড়। ভয়ংকর একটা আশঙ্কা মুড়ে ধরেছে বাড়িটাকে। মুহূর্তে কি হয়ে গেল ছোটমাসির ? ঘর থেকে একটা আর্তনাদ ভেসে আসছে গলাটা ছোটমাসির। ওই হাসিখুশি মাসি তার সঙ্গে করুণ আর্তনাদের সংলগ্নতা কোথায় ? ডাক্তার এলেন। মাসিকে দেখে এসে বসলেন বৈঠকখানায়। চিন্তাতুর দাদামশায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন :

—কোনো ভয় নেই, সব নর্মাল।

এসে গেছে দুই মহিলা—বেণু শুনল ধাত্রী আর পহরণি। ক্রমে

বিকাল গড়িয়ে সন্ধ্যা—সন্ধ্যা শেষ হয়ে রাত, মধ্যরাত। খেয়েছে বেণুরা, কিন্তু, ঘুমোতে পারছে না। আর্তনাদ তীব্র থেকে তীব্রতর। নিঃশব্দ বাড়ি, ফিস্‌ফিস্ করে দু'একটা প্রশ্নোত্তর শুধু মণিমালার তীব্রআর্তনাদ ভয়ংকর অজানা আশঙ্কায় কাঁপাচ্ছে বেণুকে। ছোটমাসি কি মারা যাচ্ছে আজ রাতেই তার মনে হয়—মাসি জীবন-মরণের মাঝখানে দাঁড়িয়ে লড়ছে। হাত-পা কাঁপছে বেণুর। কাঁপলেও একটা জিনিস প্রত্যক্ষ করল সঙ্গী ছেলেরা মাঝে মাঝে চুপ করে গেলেও ফিস্‌ফিস্ গল্পগুজবে মেতে যাচ্ছে। বেণু পারছে না। গলা শুকনো, একটা স্বরও বার হচ্ছে না। হঠাৎ ঘামছে। মণিমাসির কান্নাটা তাকেও পাকে পাকে—অথচ পাশে বসা ছেলেদের কোনো দায় নেই। কান্নাটা বেণুকে প্রায় গ্রাস করবে এমন সময় মাসির চরম-আর্তনাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়েই কচিগলার কান্না শোনা গেল—ওঁয়াঁ। এতক্ষণ পাঞ্জা কষে সেও ক্রুদ্ধ।

নিঃশব্দ ছোটমাসি। নীরব নিস্তব্ধ। কান্না এখন শিশুকণ্ঠে। শব্দ-বড়োদের কলরবে—ছেলে হয়েছে, ছেলে। শব্দ এখন মধ্যরাত্রির নিস্তব্ধতা বিদীর্ণ করে আনন্দ শঙ্খধ্বনিতে।

পরদিন। দলবেঁধে ভিড় জমিয়েছে অসুজ-ঘরের দ্বারে। কেমন একটা ওষুধ ওষুধ গন্ধে ঘরটাকে মুড়ে রেখেছে। পহরণি বাচ্চাকে কোলে তুলে দেখাল। হাতে মুঠো বাঁধা, চোখ বুজে আছে। মা বললেন, ঠিক মণির মত দেখতে হবে। কেমন করে বুঝলেন কে জানে। সে তো চোখ মুখের দিশা পেল না। মাসির মুখে হালকা একটা হাসি জড়িয়ে আছে। খুব নতুন। এই হাসি ছোটমাসির মুখে কখনো দেখেনি। কেমন একটা মরি মরি ভাব যেন। কে বলবে এই ছোটমাসিই কাল জন্ম-মরণ দোলায় দুলেছিল। তুলেছিল অমন তীব্র আর্তনাদ।

আচ্ছা, ছেলেমেয়ে কি কেবলি মায়ের হয়, বাবার হয় না? মেসোমশায়কে দেখল না তো এই কষ্ট পেতে। তিনি বহাল তবিয়তে মধ্যভারতে। রাত্রে মাকে জিজ্ঞাসা:

—মা, আমিও কি ভাইয়ের মতন জন্মেছি ?

মায়ালতা ক্ষণকাল কী ভাবলেন। বললেন :—হ্যাঁ।

—সেজমামা, বড়দা, মেজদা, নতুনমামা, ছোটমামা সকলেই ?

—হ্যাঁ, সকলেই। মায়ালতা সংযোগ করলেন : আমি, তোমার বাবা, ঠাকুর্দা—ঠাকুমা, দিদিমা-দাদামশাই।

বেণুকে ঘিরে ধরল গভীরতার বোধ। থরথর গলায় বলল :

—মা, জন্মকথা বলো।

মায়ালতার কানে বেণুর গলা প্রার্থনার গলা শোনাল। যেন বিশ্বরহস্যের উন্মোচন আশায় করজোড়ে বসেছে বেণু। আর বলতে পারলেন না—বড়ো হও। মায়ালতাও প্রস্তুত হলেন, অনন্ত কথার প্রস্ফুটনে।

—একদিন বাবা-মা কাতর হয়ে ওঠেন। প্রার্থনা করেন—হে ঈশ্বর, আমাদের একটি শিশু দাও। প্রার্থনা শোনেন তিনি। নিয়ে আসেন একটি শিশু। খুব ছোট, এত ছোট যে চোখে দেখাই যায় না। মার হাতে দিয়ে বলেন : সমস্ত বিপদ আপদ থেকে আগলিয়ে রাখো, তোমার জিম্মাতেই দিলাম। সবচেয়ে নিরাপদ ভেবে মা লুকিয়ে রাখেন গর্ভে। খুব যত্নে নিজের খাবার থেকে খাবার দেন তাকে, নিজের ঘুম থেকে ঘুম। শিশু দিনে দিনে বাড়ে। তারপর একদিন আর্তনাদ করে : উন্মোচন করো। আমাকে নিষ্ক্রান্ত হতে দাও। যন্ত্রণায় যন্ত্রণায় মায়ের গর্ভ ব্যাকুল হয়। আবার আসেন ঈশ্বর। মায়ের উন্মোচিত গর্ভগৃহ থেকে দু'হাতে বার করে আনেন শিশুকে। অন্য কেউ না। কারুর সাধ্যই নেই।

ছোটমাসির ঘরে ডাক্তার এসেছিলেন। ধাত্রী, পহরণি, দিদিমা, মা, মাসিমারা, পাশের বাড়ির এক দিদিমা। ঈশ্বরকে তো দেখা গেল না। তাঁকে কি দেখা যায় না ? এঁদের কারুর মধ্যে লুকিয়ে এসেছিলেন ? কে ঈশ্বর ? অথবা কেউ একলা নয়, সমবেত সকলেই মিলিত হয়ে ঈশ্বর এমন একটা ভাবনায় আশ্বাস পেল।

পরের দিন একাকী ছোট মাসির ঘরের সম্মুখে। বাচ্চাটা অল্প

চোখ খুলে, ছোট মাসির বুকের কাছে শুয়ে। পুট্‌পুটে চোখের বাচ্চাটাকে আজ বিসদৃশ ঠেকল না। বরং সম্প্রতিই ঈশ্বর মাসির গর্ভগৃহ থেকে দুহাতে বার করে এনেছেন এই শিশুকে। এখনো তাঁর হাতের স্পর্শ লগে আছে মনে করে সম্ভ্রম-মিশ্রিত এক আবেগে আপ্লুত হল। ছোটমাসি হাসলেন। মরি মরি হাসি।

—ভাই কেমন দেখতে হয়েছে, বেণু?

বেণু গাঢ়গলায় বলল: খুব সুন্দর।

গ্রীষ্মের লম্বা ছুটি। মাঝে মাঝে কী যে হয় তার, ভালো লাগে না। অন্য কিছু। নতুন কিছু। আজ পদ্মার কাছে যেতে ইচ্ছে করল না, বাড়ির ছেলেদের দলেও খেলতে মন নেই। ওরা সবাই বসেছে তাস নিয়ে, টোয়েন্টি নাইন। বই পড়তেও ভালো লাগছে না। আনমনা নির্জন দুপুরে এলো সোনা, রূপোদের বাড়ি। সোনা বই পড়ছিল। রূপো বলল: চল্‌, ওপরের ঘরে বাঘ-ছাগল খেলব। চকখড়িতে বাঘ-ছাগলের ঘর। দু'জনে মুখোমুখি। টসে জিতে বেণু বাঘ, রূপো ছাগল। এ খেলায় বেণুই জেতে। হারে না। আজ রূপো সন্তর্পণে দান চালছে। একটা চালও ফস্‌কাচ্ছে না। বেণুর মনও অস্থির—অন্য কিছু। বড়ো ভুল হয়ে যাচ্ছে। সেই খাবে ছাগল রূপো আর এক ছাগলের প্রহরা দিয়ে দিচ্ছে। একসময় হেঁকে উঠল—বাঘবন্দী।

পরাজিত বেণু দেখছে প্রতিদ্বন্দ্বী হাসছে। তীব্র ঝোঁক চেপে গেল হারাবে রূপোকে। ক্রুদ্ধ: আমি এবার ছাগল নিচ্ছি।

সন্‌সন্‌ দুপুর। এ-বাড়ি ও-বাড়ি ঘুমে অচেতন। চারদিকে তাকাল রূপো।

—না শোন্‌। গলা একেবারে খাদে—আজ আমরা একটা নতুন খেলা খেলব।

—নতুন খেলা আমি জানিনে।

—আমি শিখিয়ে দেব। খুব মজার খেলা।

—বেশ ! শেখা তবে।

সনসন্ নির্জন দুপুর। এ-বাড়ি ও-বাড়ি ঘুমে অচেতন। সতর্ক রূপো তাকাল চারদিকে। গলাটাকে অসম্ভব নিচে এনে ফিস্‌ফিস্ করল—তোর ইজেরটা খুলে ফেল।

—কেন ? খুলবো কেন ? মুখের রক্ত সরে সাদা।

—আমিও খুলবো, না হলে খেলা হবে না।

কিছু না জেনে, না বুঝেই বেণু চীৎকার করে উঠতে গিয়েছিল রূপোর থাবা সজোরে ওর মুখে এসে পড়ল। দাঁত বার করে তর্জন করল অসম্ভব নিচু গলাতেই :

—চুপ কর। ছিঁচকাদুনে।

রূপোর হাতটা ঠেলে ফেলে দেবার মত জোর এসে গেল। উঠে দাঁড়িয়ে ফুঁসে বলল :

—তুই একটা অসভ্য। একটা জানোয়ার।

—হাঁ জানোয়ার। অদ্ভুত ঠোঁট ওলটালো। ফ্যাসফ্যাসে গলা :

—রাত্তিরে দরজা বন্ধ করে বর-বউরা কী করে ?

—না। বেণু কেঁদে ফেলল।

—না বললেই হল। আরো ফ্যাসফ্যাসে, হুলো বেড়াল.

—বাচ্চা হয় কী করে জানিস্ ?

—না—না—না—কাঁদতে কাঁদতে বেণু সিঁড়ি ভাঙছে। শিশুর জন্মকথা আমি জানি। ঈশ্বরের দু'হাতের-স্পর্শ লেগে আছে তাতে। তুই আমার জানাটাকে মিথ্যে করে দিতে চাস্‌নে। না—রূপো—না।

সোনা-রূপোর মা উঠেছেন সদ্য ঘুম ভেঙে। বিস্ময়ে বললেন :

—মেয়েটা অমন কাঁদতে কাঁদতে ছুটে গেল কেনরে ?

সোনা বই পড়ছিল। বন্দিনীকে অসীম-সাহসে উদ্ধার করছে বীর তরুণ, মুখ উঠিয়ে বলল :

রূপো হয়ত হাত মুচড়ে দিয়েছে। তোমার ছোট ছেলের বিশ্রী অভ্যাস মা।

রূপোও নেবে আসছিল। মা ধমক লাগালেন :

—মেয়েটাকে মারলি কেন? খুব কাঁদতে কাঁদতে গেল।

মোটা ভাঙা ভাঙা গলা :—হেরে গেল যে।

—হারলেই বা। মেয়েরা কত কোমল, তাদের-গায়ে হাত তুলতে আছে। সোনা বলে উঠল।

বেণু ছুটে ওদের উঠোন পার হয়ে নিজেদের উঠোনেই ঢুকেছিল। বুকের মধ্যে তুফান। ভাবল: পদ্মার কাছে যায়। পরক্ষণেই নির্জনতাকে ভয় করল। নির্জনতাকে এই তার প্রথম ভয়। সেই নির্জনতায় একটি পুরুষ-ছেলে তাকেও তার প্রথম ভয়। বুকের কাছে ফ্রকটাকে মুঠো করে আঁকড়ে অনেকক্ষণ বসে থাকল গোয়ালঘরেই। অদ্ভুত এক বোধ যার নাম জানে না। ভয়, ঘৃণা, কান্না, হতাশা নয়, হয়তো সমস্তের সমন্বয় বা আরো অন্য কিছু। বুকের তুফান কমলে পূর্বাপর ঘটনা মনে পড়ল। অথচ আপ্রাণ-চেষ্টা ঘটনাকে সে ভোলে। একটু আগেই তার চোখে ঝরে গিয়েছিল দুপুরের রোদ্দুর, চোখ অন্ধকার হয়ে রাত নেমেছিল। অন্ধ রাতে হুলো বেড়ালের ফ্যাসফ্যাস আওয়াজ আর ম্যাও ম্যাও গর্জন। কান্না পাচ্ছে তার। কী যেন সে হারিয়ে ফেলল আজকের দুপুরে—আর তাকে খুঁজে পাবে না। একটা সোনালী আনন্দ একটু একটু করে অর্জন করছিল পদ্মার সাহচর্যে, স্কুলে, লাইব্রেরীতে—কে যেন কাদাজল ছুঁড়ে সোনাকে কালো করে দিল। তার অমল-অনুভব : বা শেফালির মত, বকুলের মত সুগন্ধী-সাদা, আর সাদা থাকল না, গন্ধ গেল হারিয়ে।

হঠাৎ ডানহাত ঠোঁটে লাগাতেই গা ঘিনঘিন করে উঠল। বমি পেল তার। উঠে কুয়োতলায় গেল। বালতি করে জল তুলে মুখ ধুলো। ঠোঁট দুটো নাড়াতে লাগল। আবার, আবার। বার বার।

ঘরে ঢুকতেই মায়ালতা বলে উঠলেন :

—এ-কী? কী-হয়েছে তোর?

—কিছু না।

—কিছু হয়েছেই। বলেছি না, মায়ের কাছে কিছু লুকোতে নেই।

বেণু কাহিনীটা বলল। শুনতে শুনতে মায়ালতা কাঠ।

কিছু বলবেন এমন ক্ষমতাও নেই! অদ্ভুত গলায় বেণু প্রশ্ন করল:

—ওকথাটা বলল কেন মা—ওই যে দরজা বন্ধ করে—

চমকে উঠলেন। মেয়ের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললেন:

—খুব খারাপ ছেলে। আর কোনদিন ওর সঙ্গে মিশবে না।

মিশবে না, সে আগেই ঠিক করেছে। কিন্তু, সংশয় থেকেই গেল। প্রশ্নটাকে এড়িয়ে গেলেন। সত্য জবাব দিলেন না। অমীমাংসিত প্রশ্ন দূষিত ক্ষতের মত জেগে রইল অতঃপর। দব্‌দব্‌ করতে লাগল থেকে থেকেই।

কদিন পরেই বড়মামা ডেকে পাঠালেন।

—আমার ঘড়িটা কোথায় রেখেছিস?

গম্ভীর বড়মামা, মুখভার করা মাসিমা, বেণু ভয় পায়। আমতা আমতা করে—জানিনে তো!

—দেখছ, মুখ শুকিয়ে আমসি। জানিস্‌নে তো এত ভয় কেন? এই টেবিলের ওপর কাল বিকালেও ছিল। তুমি ছাড়া আর কে আছে এই বাড়িতে?

বেণু জানে, অনেক মানুষ বাড়িতে। আশ্রিত-আত্মীয় ছাড়াও ঝি, চাকর, ঠাকুর। ঘড়িটাকে সে চোখেই দেখেনি। দেখলেই বা চুরি করবে কেন? অথচ অভিযোগের জবাব দিতে পারছে না। পূর্ব-অভিজ্ঞতা থেকেই জানে, তার নামে কোনো অপবাদ লাগলে সেটা থেকেই যায়। তার থেকে রেহাই পায় না, সে যত মিথ্যাই হোক্‌। কেন যে এমন হয়? নিঃশ্বাস নিতেও দম বন্ধ হয়ে আসছে!

—চেয়ে নিলে পারতিস্‌। ছিঃ চুরি করলি?

ধিক্কারে অস্থির, বলে উঠল:

—আমি চুরি করিনি, সত্যি বলছি।

—ফের মুখে মুখে জবাব। মাসিমা ধমকে উঠলেন:

একে তো আমাদের কাঁধে চেপে আছিস, কাঁড়ি খসাতে হবে। আবার চুরি। চুরনীকে কেউ বিয়ে করবে।

চোখ জলে জড়িয়েই ছিল, গাল বেয়ে ঝরতে লাগল।

—থাম্। আবার কান্না। কতগুণ। চুরনী, ছিঁচকাঁদুনী।

কান্না রোধ করতে প্রাণপণ করছে। ঠোঁট কাঁপছে তবু ঠোঁট টিপে ধরছে। বড়মামা হঠাৎ বলে উঠলেন :

—আঃ বিভা, থামো। বড্ড বেশী হয়ে যাচ্ছে।

মাসিমা তখনকার মত থামলেও কথাটা থামল না। লোকজন, আশ্রিত-আত্মীয়ে ছড়িয়ে গুজগুজ, হৈ-চৈ সকলেই একমত বেণুই চুরি করেছে টাইমপীস ঘড়িটা। বম্বে থেকে বাড়িতে এসেছে ছেলে বউ, এসেই হারাল অমন সুন্দর ঘড়িটা।

অকস্মাৎ সব গোলমাল ছাপিয়ে তীব্র, তীক্ষ্ণ একটা চীৎকার ফেটে পড়ল। কেটে টুকরো টুকরো করে দিল অন্য সমস্ত গোলমাল :

—বেণু চুরি করেনি, করেনি, করেনি। কক্‌খনো না। এই দেখো—এই দেখো- এই দেখো—

সকলের মতই চোখ বড়ো করে বেণু দেখল, মা যেন উন্মাদিনী। চুল এলোমেলো. আঁচল খসে খসে পড়ছে। টেনে টেনে ফেলছেন বিছানা, বালিশ, চাদর, মশারি, ছড়িয়ে দিচ্ছেন দড়ির আলনায় রাখা কাপড়-চোপড়। বাকসটা উলটিয়ে দিয়ে হাঁপাচ্ছেন .

—এই দেখো—এই দেখো—এই দেখো—

—মায়া মা। দাদামশায় এগিয়ে এলেন। মায়ালতার উন্মত্ততা শান্ত করতে শান্ত-গলায় বললেন :

—সামান্য একটা টাইমপীস নিয়ে কেন এত গোলমাল হচ্ছে ? দিদিমাও অবাক্। তাঁর সবচেয়ে ঠাণ্ডা মেয়ে মায়ালতা। ছেলেবেলায় সাত চড়েও রা ফুটত না। বললেন :

—তাছাড়া বেণু তো আর দোকানে বিক্রি করে আসেনি। বৌমাই কোথায় রেখেছে ভুলে।

সে রাতে মায়ালতাকে কেউ খাওয়াতে পারল না। বেণুকে

বুকে জড়িয়ে শুয়ে থাকলেন। মায়ের বুকের মধ্যে বেণু দু'চারটে অস্ফুট উক্তি শুনতে পেল। পুরো বুঝল না। মনে হল বাবার কথা বলছেন। কাঁদছেন, অভিযোগ করছেন। কেন যে এমন হল, ভাবতে ভাবতে শ্রান্ত বেণু ক্লান্ত হল, তারপর একসময় পড়ল ঘুমিয়ে। ঘুমের ঘোরে স্বপ্নের মতই মনে হল, মা হাত ছাড়িয়ে নিলেন খুব আস্তে। খানিকক্ষণ এপাশ-ওপাশ করে জেগে উঠল। মা নেই পাশে।

—মা—সজোরে ডেকে বেরিয়ে এলো বারান্দায়। পাশের ঘর থেকে দিদিমা বেরিয়ে বললেন :

—অমন চেঁচাচ্ছিস কেন? দাদামশায়ের ঘুম ভেঙে যাবে

—মা নেই দিদিমা। কেঁদে উঠল বেণু।

মা নেই। ধক্ করে বাজল দিদিমার বুকে। তারপর ডাকাডাকি খোঁজাখুঁজি। লণ্ঠন হাতে কেউ গেল পদ্মাতীরে, কেউ অন্যদিকে। কোথাও যাননি মায়ালতা। গোয়ালঘরে বাছুরের গলার দড়ি খুলে নিয়ে, গলায় ফাঁস লাগিয়ে ঝুলছেন। দড়ি কেটে নাবিয়ে ধরাধরি করে শোয়ানো হল। কেঁদে চলেছিল বেণু, দিদিমা বুকে জড়িয়ে ধরলেন, মাথায় গায়ে হাত বুলিয়ে বললেন :

—ভয় নেই, মা এক্ষণি ভালো হয়ে উঠবে। ডাক্তার ডাকতে বড়মামা চলে গেছে।

ডাক্তার এলেন। ফাঁস তেমন এঁটে বসতে পারেনি, অল্পের জন্যে রেহাই পেয়ে গেলেন মায়ালতা। জ্ঞান ফেরাবার জন্য ডাক্তার চেষ্টা করছেন। দিদিমার বুকের পাশে বেণু দাঁড়িয়ে। দাঁড়িয়ে শায়িতা, অচেতনা মায়ের দিকে তাকিয়ে তার চেতনায় অস্থির চিন্তার তোলপাড় হ'তে লাগল। কিন্তু, বাইরে সে হয়ে গেল স্থির। সব কান্না চোখ থেকে, থরথর্ কাঁপা ঠোঁট থেকে, রুদ্ধকণ্ঠ থেকে নেবে নেবে বুকের গহ্বরে জড়ো হল। জড়ো হয়ে বুককে কাঁপাল না—যা ছিল দ্রব, হল শিলীভূত। অল্প এই সময়টুকুর মধ্যেই বড়ো হয়ে গেল সে। রূপো তাকে একজাতীয় বড়ো করে দিয়েছিল—আর একজাতীয়

বড়ো করে দিলেন স্বয়ং মা মায়ালতা। বেণু আর বালিকা থাকল না। তার মধ্যে জন্ম নিল এক কিশোরী।

দাদামশায়ের কঠিন নির্দেশ : এ প্রসঙ্গ যেন কখনো না ওঠে। কী যে বেণু-বিদ্বেষ ছোটমামার। কয়েকদিনের মধ্যেই বলে বসল সোনাকে :

—জানিস্, আমাদের ভাগনীটা চোর।

—কেমন করে জানলি ?

—বড়দার টাইমপীস ঘড়িটা চুরি করেছে।

—টাইমপীস ? সে কীরে ?

আকাশ থেকে পড়েছে সোনা। ছুটে চলে গেছে বাড়িতে। এ বাড়ির অবাক্ মানুষেরা দেখছে, রূপোকে টেনে-হিঁচড়ে আনছে সোনা, রূপোও আসবে না—প্রায় মল্লযুদ্ধ। একহাতে রূপো, অন্যহাতে টাইমপীস। সোনা হাঁপাচ্ছে :

—রূপোর কাছে ঘড়ি দেখেই সন্দেহ হয়েছিল। জিজ্ঞাসা করায় বলেছিল—ও বাড়ির বড়দা আমায় প্রেজেন্ট করেছেন।

হতভম্ব প্রত্যেকে। হতবুদ্ধি বড়মামা

—নিয়েছিলে নিয়েছিলে, মিথ্যে বেণুর নামে দোষ দিলে কেন ? তুমি বলেছিলে, বেণুকে চুরি করতে নিজের চোখে দেখেছ। ছিঃ ছিঃ মিছেমিছি আমরা ভাগনীটার নামে অপবাদ দিলাম।

রূপো জবাব দিচ্ছে না। মাথা নিচু করেই আছে।

বেণু মায়ের চোখে তাকাল, মায়ালতা বেণুর চোখে। দুজনেই নিবার্ক। শুধু পরস্পরের চোখ বলল :—কী ভয়ংকর।

নির্জনে মা বললেন : এবার বুঝলি তো, ব্যাটাছেলেরা এত খারাপ হয়। এখন থেকে অন্য বাড়ির ছেলেদের সঙ্গে মিশবি না।

অন্য ছেলেদের সংসর্গ অতঃপর বর্জন করবে, আগেই ঠিক্ করেছে। কিন্তু, এই কদিনে সেও একটু বড়ো হয়ে গেছে। জেনেছে, সব প্রশ্নের সমাধান মা'ও করতে পারেন না। কিংবা করতে চান না।

মায়ের দেওয়া ধারণা মাত্রই নির্ভুল নয়। তাকে নির্বাচন করতেই হবে। ছেলেদের মধ্যে শুধু রূপোই নেই, সোনাও আছে। অথচ রূপোর প্রতি ঘৃণায় মা সোনাকে দেখতেই পেলেন না। সব ছেলেদের এক করে দিলেন।

অবশেষে গরমের ছুটি অতিক্রান্ত। সুষমাদি হাসিমুখে সকলকে স্বাগত করেছেন। বেণুকে বিশেষ প্রশ্রয়ের কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন:
—কেমন ছিলে বেণু, ভালো নিশ্চয়।

উঠে দাঁড়িয়ে সে মূঢ়বৎ হাসল। রূপোসান্নিধ্যের সেই নাম-না-জানা অভিজ্ঞতা, ঘড়ি-চুরির-অপবাদ-কলঙ্ক, মায়ের আত্মহত্যার প্রচেষ্টা, সমস্ত মিলিয়ে সে ভালো ছিল না। অথচ এমন কথা কাউকেই বলা যায় না, কেউ না-বলে দিলেও এটুকু বুঝতে শিখেছে। মূঢ়বৎ হেসে জবাব না-জবাবের মধ্যবর্তী হয়ে থাকল।

উনিশ শ' উনতিরিশ খৃষ্টাব্দ। আন্তর্জাতিক, অর্থনৈতিক, স্বাদেশিক ও সাহিত্য-ঘটনা ঘটে চলেছিল। বেণুর জীবনে সব ঘটনাগুলির প্রত্যক্ষমুদ্রণ না থাকলেও, পরোক্ষমুদ্রণ ছিল। উনিশশ' উনতিরিশে পৃথিবীর অর্থনীতির ক্ষেত্রে প্রচণ্ড বিপর্যয় দেখা দিলে বাঙলাতেও বিপুল মন্দা দেখা দিয়েছিল। তার impact বেণুর বোঝার কথা নয়, বোঝেও নি। তার অনুভব দিগন্তে অর্থনীতির বিপর্যয় তার বাবার জীবন জুড়ে। সে বিপর্যয় তার বাবাকে খব করে রেখেছে, সঙ্গে সঙ্গে তাদেরও করেছে খর্ব। এই জানা তাকে ভীত করেছে। এই খবতা থেকে মুক্তি নেই আশ্রিত-জীবন থেকে।

আশ্রিত' জীবন বোধের অভিমন্যু-প্রবেশ ঘটেছে তার গুহায়িত বোধে। একটা হীনমন্যতায় জারিত হয় থেকে থেকেই। মানুষের সংসারে স্থান না-পাওয়া-বেণু—জীবনের চড়া রঙ্‌গুলোই নিয়েছিল বেছে। ঘন দগদগে, অদ্ভুত বাঁকাচোরা ছবি। যেমন: আমরা খুব গরীব, আবার বাবার চাকরি নেই, কোর্টে যান কিন্তু প্র্যাকটিশ

হয় না, দাদামশায়ের বাড়িতে থাকা ছাড়া উপায় নেই। মা বড় দুঃখী, বছরে দু'খানার বেশী শাড়ী নেন না. আমার দু'খানা ফ্রক, দিদিমা বেশী দিলেও ফেরত দেন। ধোপাকে দেন না, নিজেই কচে নেন। স্কুলে ভর্তি হয়েছি, পড়া বলে দেবার কেউ নেই। মা আর সব পড়ান ইংরেজীটা পারেন না। মাষ্টারমশাই সকলকে পড়ান, আমাকেও পড়াতেন. ওদের কথা শুনে আমাকে মারতেন. তাই মা আর যেতে দেন না। অধিকন্তু, যোগ করেছিল আমাকে সবাই বকে, কেউ ভালোবাসে না। বাড়িতে যে কেউ দোষ করুক, শেষ পর্যন্ত আমিই দোষী হয়ে যাই।

মিথ্যা নয়, তথ্য হিসেবে সত্যিই—তবু অর্ধতথ্য পুরো সত্য নয়। দিদিমা কতদিন আদর করে ডেকেছেন—বনপাখি। দাদামশায় দিনরাত পাঠে মগ্ন, মাঝে মাঝে মুখ তুলে পাঠরতা তাকে দেখে খুশিতে বলেন :—বই পড়ছ? বাঃ বেশ। বড়ো হলে তোমাকেই প্রাইভেট. সেক্রেটারী করব। সেজমামা ভালো গান হলেই বলেন : গান শুনবি বেণু?

বৃহৎ পরিবারের জটিলতা গহন-অরণ্য। সেই অরণ্য-অন্ধকারে সূর্যের আলো সহজে পৌঁছয় না। তখন এই মানুষ কটিকে বেণু দেখতে পায় না। অনাদরের দিনগুলো, অন্যায়ের দিনগুলো পাল্লায় ভারী হয়ে আদরের পাল্লাটা উঠে যায় শূন্যে—আর হীনমন্যতায়, অসম্ভ্রমে, নিরাবরণ বেণু মাথা উঁচু করতে পারে না।

স্কুলে শুনেছিল. মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা। অন্তর্নিহিত তথ্য বোঝেনি। জানে না, রাজনীতির ক্ষেত্রে বিনাবিচারের জাল। স্বজীবনেই বিনাবিচারের জালে জড়িয়েছে বার বার। বেণুর জীবনের অনেক-খানিই ব্যক্তিক এবং পারিবারিক অবশিষ্টাংশ। দাদামশায় সরকারি চাকরি করেছেন. সরকারি পেন্‌সন্। দেশানুরাগে স্বদেশীআনার তীক্ষ্ণ, তীব্ররূপ থেকে দূরেই থাকতেন। টেররিস্ট আন্দোলন সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা শোনেনি। কিছু কিঞ্চিৎ দাদামশায়ের আগ্রহ কংগ্রেস-সম্পর্কে।

ভাদ্রমাস। সুষমাদি ক্লাসে এলেন, আরক্ত নয়ন। নাম ডাকলেন, ক্লাস নিলেন না। ধরা গলায় বললেন:—তোমরা সকলেই যতীন দাসের নাম শুনেছ কিনা জানি না। দেশকে ভালোবেসে, দেশবাসীর জন্যে কারাবরণ করেছিলেন এই দেশপ্রেমিক। জেলের কর্তৃপক্ষের অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে, মৃত্যুপণ রেখে অনশন করে চলেছিলেন। লাহোর জেলে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

সুষমাদির অভিব্যক্তি বেণুকে নাড়া দেয়। বড়ো ইচ্ছে করে, এই মানুষগুলিকে দেখে, প্রণাম করে। অনেক মানুষের যাঁরা ভালো করতে চান, ভালোবাসতে চান, যারা প্রাণ দিতে পারেন দেশের জন্যে। বেণুর ইচ্ছে করে দেশকে জানে। কাকে বলে দেশ? দাদামশায় বলেছিলেন, দেশে যাব। তখন ভেবেছে দেশ মানে রাজশাহী। স্কুলে এসে ভাবতে শুরু করেছে বাঙলা, তারা বাঙালী, ভাষা তাদের বাঙ্‌লা। আবার ভারতবর্ষও ভাবছে। ভারতবর্ষের ভৌগোলিক অবস্থান সে জানে। ইতিহাসও পড়ছে। তবু ভারতবর্ষকে চেনে জানে এমন বলতে পারবে না। অজানা, অচেনা, তবু একটি ঐক্য-ভাবনা অস্পষ্ট চিন্তায় আসে।

১৯২৯। ১৯৩০ মেতে উঠেছিল রাজশাহী। নেতাদের আসা-যাওয়া, সভা-সমিতি, মীটিং টাউনহলে, মীটিং পাঁচালীর মাঠে। পুরুষদের মীটিং মাঠ-ময়দানে, মেয়েদের জন্যে টাউনহল, দিনের আলো নিভে গেলে, বড়ো বড়ো বাতি জ্বালিয়ে।

মা, বড়মাসি, সরযূমাসিমা, চলেছেন। সঙ্গে বেণুও। আগে আগে লণ্ঠন ঝুলিয়ে গফুর মামা। জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগীর বক্তৃতা। সাদা পর্দায় ম্যাজিকলণ্ঠনে ফুটে ফুটে উঠছে স্থিরচিত্র, বক্তার কণ্ঠ অস্থির। সেই অস্থির গলায় তিনি বলে চলেছেন:

—একদিন এই বাঙলার তাঁতীরাই বুনত সূক্ষ্ম ঢাকাই মসলিন, বুনত নকশার কারুকাজ। এমনি নয়নহরণ ছিল সেই সব কাজ, ইউরোপের বাজার কেড়ে রেখেছিল। বিলাতী কাপড়ের কাটতি নেই। সরকার ট্যাক্স বসিয়ে দাম বাড়িয়ে দিলেন, বিলাতী

কাপড় অপেক্ষা অনেক বেশী দাম—তাতেও বোঝা যাচ্ছে না—তখন—।

তখন স্তম্ভিত বেণুরা দেখল স্থিরচিত্রে বাঙলার তাঁতীর হাতের আঙুল কেটে ফেলা হচ্ছে।

সুখের যেমন পুলক-শিহরণ আছে, দুঃখেরও আছে যন্ত্রণা-শিহরণ। বেণু যন্ত্রণাকে শিরশিরিয়ে অনুভব করেছিল, বুকে-পিঠে, মাথায়-কানে। কী অন্যায়। এতদিন ভাবত অন্যায় শুধু তাকে ঘিরেই। এখন দেখল বহুতর অন্যায় আছে, যা ব্যক্তিক নয়। পারিবারিক নয়, অথচ অন্যায়। বহুতর অন্যায় পৃথিবীর বক্ষ জুড়ে।

মাঘমাস, বেশ একটু শীতভাব। সুষমাদি ইংরেজীর ক্লাসটাকে ক্লাসরুম থেকে টেনে মাঠে আনলেন। এমন প্রায়ই করেন। রোদ্দুরের মিষ্টি আমেজে বসে পড়া শুনতে ভালো লাগছিল, এমন সময় বই বন্ধ করলেন :

—২৬শে জানুয়ারী কারা কারা পতাকা উত্তোলন করলে?

উঠে দাঁড়াল মুক্তি চক্রবর্তী, দুর্গা মৈত্র, আশা নিয়োগী, বিভা মজুমদার, নয়নতারা সাহা। কেউ উকিল, কেউ ডাক্তার, কেউ জমিদার ও ব্যবসায়ীর মেয়ে।

—বেণু, উষা তোমরা পতাকা উত্তোলন করনি?

না-দাঁড়ানো ওদের দুজনেরি নতমাথা। বেণুর দাদামশায়ের সরকারি পেন্‌সন্, উষার বাবা সরকারি কলেজের অধ্যাপক। সুষমাদি নিশ্চিত বুঝেছেন খোলাখুলি ঝাণ্ডা উড়িয়ে দিতে কোনখানে বাধা, তবু লজ্জাই পায়!

—কেন, ২৬শে জানুয়ারী পতাকা উত্তোলন হয়, তোমরা বলতে পারো?

কেউ বলতে পারল না, শুধু চোখে ভেসে উঠল ত্রিবর্ণ পতাকা উড়ছে, চরকা-চিহ্ন বুকে ধরে।

—শোনো তোমরা। এতদিন আমরা চাইতাম স্বরাজ। ২৬শে জানুয়ারী কংগ্রেস দাবী করলেন পূর্ণ স্বাধীনতা। পূর্ণ স্বাধীনতা পাবার জন্যে আমাদের সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে।

কংগ্রেস, স্বরাজ, পূর্ণ স্বাধীনতা, সংগ্রাম। বড়ো বেশী অর্থ গভীরে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে অথবহ এই শব্দগুলি। ইচ্ছে করছে প্রশ্ন করে, স্বরাজ কী, পূর্ণ স্বাধীনতাই বা কী জিনিস? কিন্তু খুব ভালো লাগলেও সুষমাদিকে মায়ের মত জড়িয়ে ধরে প্রশ্ন করা যায় না। তিনি যেটুকু বলেন, মন্ত্রমুগ্ধের মত শোনে। ভাবে কোনো একদিন এর গভীর অর্থগুলি বুঝে যাবেই।

মীটিং-এর বন্যা। নেতারা এসে ফিরে যেতে না যেতেই আবার নেতারা। আসছেন সুভাষচন্দ্র বসু, আসছেন প্রফুল্লচন্দ্র রায়। আবার মা-মাসিদের সঙ্গ, আবার টাউনহল, গফুর মামার লণ্ঠন দোলানো।

মীটিংশেষে সুভাষচন্দ্র প্রস্তাব আনলেন:

—মায়েরা সব বলুন আজ থেকে আমরা বিলাতী বস্ত্র পরব না, বিলাতী দ্রব্য ব্যবহার করব না।

প্রস্তাব নেবার সময় সকলেই উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। মা-মাসিমারাও। মনে মনে তাঁরা কী বলেছিলেন জানে না, কিন্তু উচ্চকণ্ঠ হননি। উচ্চকণ্ঠ হয়েছিল তার স্কুলের মেয়েরা:—আমরা আর বিলাতী দ্রব্য ব্যবহার করব না।

বেণু জানে, এই মুহূর্তে শান্তি মৈত্র, ভারতী বাগচীর সায়াতে লাগানো আছে বিলাতী লেশ। তার চোখে ভেসে ওঠে, ম্যাজিক-লণ্ঠনে দেখা ছবিটা। বস্তা বস্তা খাদ্য চলে যাচ্ছে বিদেশে—তার বদলে ফিরে আসছে কিছু কাঁচের চুড়ি, কিছু লেশের কারুকাজ।

অস্পষ্ট একটা সাম্প্রতিক ভাবনা। যেহেতু চিন্তা মননসম্ভূত এবং আদিপর্বের চঞ্চলতায় চিন্তারা দানা বাঁধবার অবসর পায় না যেহেতু, সেহেতু আসে-যায় ঠিক্ ধরা দেয় না। ছোঁওয়া দিয়ে সরে সরে যায়—সেই সরে যাওয়া, দোলা-লাগা চিন্তায় দোল খায়। একটা চিন্তা বেশী ভাবায়—স্বদেশ, স্বাধীনতা নিয়ে যাঁরা সবচেয়ে ব্যাকুল, তাঁরা সকলেই ইংরেজী খুব ভালো জানেন। সুভাষচন্দ্র বসু বিলাতী বর্জনের কথা বললেন, অথচ বিলাত থেকেই আই. সি. এস. হয়েছিলেন। সুষমাদির কাছেই শুনেছে গান্ধীজী, জওহরলাল নেহেরুও হয়েছিলেন বিলাতের

ব্যারিস্টর। সুষমাদিও নিজে খদ্দর পরেন, স্নো-পাউডার মাখেন না, কিন্তু, ইংরাজী উচ্চারণ নিখুঁত না হওয়া পর্যন্ত খুঁতখুঁতের অন্ত থাকে না। বলেন : হল না, আবার চেষ্টা করো। মন দিয়ে শোনো, আমি অ্যাক্সেন্টটা কোন সলেবলে দিচ্ছি।

—গফুর, তুমি আজ থেকে কিছুদিন বাড়ির বাইরে যাবে না। বাড়ির ভেতরেই থাকবে।

প্রেমচন্দ্রের নির্দেশে গফুরমিঞা তাজ্জব।

—কন্ কা কর্তা? গোরু অবোলা জীব। তারে বাহিরে ঘোরায়ে আনা, ঘাস খাওয়ান না করলি কষ্ট পাবি না?

—তা পাক। বাইরে একদম যাবে না।

গফুরের দুঃখিত—অবাক মুখের দিকে তাকালেন :

—ঢাকায় রায়ট লেগেছে। মানুষ বড্ড হুজুগে গফুর।

বিকালে বুদ্ধি মন্তব্য করল : মুসলমানগুলোই দাঙ্গা বাধাইছে। বুদ্ধি-শুদ্ধির বাড়ি গ্রামে, ঢাকা শহরে নয়। ওরা অনেক বেশী মুসলমান দেখেছে। বেণু, তেমন দেখেনি। রাজশাহী শহরে মুসলমান কম। দেখেছে আমানুল্লা সাহাবকে, আর এই কাছের মানুষ গফুর মামা। দাদামশায় তাঁর এই প্রজাটিকে টাইফয়েডে চিকিৎসা করিয়ে বাঁচান। কেউ নেই তার। সেই থেকে এখানে। এমন ভালো মানুষ ; নিজের জান কবুল করে বাঁচিয়েছিল নতুনমামাকে ঘূর্ণীতে পড়েছিল নতুন মামা, পদ্মা তখন রাক্ষসী। গোরুর গলার দড়ি খুলে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল. ঘূর্ণীর কাছাকাছি পৌঁছে ছুঁড়ে দিল দড়ি. নতুন মামা, তারপর প্রাণ বাজী রেখেই কাছাকাছি পৌঁছনো. টেনে আনা। গফুরমামা নিশ্চয় দাঙ্গা করতে পারে না। পারেন না নম্র-নতমস্তক, আমানুল্লা সাহাব। আর যাদের দেখেছে, তারাও ভালো মানুষ। নৌকার মাঝিমাল্লারা, উলটোদিকের চর থেকে ডিঙি বেয়ে আসা চাষীরা, শহরে বিক্রি করবে পটল, বেগুন, লাউ-কুমড়ো।

এরাও দাঙ্গা করতে পারে না। বুদ্ধি বলল: মুসলমানগুলান্ দাঙ্গা বাধাইছে। হিন্দু-মুসলমান পাশাপাশি দুই-শব্দ। হিন্দু-খৃষ্টানের চেয়েও বেশী পাশাপাশি। হিন্দু বললেই এসে পড়ে মুসলমান। বেণু অবশ্য খৃষ্টানদের বেশী চেনে—সরোজিনী, রাজা, রিণি। কেমন যেন মনে হয় ওর—মুসলমানরাও ভাবছে দাঙ্গা বাধিয়েছে হিন্দুরা।

কে দাঙ্গা বাধায়?

সরস্বতীপূজার ভাসান। রাজশাহীতে একসঙ্গে শহরের প্রতিমাদের আনা হয় মস্ত মিছিলে—পদ্মার ধারে যখন আসে কী সুন্দর লাগে দেখতে। এবার ছত্রভঙ্গ। তেমাথায় মসজিদের সামনে হঠাৎ থেমে গিয়েছিল অতবড় মিছিলটা। ঢাকীরা ঢাক বাজিয়েছিল নেচে নেচে, ছেলেদের সমবেত কণ্ঠে আওয়াজ—সরস্বতীমাই-কী—জয়—ফেটে পড়েছে, ভেঙে পড়েছে। মসজিদে মুসলমানরাও তৈরী, আজানের জন্যে নয়, নামাজের জন্যে নয়, লাঠিসোঁটা নিয়ে দল বেঁধে।

—আল্লা—হু—আকবর।

এদিককার নিশান-পতাকার বাঁশগুলো ছিল তেলে পাকানো। কোনো কোনোটা লোহার রড্। মারামারি। রক্তারক্তি। পুলিশ সঙ্গেই ছিল। চলল তার লাঠিও।

বেণু ভাবে: কারা বাধায় দাঙ্গা? কেন বাধে? কোনো একটা ধর্মে জন্মে পড়েছ বলেই হিংস্র হয়ে উঠতে হবে? জন্মানোতে কারুর হাত নেই। যদি থাকত, বেণু বলত, ঈশ্বর, আমি জন্মাব আমার বাবার চাকরি হবার পর। জন্মানোটা হাতে নেই, কিন্তু ভালোবাসা, মায়া-দয়া? মানুষের মধ্যে তিক্ত হিংস্র ব্যবহার দেখলেই তার মনে হয়: কেন মানুষ এমন করছে? মানুষই তো পারে মানুষকে ভালোবাসতে। কী ভালো হয়, এই পৃথিবী; যদি হিংসা না থাকে।

—গান শুনবি বেণু? সেজমামা বললেন: দিলীপ রায় আসছেন আমাদের কলেজ ফাংসনে।

সেজমামাকে কী-যে ভালো লেগে গেল। কত-যে মনোহর। যেন স্বয়ং ঈশ্বর এসে বললেন: দুঃখী বেণু, একটু আনন্দ করবে?

সেজমামাকে খুব ভালো লাগে তার। মেয়ে বলে, আশ্রিত বলে কোনো অবজ্ঞা নেই।

দিলীপ রায় এলেন। খুব সুন্দর দেখতে। সমাদরে বসাল তাঁকে। বাবাও দেখতে এমনি সুন্দর। কিন্তু, এক বিষণ্ণতা ছেয়ে ধরেছে। আজকাল হাসতেও ভুলে যাচ্ছেন। তুজনেই সুন্দর অথচ বিপরীত। একজনের মুখে ছড়ানো আনন্দ: আলোর মত উজ্জ্বল বাবার বিষণ্ণতা—তাদের সেই মৃত ঘরটার মতই। এমন সমাদর কেউ করে না তাঁকে। হঠাৎই মনটা খারাপ হয়ে যায়। এমন সময় গান! সুর বেণুর মনটাকে বিষণ্ণতার কবজা থেকে টেনে বার করল। অবাক বেণু, অবাক। তুমি কেমন করে গান করো হে গুণী? কেমন করে ওহে গুণী গান করা যায় এমন গলায়। গলা ভরে যাচ্ছে, ভরতে ভরতে উঠে যাচ্ছে আকাশে। আকাশে উঠে ফের ফেটে যাচ্ছে —আগুনের ফুলকারী ঝরাতে ঝরাতে দীপাবলীর বাজীর মত। আবার বসন্ত-হাওয়ার দোলায় তুলে যাচ্ছে, নুয়ে যাচ্ছে, ছুঁয়ে যাচ্ছে। কিছু পরে এলো কাগজের টুকরো তাঁর কাছে। সমবেত চাহিদা দেশগান। তিনি গাইলেন:

যেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিলে জননী ভারতবর্ষ

উঠিল বিশ্বে সে-কী কলরব, সে-কী-মা ভক্তি, সেকী-মা হর্ষ। ধন্য হইল ধরণী তোমার চরণ-কমল করিয়া স্পর্শ। য়া-স্পর্শ এই য়া থেকে স্পর্শে যাওয়া অপূর্ব লাগল। যেন শরৎ মেঘের মতই অনায়াসে ভেসে গেল গলা।

ভারতবর্ষকে সবাই বলছে জননী। দেশ-জননী। মায়ের মত কেউ-না, বেণু জানে। কিন্তু, বাবাও কম নন। তাঁর মর্যাদা না থাকলে মায়ের মর্যাদাও কমে যায়। বেণু ভাবছিল, দেশ কি এমন হতে পারে না, শুধু স্নেহময়ী, ব্যাকুল অশ্রুসিক্ত নয়, এক বীরবাহু, যে শিক্ষা দেয়, রক্ষা করে সমস্ত বিপদে হাত বাড়িয়ে দেয় মায়ের হাতে। স্বদেশ যেখানে মাতৃভূমি এবং পিতৃভূমি।

অনেকদিন পরে গফুরমামার লণ্ঠন আবার তুলল। বক্তৃতা নয়,

গানের আসর। মা-মাসিমাদের সঙ্গে এলো। বাবরি চুলে কাঁধ-সাজানো, বড়ো বড়ো আয়ত নয়ন, দিলীপ রায়ের মতো সুগৌর নন, তবু গ্যাসের আলোয় লাগছিল তেজোদৃপ্ত, সুদেহী, বলশালী। তিনি গানে মাকে ডাকলেন না বললেন না জননী; তবু স্পষ্ট বুঝতে পারল দেশবন্দনা। দরাজ গলা, অবারিত প্রাণের উৎসাহ, কেউ বাধা দিতে পারবে না তার প্রবাহকে। গম্‌গম্‌ করল গলা:

দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার হে
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে, যাত্রীরা হুঁশিয়ার।

খুব ভালো লেগে যায় একটা লাইন, যেন তারি প্রশ্নের জবাব:

হিন্দু না ওরা মুসলিম ওই জিজ্ঞাসে কোনজন হে?

সত্যিই কে জিজ্ঞাসা করো হে? কে করো? হিন্দু কিংবা মুসলমানকে কে করো অপরাধী?

ভারী প্রসন্ন মন। এক একটি মানুষ কত সহজেই সেতুবন্ধন করেন, কত সুন্দর ভাবে। দাঙ্গার ব্যাপারের পর থেকেই তার মনের যে অংশটুকু কুঁকড়ে ছিল, দুমড়ে-মুচড়ে, সেই শুষ্ক অংশে জল ঢাললেন এই মানুষটি। মা বলেছিলেন:—বেশী পড়াশোনা করতে পারেননি। মহাযুদ্ধে সৈনিক হয়েছিলেন।

—নাম কী মা?

—কাজী নজরুল ইসলাম।

বেণুর বিশ্বাসে যুক্ত হল আর একটি নাম।

আমানুল্লা সাহেব, গফুর মামা, কাজী নজরুল ইসলাম।

বাবা এলেন, চলেও গেলেন। বেণুর মনে হয়, রুদ্ধ রোদন থম্‌থম্‌ করছে বাবার অস্তিত্বে। যতবার বুকে জড়ালেন, ততবারই রুদ্ধ এক গমগম, গমগমে অথচ আর্ত। বাবার অরুন্তুদ রোদন ভেতরে ভেতরে তাকেও কাঁদাতে লাগল। নিজে সে বাবা, মা, স্বদেশ, সংগীত, পদ্মা—এর মধ্য দিয়েই দিন কাটাতে লাগল।

টিফিনে দুর্গা মৈত্র বলল: আজ এসেছি, কাল থেকে আর আসব

না কদিন। আমাদের বাড়িতে কয়েকজন বড়ো বড়ো নেতা আসছেন। আসবি আমাদের বাড়ি, কখনো তো আসিস্ নি।

বেণু জানে: সুভাষচন্দ্র বসু দুর্গাদের বাড়িতেই উঠেছিলেন। যদিও দাদামশায়ের ছাত্র। প্রণাম করতে এসেছিলেন থাকেন নি। আচার্য প্রফুল্ল রায়ও উঠেছিলেন দুর্গাদের বাড়িতেই। ওর বিষণ্ণ মন বলছিল: কী হবে। তুমি যে তিমিরে সেই তিমিরেই। আর একটা উৎসাহী মন ওকে লুব্ধ করল: দেখোই না, আরও একটা জগৎ আছে, উজ্জ্বল জগৎ। কিছুক্ষণের জন্য ভালো লাগাই বা কম কী?

—কাল যাব। মাকে বলে আসব।

যা দেখছে আশ্চর্য। কোথায় লাগে দাদামশায়ের বাড়ি। সদর-অন্দর—জমকালো বাগান, বৃহৎ-পূজাদালান—রান্নাবাড়ি, ধানগোলা, গোয়াল, মুহুরীঘর—একদিকে সারবাঁধা ছ'সাতখানা ঘর—দুর্গা বলল: ছাত্রাবাস।

—মানে?

—পড়াশোনায় এত ভালো আর সন্ধি জানিসনে? ছাত্র, আবাস ছাত্রাবাস। গরীব ছাত্ররা থাকে। কেউ ইস্কুলে পড়ে, কেউ কলেজে। এখানে খায়-দায়, থাকে।

—খরচ লাগে না?

—দূর বোকা। তাহলে তো মেসবাড়ি হয়েই গেল। সব খরচ বাবার। দুর্গার মা, কাকিমা, বৌদি, দিদিদের প্রণাম করল। থুথুড়ে ঠাকুমাকে। সকলেই খদ্দর পরেছেন। সদরের লাগোয়া চারখানা ঘর অতিথি ভবন। জানালা দরজায় পর্দা, বিছানায় টানটান পাতা চাদর—সব খদ্দরের। বেণুকে ডিশভরে ওরা সুন্দর সব খাবার দিলেন—কোনটা দোকানের নয়—ঘরে তৈরী।

ফেরবার সময় জিজ্ঞাসা—তোদের সকলেই খদ্দর পরেন?

—পরে না। এখন কদিন পরবে। তারপর খুলে ফেলবে। তুলে রাখবে বাক্সে।

—সে কীরে ?

—তা নয়তো কি ? অত মোটা গরম লাগবে না, খস্‌খস্‌ করবে না ? আমিও কদিন খদ্দর ফ্রক পরব, তারপর ছেড়ে ফেলব। শুধু ছোড়দিটা ছাড়বে না। জষ্ঠির ভ্যাপসা গরমেও পরবে। আসলে বাবা ওর আদর্শ। বাবা খদ্দর পরেন, মাও। ও আবার একটু বেশী যায়। নিজে হাতে চরকায় সুতো কাটে।

—তোর বাবা তোর আদর্শ নন ?

—হ্যাঁ আদর্শ। আমি বাবার মত নাম করব। মীটিং, বক্তৃতা। ঘরে বসে চরকা কাটা—না বাপু, আমার অত ধৈর্য নেই।

খুশিতে টগবগে দুর্গা :

—মীটিং হবে, লোকে লোকারণ্য। মীটিংএর আগে নেতাদের গলায় আমি মালা পরাব। তারপর আমি আর ছোড়দা গাইব, উদ্বোধন সংগীত :

"উঠগো ভারত লক্ষ্মী।"

একটু পরেই গানের মাষ্টারমশাই আসবেন। আজই ফাইনাল রিহার্সাল।

মনে পড়ল : পাঁচালীর মাঠে সুভাষচন্দ্র বসুর মীটিং-এর আগে দুর্গা আর তার ছোড়দা গেয়েছিল—বল, বল, বল সবে। ওদের গান দিয়েই সুভাষচন্দ্র শুরু করেছিলেন, বলেছিলেন এই যে বালক-বালিকা দুটি গাইল "ভারত আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।" বেণু সেদিন ভেবেছিল, দুর্গাদের গাওয়াটা স্বতঃস্ফূর্ত ঘটনা। আজ বুঝতে পারল, এইসব ঘটনাগুলোর পিছনেও একটা সাজানো-গোছানো আয়োজন রয়েছে। দুর্গা ভালো গায় না—তার চেয়ে নিজে সে ভালো গাইতে পারে। কেই-বা শেখাবে, কেই-বা দেবে তাকে অতবড় মীটিংয়ের সামনে গাইতে ? আজ বুঝতে পারল এর পশ্চাতেও আছে অধিকার, এবং সে অধিকারে তার মত নগণ্যের স্থান নেই। দীর্ঘশ্বাস বহন করে সে ফেরে।

.

দুর্গাদের বাড়িতে প্রত্যক্ষ করল, ঐশ্বর্যের পৃথিবী, নির্ভয়ের ভুবন।

বাড়ি-গাড়ি-ছাত্রাবাস। অতিথি-সমাদর, দান-খয়রাৎ, সব মিলে গমগমে। দাদামশায়ের যেহেতু সরকারি পেন্‌সন্‌, যদিও তিনি পুরুষ সিংহই। ছোটবেলাতেই মা-বাবাকে হারিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন পড়াশোনার জোরেই—তবু ভয় ভয় আছেই। দুর্গাদের বাড়িটা বেপরোয়া। তিনপুরুষে চাকরি করেন নি কেউ। ঠাকুর্দা উকিল ছিলেন—বাবা নাম করা উকিল। বড়দা অ্যাসিসটাণ্ট হয়ে কাজে নেমেছে। মেজদা ডাক্তারি পড়ছে। তার বাবাও উকিল। কোর্টে প্র্যাকটিশ করেন, অথচ আয় নেই কেন এমন হয়? অথচ বাবা পড়াশোনায় ভালো ছিলেন। প্রথমদিকে বেপরোয়াও নিশ্চিত। নইলে বাড়ি থেকে কেউ পালায়? তারপর কী হল, কোথায় গেল শক্তি ফুরিয়ে? হঠাৎ তার বুকটা হুহু করে উঠল: ইচ্ছে করছে এই মুহূর্তে, এক্ষণি দেখে সেই আর্ত, পীড়িত, শূন্য চোখের একান্ত আপন মানুষটিকে। যিনি কলকাতার মেসবাড়িতে থেকে তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন এক অন্য জগতের বাসিন্দা হয়ে যাচ্ছেন।

বেণুর এখন মেয়ে বন্ধুর পালা। বুদ্ধিরা অনেক বোন। মজার নাম। বুদ্ধি, শুদ্ধি, শান্তি, মুক্তি, ক্ষ্যান্ত, আরনা—চাইনা—কাল আমাদের বাড়ি আসবি? বলল বেণু। ওরা বলল:—আসব।

—আমাদের বাড়ি মানে—তোর বাবার বাড়ি—তোদের চোদ্দ-পুরুষের বাড়ি—বলেছি সব সময় বলবি. মামাবাড়ি, দাদামশায়ের বাড়ি।

হিংস্র ভঙ্গীর ছোটমামা।

মায়ালতা দেখছেন, মেয়ে ঘরে ঢুকছে যন্ত্রণার আবর্তনে। আঙুলে আঙুলে ঢুকিয়ে মোচড় দিতে দিতে।

—কী হল রে?

মুহূর্তে সতর্ক। চোখের সামনে ভেসে উঠল দড়ি, ঝুলন্ত মায়ালতা। জীবনে প্রথম মিথ্যা বলল: খেলতে খেলতে এমন পড়ে গেলাম।

—দেখি, কেটে যায়নি তো কোথাও? ঝুঁকে পড়েছেন:

—কিছু কামড়ায় নি তো? গলা কাঁপছে।

বেণু জোর করে হাসল। শব্দ করে :

—অমন ভয় পাচ্ছ কেন ? সাপে কামড়ায় নি। এখনি অনেক কমে গেছে। একটু পরেই ঠিক হয়ে যাবে—দেখো তুমি।

পরদিন ভাঁড়ারের কাজ সেরে ঘরে ঢুকেই মায়ালতা অবাক। কী করছে বেণু ? পুজো করছে ? দু'হাত জোড় করা বুকের কাছে, চোখ বোজা। মুদিত নয়নেই কী বলে চলেছে অস্ফুটে। প্রায় নীরবেই, শোনা যাচ্ছে না, শুধু ঠোঁট নড়ছে। পুরনো কয়েকটা বই বিছিয়ে, ছেঁড়া ফ্রকের টুকরো টান টান বিছিয়েছে, ফুল সাজিয়েছে অনেক। মধ্যিখানে নারায়ণ, ডাইনে—বাঁয়ে, লক্ষ্মী, সরস্বতী। অনুতপ্ত বড়ো ভাই কিনে দিয়েছিল। এতদিন ছিল তাকে-সাজানো পুতুল। আজ নেমে ঠাকুর হয়ে গেছে। প্রণাম সেরে উঠে দাঁড়াতেই মেয়ে-মা মুখোমুখি।

—হঠাৎ পুজো করছিস যে ?

—ইচ্ছে করল মা।

—তা ভালো। পুজোই যখন করছিস্ তোর বাবাকে লিখে দেব এবার একটা পূজা-পদ্ধতি আনবেন।

—আমি একটা মন্ত্র গান জানি, সেই যে বাবা লিখিয়েছিলেন দীর্ঘস্বরগুলিতে সুরের দীর্ঘ টান লাগায়

—তমী—স্বরা—নাং—পরমং—মহেশ্ব—রম্

—খুব ভালো। মায়ালতা বললেন : বৈদিক মন্ত্র, এখনি তো এর মানে বুঝবি না। তাছাড়া নারায়ণ পুজো করছিস। দশাবতার স্তোত্র ; রিণরিণে গলায় আবৃত্তি করলেন :

প্রলয়পয়োধিজলে ধৃত বানসিবেদম্

এমন সুসংস্কৃত আলোচনার মধ্যে বেণু দুম করে বলে বসল : —আচ্ছা মা, ঠাকুর কি সংস্কৃত ভাষা ছাড়া অন্য ভাষা বোঝেন না। বাঙলায় যা বললাম, তা কি বুঝতে পারলেন না ?

মায়ালতা হাসলেন : কেন বুঝবেন না ? ঠাকুর না বলা কথাও বোঝেন। অকস্মাৎ কৌতুকী :

—কী বলছিলি রে চোখ বুজে, বুকে হাত জড়ো করে ?

বলবে কি বলবে না, বলবে কি বলবে না, ইতস্ততঃ করছে বেণু। বলেই ফেলল : বলছিলাম, ঠাকুর আমার বাবার একটা চাকরি দাও। আমরা চলে যাই আমাদের বাড়িতে। টিনের চাল হোক্, মাটির কুঁড়ে হোক, তবু আমাদের বাড়ি। ঠাকুর, আমাদের একটা নিজের বাড়ি দাও।

আস্তে মায়ালতা মেঝেয় বসে পড়লেন। বেণু ভয় পেলো। মাকে জড়িয়ে ধরে বলল : অন্যায় বলেছি মা, আর বলব না।

কান্না কান্না গলায় মায়ালতা বললেন :

—বলবি নে কেন বলিস। সংস্কৃত ভাষার চেয়েও ঠাকুর প্রাণের কথা শুনতে ভালোবাসেন।

বেণু পদ্মার কাছে ছুটে এলো :

—পদ্মা, শুনছ ভাই, আমরা চলে যাচ্ছি।

—তবে যে বলেছিলে দাদামশায়ের পেন্‌সন্ হয়ে গেছে। এখানেই থাকবেন।

দাদামশায়রা নয়। আমি আর মা। বাবার চাকরি হয়েছে। আমাদের নিতে এসেছেন।

—খুব ভালো, খুব ভালো। পদ্মা ঢেউ ভাঙল পাড়ে। ছলাৎছল।

তুমি তো এই চাইতে। আমিও চাইতাম : তোমার নিজের ঘর হোক্।

বেণুর ফ্রক ছাড়াও একজোড়া শাড়ী মা-দিদিমার। এই প্রথম মা বাবার হাত থেকে হাত পেতে শাড়ী নিলেন।. মুখটা খুশির আলোয় ভরা। দিদিমার পায়ের কাছে রেখে প্রণামান্তে বাবা বললেন : একটু মোটা লাগবে মা, কিন্তু, খাঁটি জিনিস, বাঙলার নিজস্ব, স্বদেশী মিলের।

দিদিমা নিচু হয়ে শাড়ী তুলে নিলেন। হাসলেন :

—বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় এর চায়েও মোটা শাড়ী পরিছি

কাচলে পাড়ের রঙ উঠে যেত। ছেলেরা গান গায়ে ফিরত বাড়ি বাড়ি।

"মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেরে ভাই।"

তুমি আবার এত খরচ করলে কেন বাবা? নতুন সংসারে অনেক কিনাকাটা আছে।

বেণু শুনল: দিদিমা চেয়ে বললেন না, বললেন চায়ে, পরেছি নয়, পরিছি, গান গেয়ে নয় গান গায়ে। বললেন কিনাকাটা। আসলে খুশি দিদিমা। খুশি হলেই উত্তরবঙ্গের ভাষা তাঁর মুখে আপনি এসে পড়ে।

খুশি প্রেমচন্দ্রও। বেণুর মনে লাগে, পুরুষসিংহ দাদামশাই বাবার দুরবস্থার জন্য দায়ী করতেন বাবাকেই। এবার তাঁদের আলাপ দীর্ঘতর। চাকরিটা কী জাতীয়, কত মাইনে, প্র্যাকটিশ ছেড়ে দিতে হবে কিনা?

—প্র্যাকটিশ ছাড়ছি না। চাকরিটা আইনসংক্রান্ত। ওঁদের অনেক সম্পত্তি, বাড়ি-জমি, আইনগত দিকটা দেখব। মাইনে পঞ্চাশ টাকা, একখানা বাড়ি, প্র্যাকটিশের সময় আমি ফ্রী থাকছি।

—বেশ বেশ, পা রাখবার জায়গা পেলে, এখন প্র্যাকটিশ গড়ে নাও।

ব্যক্তিক আলাপ চলে গেছে নৈর্ব্যক্তিকে। পুরুষমহলে যেটা প্রায়ই হয়ে থাকে। দারুণ আকর্ষণীয়।

হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা, মুসলিম লীগ, জিন্নাসাহেব, কংগ্রেস মহাত্মাজী। স্বরাজ, স্বাধীনতা, ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট, গোলটেবিল বৈঠক, দেশবন্ধু বেঁচে থাকলে কী হোত, সুভাষ কতদূর যাবেন ইত্যাদি।

—পদ্মা, আমি যাচ্ছি।

—যাচ্ছি বলতে নেই। বলো আসি। আবার এসো বেণু, তবে থাকতে নয়, বেড়াতে।

—তোমার জলে আজই শেষ ডুব দিলাম। আর দিতে পারব না।

—কেন ? ওখানে যখনি ডুব দেবে, ভাববে পদ্মাতেই ডুব দিচ্ছি।

—ওখানে কাছাকাছি কোন নদী নেই। গঙ্গা অনেক দূরে।

—পুকুরও নেই।

—বোধহয় না। কুয়ো আছে কিনা তাও জানিনে। কলের জল।

—বেশ তো। কুয়ো হোক্, কল হোক্ বৃষ্টি হোক্ জল তো বটেই। যখনি জল দেখবে, আমাকে মনে করবে।

—তাই করব পদ্মা।

পদ্মার জলে দু'পায়ে ডুবিয়ে ঝুঁকে পড়ে গাঢ়গলায় বলল :

—জল দেখলেই মনে করব তুমি। তোমাকে আমি জীবনে ভুলব না।

—আমিও না। তোমাকে আমি বুকের গভীরে ধরে রেখে দেব আর দিনরাত তোমার জন্যে একটা কামনা করব।

—কি কামনা করবে ?

—তুমি যেন বয়ে যেতে পারো। কোথাও ঠেকে না যাও।

"চরন্ বৈ মধুবিন্দতি—চরন্ স্বাদুমুদুম্বর"

সুরের সুরধুনীতে সংস্কৃত স্বরধ্বনি অপরূপ লাগল। পুলকিত সে বলল :

—অপূর্ব। কিন্তু মানে যে বুঝতে পারলাম না।

—বলছি। কিন্তু, তার আগে আমার জীবনকাহিনী শুনবে না বন্ধু ? আমার জন্ম, বৃদ্ধি, যাত্রা—কোথায় চলেছি।

চমক লাগল। সত্যি, এমন কথা কখনো মনে পড়েনি। মনে ভাবত, পদ্মা চিরকাল আছে, থাকবে। তার নদীরূপ ভুলেই ছিল বন্ধুরূপের মাঝখানে। উৎপত্তি, সংগম, মোহানা !. কেমন যেন সুদূর হয়ে যাচ্ছে পদ্মা। সংস্কৃত শ্লোকের মতই গুরুগম্ভীর। একটা সমীহা ওকে আচ্ছন্ন করল। পা তুলে নিল জল থেকে। জোড়াসন হয়ে বসল বালুতীরে। সংহত অস্তিত্ব, হাত দু'খানা কোলে, গভীর গলায় বলল :

—বলো পদ্মা।

তোমার কাছে আমি বাঙালী, বরেন্দ্রভূমির হলেও—পদ্মা স্মিত হাসল :—বারিন্দির, চিরকাল এই ছিলাম না। আমি হিমালয়-কন্যা।

একটু আগেই মিষ্টি হাসির মাধ্যমে যে হয়েছিল নিকটবর্তিনী, "হিমালয় কন্যা" শব্দবন্ধটি উচ্চারণের সঙ্গেই হয়ে গেল দূরতম দূরের।

অস্ত্যওয়স্যাং দিশিদেবতাত্মা হিমালয়নাম নগাধিরাজঃ

ভারতের অতন্দ্র প্রহরারত সমস্ত দেশদেশান্তব্যাপী তুষারমৌলি পর্বতরাজ দেবতাত্মা হিমালয় আমার পিতা। মা আমার গাড়োয়ালী। সবুজ চোলি, সবুজ ঘাগরা, চুলে সাদা ফুলের মালা। ভূর্জবৃক্ষ, রডো-ডেনড্রন বনানীর মাঝখানে মা ঘুরে বেড়াতেন। মার কাছে এলেই সুগন্ধ—চারপাশের হাওয়ায় সৌরভ, যেন কস্তুরীমৃগরা এসে মায়ের বসবার আসনটি সুরভিত করে গেছে।

অনেক বোন আমরা। বাসুকি, ধবলী, ঋষিগঙ্গা, আকাশগঙ্গা, মন্দাকিনী, অলকনন্দা, গঙ্গা। আমার সেই পার্বতী মা বলতেন মেয়েরাই শক্তি। আমার অনেক নাম। জাহ্নবী, ভাগীরথী, গঙ্গা, পদ্মা, গঙ্গোত্রীর চূড়া থেকে লাফিয়ে লাফিয়ে নেবেছি। কত খেলাই না-খেলেছি, আকাশচুম্বী শিখরের পাদদেশে। কখনো মেঘ, কখনো, সাদা বরফ ঘিরে ধরেছে আমার তন্বী তনুলতা। বরফ বুঁদ্ বুঁদ্ বিন্দু বিন্দু ঝরে ঢেকে ফেলেছে গাছ-পালা-লতা-গুল্ম—যেন তারা সবুজের কেউ নয়, তারা সাদা বরফে তৈরী। আমারও সমস্ত জল জমে বরফ। বিলকুল সফেদ অনেকদিন পরে একটুকরো হিন্দী বলে পদ্মা যেন আরাম পেল।

সূর্যোদয়ে জাগি, সূর্যাস্তে ফিরি মায়ের কাছে। পাহাড় রাজ্যে সূর্যোদয়-সূর্যাস্ত অপরূপ। জীবনে যদি সুযোগ পাও দেখতে ভুলো না।

—দেখব। অতি সম্ভ্রমেই উচ্চারণ করল ধীরে।

গঙ্গোত্রী থেকে আমি নেমেছি ভাগীরথী। বদরিকাশ্রম থেকে অলকনন্দা। রুদ্রপ্রয়াগে মন্দাকিনী অলকনন্দায় মিলেছিল। আমার পথে পথে ক্ষেত, ক্ষেতে ক্ষেতে কাজ করছে পাহাড়ী মেয়ে-পুরুষ, কতনা-বাঁক, ঝাউ, দেবদারু বন। অলকনন্দা ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার

বুকে। আমাদের মিলিত নাম হল গঙ্গা --হৃষীকেশ ছেড়ে, হরিদ্বারে বাবাকে ছেড়ে, মাকে ছেড়ে হাজার হাজার ফুটের উচ্চতা ত্যাগ করে নামলাম মাটিতে।

কনখলে জাহ্নবী মাটির প্রেমে নেমে ছেড়েছি হিমালয়-অঙ্গ বাবাকে ছেড়েছি মাকে ছেড়েছি—আমিই মা এখন। আমার তীরে গড়ে উঠল গ্রাম-জনপদ, নগর-শহর। কত হাজার মানুষের শ্রম, কত হাজার মানুষের ক্লান্তি। গ্রীষ্মে শীর্ণা হলেও নিঃশেষ হই না মরুবালুরাশিতে। চিরতুষারাবৃত হিমালয় তাঁর হিমপ্রবাহের জলদান করে চিরজীবিতা রেখেছেন আমাকে।

যমুনোত্রী থেকে নেমেছে সখি যমুনা। অনেক দীর্ঘপথ পার হয়ে এলাহাবাদে আমার সঙ্গে দেখা। আমাদের এই সংগমস্থলের নাম প্রয়াগ। এখানেই কুম্ভমেলা। কত হাজার মানুষের অমৃতকুম্ভের সন্ধান এখানে। তারপর বার্ধক্যের আশ্বাস বারাণসী। মানুষ আমার ঘাটে ঘাটে পূর্ণসঞ্চয়ে তৎপর হয়, যেমন হয়েছিল হৃষীকেশে-হরিদ্বারে। এখানেও গাইল: "দেবী সুরেশ্বরী ভগবতী গঙ্গে", গাইল: "ওগো মা, পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গে।" এখনো পর্যন্ত উত্তরপ্রদেশীয়া আমি। কিন্তু, বায়ু বহে পুরবৈয়া। পূর্বে প্রবেশ করলাম বিহারে। আমারি কোলে গড়ে উঠল পাটলীপুত্র, ভাগলপুর, রাজমহল। তারপর সেই যে বাঙালী কবির গান:

"আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি" সেই ভালোবাসার সোনার বাঙলায়। বাঙলায় প্রবেশ করে আমার আমূল পরিবর্তন। সমুদ্র-ডাক কানে আসছে, প্রিয়তমের ডাক—নিষিদ্ধ আঙুলের ইশারা—উত্তাল উন্মাদনা। যৌবন-জল-জোয়ার! এত জল আমি আর বুকে ধরে রাখতে পারিনে, নিজেকে দ্বিখণ্ডিত করি। আমার এক আমি বয়ে গেল দক্ষিণ বাহিনী শান্ত, স্নিগ্ধ গঙ্গা অন্য আমি অজস্র জলরাশির ঢেউ তুলে তুলে পূবদক্ষিণ বাহিনী—পদ্মা। দুই আমির কানেই সমুদ্র-আহ্বান।

কত উত্থান-পতনের আমি সাক্ষী। কত গড়তে গড়তে চলেছি,

আবার লুপ্ত করে দিয়েছি কত। আমার কোলেই কত গ্রাম নগর। তবু মনে রেখো, আমাকে ডাক দিয়েছে সমুদ্র। তাকে বঙ্গোপসাগর, ভারত মহাসাগর, প্রশান্ত—অতলান্তিক যাই নাম দাও না কেন। একভাগ পৃথিবী ঘেরা তিনভাগ থইথই জলরাশি।

পদ্মা আবার হাসল, যেন বন্ধুই।

—এবার বুঝলে তো "চরন্ বৈ মধু্বিন্দতি"র মানে ?

এখনো ঘোর কাটেনি। সম্ভ্রম-বিস্ময়ে আবছা গলায় বলল :

—একটু একটু।

—বেণু, মনে রেখো, তুমি বারিন্দির নও, কলকাতায় যাচ্ছ বলে কলকাত্তাইয়াও নও। তুমি বাঙালী, ভারতীয় আবার বিশ্ব মানুষের অংশীদার।

বন্ধুর মত স্নিগ্ধকণ্ঠে বললেও বেণুর ভয় করল। চারদিক্ থম্থম্ নির্জন। তার মনে হল, স্বচরিত্র অনুযায়ী পদ্মা মস্ত দায়ভার দিচ্ছে তাকে।

ফিস্ফিস্ করল অস্ফুটে :

—চেষ্টা করব।

## পাঠিকা-[redacted]

ঋতাবরী রায় প্রদানিল :

—দাদা তোমার অ্যাড্‌মায়ার্ড মহিলা একেবারে ম্যাসাকার করে ছাড়লেন। এ আর অটোবায়োগ্রাফি বা রেমিনিসেন্স, স্মৃতিচারণ দূরে থাক—স্মৃতি-রোমন্থনও থাকল না। একেবারে ফ্যান্‌টাশী হয়ে গেল। না-হলে নদী কথা কয়।

আমি ঋতাবরীর রায়ে ভরসা রাখি। ও ভালো পাঠিকা। একটা সিরিয়াস্ বইকে সিরিয়াস্‌লী পড়তে জানে। তবু আমি সাংবাদিক। সাংবাদিকতা আমার পেশা, নেশাও। প্রশ্ন. জবাব, তদুত্তরে পুনঃপুনঃ অক্ষান্ত-প্রশ্নে চেপে যাওয়া সব জবাবগুলো লুকানো গহ্বর থেকে টেনে বার করে আনা, তাকে সর্বজন গোচরীভূত করা আমার প্রয়োজন। বহুদিনের প্রয়োজন-সাধনে দু'একটি ছেদবিন্দু রচনা হয়েই যায় আমাদের চরিত্রে। তার একটি প্রতিযোগীকে বুদ্ধু বানানো। বললাম :

—মনে নেই, সেই লেখা ? নদী, তুমি কোথা থেকে আসছ এই প্রশ্ন আর প্রশ্নের জবাবে নদার উক্তি হিমালয়ের জটা থেকে যিনি লিখেছিলেন তিনি—

—জানি শুধু ইন্‌টেলিজেন্ট নন, জীনিয়াস্। জগদীশবাবুর লেখা। ঋতাবরীর মুখ গম্ভীর। বেশীক্ষণ তাকে ক্ষুব্ধ রাখতে চাইনে। তাহলেই পাঠিকার-পলায়ন। আর কে-না জানে, সেই কোন্ আদিকাল থেকে পাঠিকার স্রোতেই ভেসে চলেছে পুত্র-পত্রিকা, উপন্যাস-গল্প, প্রেস্-পাবলিসিটি। শুধু আমাদের দেশেই নয়, ইউরোপ, আমেরিকাতেও। পাঠিকারা ক্রুদ্ধ হলেই অক্ষরজীবী আমাদের গতিপথ রুদ্ধ। আপোস খুঁজে বার কার।

—ওটা টেকনিক মাত্র। আসলে নদী কথা কইছে না, কথা বলছে বেণুই। বেণুর একাকী, নিঃসঙ্গ, অথচ সঙ্গপিয়াসী শব্দভরা মন।

শব্দ সঙ্গী পাচ্ছে নদীর কুলুকুলু ধ্বনিতে। অনেক সময়ই কাব্যের, শিল্পের, দর্শন-বিজ্ঞানে অর্থাৎ মানুষের এস্‌থেটিক এক্‌সজিসটেন্‌সকে প্রথম দোলা দেয় প্রকৃতি। তার অন্তর্নিহিত শক্তি অর্থাৎ সোর্স অব নেচারই ক্রিয়েটিভিটির আলো মুখে .ফলে। সিনেমা যেমন প্যান করে আলো ফেলতে ফেলতে একটা ক্লোজ-আপে আসে। পদ্মা-বেণুর আলাপ সেই ক্লোজ-আপ। বেণুর ইমাজিনেটিভ মনের স্টার্টিং পাচ্ছি এখানে।

ঋতা উৎসাহী আত্মস্মৃতিচারণ অত টেকনিক মেনে চলে না। সুন্দরের দায় নয় তার –সত্যের দায়। টেকনিকের ঘূর্ণিতে রিয়াল সত্য যায় ঘুলিয়ে। সিমপ্লিসিটি আর ট্রুথফুলনেসই স্মৃতিচারণের সত্য আংশিক। আসলে মহিলা স্মৃতিচারণের ছলে একটা উপন্যাসই দিয়েছেন। ·যাতে সত্য কম—বানানো বেশী।

—স্মৃতিচারণ আর উপন্যাসেরা পাশাপাশি ফ্ল্যাটেরই অধিবাসী। মাঝে মাঝে এ-ওর ফ্ল্যাটে প্রবেশ করেই যায়।

ঋতা তীক্ষ্ণ .—অনবধানে?

—না, ইচ্ছে করেই। নেক্‌স্‌ট ডোর নেবারের সঙ্গে আলাপ করতে। তোর মনে নেই Thomas Wolfe-এর সেই স্মরণীয় উক্তি; প্রথম নভেলের ভূমিকায় লেখা:

**All serious work is anto biographical.**

ঋতাকে আর খেলাতে চাই না।

—তোর কোনখানে বাধছে বলছি। বেণু যতক্ষণ ছোটখাট-আলাপ চালিয়েছে মেনে নিয়েছিস্‌। কিন্তু, যখন জোড়াসন হয়ে বসে—

—এক্‌জ্যাক্‌ট্‌লি। ঋতা কথা লুফে নিল। সুরক্ষী গোলরক্ষক ক্যাচ-ধরে বল বাঁচাল। ছুঁড়ে দিল খেলোয়াড়ী ভঙ্গীতে।

—জোড়াসনে বসে শোনা পদ্মার কাহিনী, সেতো বেণুর মনের প্রতিফলন নয়। উনি এ কর্মটি কেন করলেন জানো?

—আমার মতে আমি জানি। তোমারটা জানাতে পারো।

—মহিলা কন্‌সাস্‌। জানেন, তাঁর লেখায় মনোরঞ্জন কম।

ভ্রমণবৃত্তান্তের সঙ্গে কালিদাসের কুমারসম্ভব পাঞ্চ করে বক্স-অফিসের তোয়াজ করলেন। আজকাল যেমন ভ্রমণবৃত্তান্তে গল্পের পাঞ্চ চলেছে।

আমার খেলা বেকায়দায়। বললাম·

আমার মতে লেখিকা নেক্সট ডোর নেবারের ফ্ল্যাটে প্রবেশ করেছেন।

ঋতা ফের তীক্ষ্ণ: অনবধানে? লোডশেডিংএর রাত নাকি?

—না, ইচ্ছে করে। বৈচিত্র্য সন্ধানে।

ঋতা হেসে ফেলল:

—দাদা, তুমি তোমার প্রতিদ্বন্দ্বীকে স্বমতে আনবেহ। বরাবর দেখলাম। আমি তোমার রোল নিয়ে তুমি হয়তো আমার রোলটাই নিতে।

ঋতাবরী সত্য বলেছে। স্বমতে আনয়ন আমাদের মস্ত কাজ। কাজ নয় শুধু, প্যাশনও। এই প্যাশনকে বাঁচাতে আমরা অসম্ভব কষ্ট করি। অসংগত যত্রতত্র যাই। নোংরা, জঞ্জালস্তূপ ঘেঁটে তথ্য উদ্ধার করি। সেই তথ্যকে তীক্ষ্ণ ভাষায় শানিয়ে ধরি। আবার এহ জার্নালিস্টরাও স্তব্ধ হই—বুকে হাত রাখি। বুকের গভীর কথা কখনো গভীর সুরে বলি—তবে বেশীর ভাগই হাল্কা ঢঙে। যেহেতু ডেপথ্ অপেক্ষাও বিস্তার আমাদের কাম্য।

বনানী রায়-চৌধুরী যেদিন বলেছিলেন:

—জানো, তথাগত, ১৯২৯ থেকে ৩১।৩২ অর্থনীতির ইতিহাসে Slump-এর যুগ। পৃথিবী জোড়া সাংঘাতিক মন্দা—ভারতবর্ষেও তার জের চলছে--সবচেয়ে বেশী বাঙলায়। সরকারের বে-নজরে পড়া বাঙলার যুবকরা বেকার। কিন্তু, বেণুর জীবনে ওই প্রথম বুম্ (boom) প্রথম-উত্থানের ঢেউ। স্বাধীন বিচরণ, পদ্মার সাহচর্য, বাবার চাকরি—নিজেদের একটা বাড়ি। যে বাড়িতে সে সবাইকে হাঁকডাক করে ডাকতে পারবে—এসো, আমার বাড়ি এসো, আমাদের বাড়ি। দারুণ—ফ্যান্টাসটিক্।

সেদিন আমি বুকে হাত রেখেছিলাম। কেন জানি না, এই আধচেনা মহিলার প্রতি আমার অদ্ভুত আকর্ষণ। যুক্তি বলে: আমরা জার্নালিস্ট, জানা আমাদের মস্ত কাজ। যে অতীত-সময়ে উনি দাঁড়িয়েছিলেন সেই সময়কে যেমন ওঁকে জেনে জানব—তেমন কোনো পুস্তক পাঠে নয়। আর যুক্তির তীরভূমি পার হয়ে একটা গভীর সজল কথা প্রাণে বাজে—যে মাকে আমরা শিশুকালেই হারিয়েছি, যেন সেই মা এসে বসেছেন কাছে। জল অতল থেকে উঠে স্ব-জীবন কাহিনী বলছেন · যা আমাদের কাছে কিছুটা বাস্তব আর কিছু স্বপ্নলোকের। বলার সুরেলা স্বরটা হিপ্‌নটিক্।

## দিনগুলি : রাতগুলি

কিশোরী ঝাঁপি খোলে :

কিছু সূর্যোদয়, অনেক অন্ধছায়া
অনেক রুদ্ধরোষ, কিছু মেঘের মায়া
ধুলো, বালি, পাতা
রোদের চমক গাঁথা।
এক বুক জল কান্না, কিছু অসুখ, সুখ
বৃষ্টি পড়ে টাপুর-টুপুর, হীরা-মানিক-পান্না
পায় না কোথাও। মুক্তো হাতে ঠেকে।

শেয়ালদহ স্টেশনে ট্রেন ঢুকতেই প্রতুলচন্দ্র বললেন :

—বেণু, আমরা কলকাতায় এসে গেলাম।

"কলকাতা" শব্দটিতে প্রতুলচন্দ্র অনেকখানি মায়া জড়িয়ে দিলেন। কলকাতাকে দেখেছিলেন প্রথম কৈশোরে। কী মোহই লেগে গেল, কলকাতা ছেড়ে বেশীদিন কোথাও থাকতে পারলেন না। চাকরি পেয়েছিলেন বিহারে, উত্তরপ্রদেশে কলকাতা টেনে এনেছে সাতদিন না যেতেই। বেণুর নিজের এমন অনুভব নেই, নেই প্রথম দেখার অবাক-বিস্ময়। এর কোলেই তার জন্ম এবং বৃদ্ধি।

স্টেশন, হাঁকডাক, কুলী, ঘোড়গাড়ি, গাড়ির মাথায় বিছানা-ট্রাঙ্ক, ভেতরে মা-বাবা, বেণু। হ্যারিসন রোড, ট্রাম, বাস, গাড়ি, ঠেলাগাড়ি, ফুটপাথে হাঁটা মানুষ, গায়ে লাগোয়া বড়ো বড়ো বাড়ি—অনেক ব্যস্ত, ত্রস্ততা—নির্জনতাহীন অতি। এই অতি বেণুর ভালো লাগল না।

হাওড়া ব্রীজ। ব্রীজে উঠতেই গঙ্গা। বেণু জানে, দুপুরবেলায় ব্রীজটা খুলে এদিক ওদিকে সরে যাবে, মাঝখানের মস্ত ফাঁক দিয়ে পার হয়ে যাবে বড়ো বড়ো জাহাজগুলো। গঙ্গার বুকে দাঁড়িয়ে

অনেক জাহাজ, এপার-ওপার দু'তীরেই বাড়ি, কলকারখানা, বড়ো বড়ো চিমনি, গলগল ধোঁওয়া ছাড়ছে বাঁশি বাজছে, বাঁধানো গঙ্গা। পদ্মার অপর প্রান্তের দিগন্ত বিথার থইথই সবুজ, চাষীদের চাষ, এপারের চরের ছোট ছোট ছেলেমেয়ে, কিশোর-যুবক দুই চরণের অন্ত্যমিলে মিলিয়ে কবিতাখানির দেখা মিলল না। নিঃশ্বাস পতন-শব্দে মায়ালতা চকিতে দেখলেন মেয়েকে।

বাঁয়ে হাওড়া স্টেশন। শেয়ালদহ থেকে অনেক বড়ো, অনেক রাজকীয় সমারোহ। সারা ভারত-সংযোজনকারী। উত্তর-দক্ষিণ-পশ্চিম। পূবটা শেয়ালদহের আওতায়। এই ভূগোল বেণু জানে। জানে, হাওড়া দিয়েই পুরী। পুরী যেতে খুব ইচ্ছে তার। যেমন ইচ্ছে শিলিগুড়ি হয়ে দার্জিলিং যেতে। উপস্থিত তার মনে একখানা অদেখা বাড়িই প্রবল। পুনঃ ব্রীজ, তলে নদী নেই, রেললাইন সব এলিয়ে চলেছে দূর-সুদূরে। বাবা বললেন.

—বাকল্যাণ্ড ব্রীজ। আমরা হাওড়ায় এসে গেছি।

ব্রীজ শেষ। বাঁ দিকে বড়ো বাড়ি, খোলা প্রাঙ্গণ। প্রাঙ্গণে মহীরুহ। বাবা হাসলেন: হাওড়া কোর্ট। শুনেই মুখ তুললেন মায়ালতা। বেণু মুখ বার করল সাগ্রহে, এখানেই প্র্যাকটিশ করছেন বাবা। গাড়ি চলমান। টাউন হল, হাওড়া ময়দান, বাঁয়ে বাঁক, ফের ডাইনে, আর ট্রাম নেই, বাস। বাজার দোকান, পীচের রাস্তা, লাল রাস্তা। ক্রমে ছোট হয়ে আসছে ক্রমশঃ সরু গলির মুখে প্রতুলচন্দ্র বললেন. কোচোয়ান, গাড়ি রোক্‌খো। গলিতে বড় জোর একজন চলতে পারে, বেণু হাঁটছে জোরে: কী দেখব, কী দেখব, কী দেখব। আজব বাড়ি তার দরজা খুলে মায়াবী গলায় ডাকবে:—এসো, তোমার ঘরে এসো, তোমার নিজের ঘরে। যদিও গলিটা মনের ওপর চাপাতে চায় হতাশা, তবু মনে ছিল আশা, হঠাৎ গলি শেষ। কানা গলিটা জুড়ে দোতলা বাড়ি। চুন-বালি-খসা, এখানে-ওখানে পলেস্তারা নেই, ইট বারকরা হাহা। যেন আদ্যিকালের বদ্যিবুড়ো হাজার বছরের হাড়পাঁজর বার করে

কাঁধে। কতদিন ভূতের ভার কাঁধে বয়ে বেড়াবে দশ বছরের বেণু? তার সমস্ত অস্তিত্ব খোঁজে আশা। হীরকোজ্জ্বল আশা। নীল আকাশ, সবুজ ঘাস, দিগবলয় ঘেরা নারিকেলরাজি, সূর্যোদয়-সূর্যাস্তর গোধূলিতেই যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে নীলকান্তমণির নীল, পান্নার সবুজ, চুণীর প্রাণরঙানো আশা। কিন্তু, হীরে? বেণুর কেমন যেন মনে হয় এই সব দুপুর মজলিশের প্রতিক্রিয়ায়, বড়ো মানুষের মত বড়ো আর কিছু নেই। অন্য মানুষের বুকের মধ্যেটা আলোয় আলো করে দেন যাঁরা, হীরকোজ্জ্বল আশাটা বেণু তুলে রেখে দেয় সেই সব মানুষের জন্যে।

অফিস থেকে এসেই পুলিনবিহারী বন্ধ দরজা খোলেন:

—বেণু মা।

—যাই জ্যেঠু।

সেদিন দরজা খুলতে সন্ধ্যা গড়ে রাত।

বেণু মা, দুধটা বৌমার কাছ থেকে গরম করে আনো তো, আমাদের উনুনে আজ আঁচ পড়েনি। তোমার জ্যেঠুমার অসুখ করেছে।

—জ্যেঠু, শুধু দুধ খাবেন? কণ্ঠস্বর উদ্বিগ্ন।

—পাগলী মায়ের ভাবনা শুরু হল। ভাবচ, ছেলের কষ্ট হবে। নারে বেটী, ফলার খাবো। মুড়ি. গুড়, দুধ, চমৎকার খেতে। মিনিট পনের বাদেই পুলিনবিহারী অবাক্: বেণু মা কি ম্যাজিক জানো? নিয়ে গেলে দুধের বাটি। ফিরে এলে হাতজোড়া থালা, রুটি, তরকারি, গরম গরম ভাজা, গরম দুধ।

—মা বললেন, আমরা থাকতে আপনি ফলার খাবেন কেন? জ্যেঠিমা কি খাবেন? দুধ-সাগু না দুধ-বার্লি?

—আজ কি আর ওকে খাওয়ানো যাবে? শুয়ে পড়ে আছে। গলায় এমন হাহাস্বর, ভাবাই যায় না একটু আগেই উচ্ছ্বসিত ছিলেন। সবসময় অগ্রসর হয়ে প্রথম কথা বলেন। উচ্চকণ্ঠে, সরস, উচ্ছল।

জ্যেঠুর এমন নিম্ন কণ্ঠস্বর, নিম্ন এবং আর্ত! তবে কি কঠিন অসুখ। বেণু ইতস্তত করছে, দেখতে যাবে কি যাবে না? শক্ত-শক্ত কঠিন ভঙ্গীর মানুষটিকে সে এড়িয়ে চলে। দীর্ঘশ্বাসের শব্দে চমকে উঠল বেণু, জ্যেঠুর বুক থেকেই ঝরছে। বেণু জানে না। দুপুর থেকেই স্বর্ণময়ীর ভালো লাগছিল না। বুকের মধ্যে সেই আর্ত জন্তুটা গুমরে উঠেছিল অনেকদিনের পরে। কাজকর্মে মন লাগছিল না। কাঁপছিল হাত-পা। গুমরোতে গুমরোতে যন্ত্রণায় অস্থির কখন বুকের খাঁচা ভেঙে লাফিয়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়বে ক্ষ্যাপা পাগলটা আর সেই লাফানোর সঙ্গেই হাত-পা ভেঙে দুমড়ে-মুচড়ে তিনি মনে হতেই সদর দরজার খিল খুলে দুয়ার ভেজিয়ে দিয়েছিলেন সন্তর্পণে। কড়া নেড়ে সাড়া না পেলে পুলিনবিহারী ঠিকই বুঝবেন। উনুনে আঁচ দিয়ে রুটি কটা সেরে রাখতে পারলে হয়—ঘুঁটে বার করে কয়লায় হাত দিতে যাবেন, অমনি ভূমিকম্প। হাত-পা-ভেঙে মুখ থুবড়িয়ে পড়লেন মাটিতে। অনেক কষ্টে টেনে তুলে শুইয়ে দিয়েছেন পুলিনবিহারী। এলোমেলো চুল, বালিশে শায়িত মাথা, কঠিন ভঙ্গীর জ্যাঠাইমা এমন করুণ-শায়িত, এত অসহায়—বেণুর কষ্ট হল। পাশে বসে বলল:

—জ্যেঠিমা, জ্বর হয়েছে?

স্বর্ণময়ী মাথা নাড়ালেন। না।

—মাথা ধরেছে। হাত বুলিয়ে দেব?

কপালে হাত রাখল বেণু। সামনের চুলগুলো ঈষৎ ভেজা। জ্যেঠু বোধকরি মুখে-চোখে জল দিয়েছিলেন। হাত বোলাতে বোলাতে স্বর্ণময়ীর শরীর কেঁপে উঠল।

—শীত করছে, একটা চাদর এনে দিই।

বেণু উঠতে যাবে, তাকে অবাক্ করে দিয়ে স্বর্ণময়ীই উঠে বসলেন অকস্মাৎ। অবাক্-বিহ্বল বেণুর হাতটা নিজের দুহাতের মুঠোয় ধরে সেকী কান্না! কান্না—কান্না!

অতঃপর এ বাড়ি ও বাড়ি এক হয়ে গেল। দরজা খুলত ভোরে, খিল লাগত রাত দশটায়। কঠিন ভঙ্গীর জ্যাঠাইমার মধ্যে যেন

—ও যদি ছেলে হ'ত।

—স্কুলে যেত মায়া, তর্ক কোর না, বেণু ছেলে নয়, মেয়ে।

সেদিনকার মত থেমে গেলেও থামলেন না মায়ালতা। সুযোগমত তুললেন ফের :

—আমাদের অবস্থা ভালো নয়। ওর বিয়েতে খরচ করতে পারব না। ভালো বিয়ে হতে পারে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করলে।

—প্রাইভেটে দেবে।

—মেয়েটা মরে যাবে। চারদিকে শুধু আমাদের মতো বাড়ি আর বুড়ো মানুষের সঙ্গ। মনের খোরাক পাচ্ছে না।

আকুল মায়ালতা।

শহরের সবেধন নীলমণি : হাওড়া উচ্চ ইংরাজী বালিকা বিদ্যালয়। এ তল্লাটের কোনো বালিকা বা কিশোরী সেই স্কুলগামী নয়। গলির মুখ যেতে বেণু স্কুলবাসে ওঠে, কাসুন্দের লাল রাস্তা পার হয়ে খুরুট রোডে তার পরবর্তীজন। সাঁত্রাগাছি, ব্যাটরা, কদমতলা, রামরাজাতলা, শিবপুর, লিলুয়া, বেলুড়, বালি : দুই বাস, দুই ট্রিপ্। বেণুর ফার্স্ট ট্রিপ্। ভর্তির দিনে একটা নতুন নামের অধিকারী হল। বাবা নাম লেখালেন : কুমারী বনানী রায়। বাড়ি ফিরেই মাকে জিজ্ঞাসা : বনানী মানে কি মা?

মায়ের জবাবে মনে পড়ল পদ্মার অপরতীরের বৃক্ষগুলি বনরাজিনীলা। রাজশাহী স্টেশন-লাগোয়া শিরোল জঙ্গলের কথাও মনে পড়ছিল। দোলের আগে সদলে বাঁশ কাটতে গিয়েছিল বাঁশের পিচকারি হবে। বাঁশের সঙ্গে বাঁশির একটা সম্পর্কও আছে। বেণুবনের মানে সে জানে। তবু বনানী নাম মনে ধরল না। বাবা যদি জিজ্ঞাসা করতেন, তোকে আর একটা নতুন নাম দেব। কী নাম নিবি? সুদক্ষিণা—ত্বরিত জবাব দিত একটুও দেরী করত না।

সুদক্ষিণা ওরফে বনানী ওরফে বেণু জানল না তাকে নিয়ে মহিলা মজলিশে আলোচনা হয়ে গেল। প্রমীলাপিসি বললেন :

বাপের জন্মে শুনিনি বাপু মেয়েছেলে জুতো পায়ে, ব্যাগ ঝুলিয়ে

স্কুলে যায়। মেয়েমানুষকে নেকাপড়া শিকিয়ে কী উব্‌গার গা? সে কি উকিল, ব্যারিস্টার হবে বাপের মত? মগনমাসিমার গালে হাত—ছ্যা ছ্যা কী কাণ্ড। তোমার ওই ব্যাগদোলানো মেয়ে আর শ্বশুরঘর করতে পারবে? সত্যি বলচি ভাই, বাণীর শাশুড়ির দুঃখের কথা ভেবে আমার কান্না পাচ্ছে।

এমন কি জ্যাঠাইমাও বললেন: অযথা টাকাগুলো মাসে মাসে নষ্ট। থাকলে বিয়ের যৌতুক হত।

মায়ালতা নিরুত্তর। সবার সবকথা শেষে বললেন:

—পান খাবেন ভাই। উনি খুব ভালো ছাঁচিপান এনেছেন।

বাইরে বেরিয়ে প্রমীলাপিসি বললেন:

—দেখলি মগন, মাগীর দেমাক। ঠোঁট টিপে রইল। শেষে পান খাইয়ে মুখ বন্ধ করে দিলে।

—বড়লোকের বিটি যে, ধরাকে সরাজ্ঞান কচ্চে।

—বেরুবে সরাজ্ঞান। মাগীর অহঙ্কার ভাঙ্‌বে। ওই বিদ্যেবতী মেয়ে বিদ্যেধরী হয়ে নাকানি-চোবানি না খাওয়ায় তো আমার নাম প্রমীলা ঠাকরুণ নয়। দেকিস্‌, বেঁচে তো থাকবি।

বেণু এখন সুখের মুখ দেখছে। সুখের অনেক মুখ। মেজদির সখিত্ব, তাকে কেন্দ্র করে আরও কয়েকটি মেয়ের প্রীতিপাত্র হয়ে ওঠা তারপরেও স্কুল। স্কুলের শিক্ষিকারা, ক্লাসের সহপাঠীরা, বাসের সহযাত্রীরা। পৃথিবীটা এঁদো ডোবাতেই আবদ্ধ নয়—খুলছে বড়ো পৃথিবী। হাওড়া গার্লস্‌কে রাজশাহীর প্রমথনাথ স্কুলের সঙ্গে মেলাচ্ছে বেণু, মিলে অমিলে। রাজশাহীর স্কুলবাড়িগুলি ছড়ানো ছড়ানো, মস্ত কম্পাউণ্ড; এখানে আঁটোসাঁটো দোতলা বাড়িটা, কম্পাউণ্ডের পরিবর্তে মাঝারি একটা উঠোন। রাজশাহীতে শিক্ষিকারা সকলেই হিন্দু, একমাত্র নাজিমা দিদি আসতেন বুরখা লাগিয়ে, সেলাই শেখাতেন। এখানে সব শিক্ষিকাই ব্রাহ্ম। অনেক বেশী ঝক্‌ঝকে। কলকাতা থেকেই আসেন। হেডমিস্‌ট্রেস আসেন

রোমে রোমে রিনিঝিনি উঠেছিল, রক্তে রক্তে। কুড়ি বছরের এই যুবকটিকে যদি প্রণাম জানাতে পারত। দেখা হত মুখোমুখি, বেণু ভাবে, হীরক-মানুষের দেখা পেত তাহলে।

শনিবার ওদের ছুটি। হাতে নিয়েছে "বেণু"। মেজদিকে পড়িয়ে শোনাবে আশ্চর্য সেই চিঠি। মনে হল, বাড়িটা থম্‌থম্‌ করছে। জ্যাঠাইমার আরক্ত নয়ন, মেজদি সকরুণ।

—মেজদি, কি হয়েছে?

মনোরমা মুখে আঁচল চাপা দিয়ে কেঁদে উঠল; একটু পরে আঁচল সরিয়ে বলল: কাল রাতে মাকে বাবা মেরেছেন।

—মেরেছেন! জ্যাঠামশায় জ্যাঠাইমাকে মারেন! সত্যি বল্‌ছো?

—মেজাজ খারাপ হলেই মারেন। পান থেকে চুন খসবার যো নেই। দেখিসনে, মা কত ভয়ে ভয়ে থাকেন। বাক্সভরা শাড়ী-গয়না, পরেন না। পাটভাঙা ধোপদুরস্ত শাড়ী পরলেই—কাকে রূপ দেখাচ্ছ?

বেণু দাঁড়িয়েছিল, বসে পড়ল। আবার উঠে দাঁড়াল, বসল। ছট্‌ফট্‌ করছে। বলে উঠল অস্থির:

—তোমরা বাড়িশুদ্ধ এতগুলো মানুষ, অথচ কেউ কিছু বললে না? প্রতিবাদ করলে না?

—কে করবে রে, কার ঘাড়ে কটা মাথা? অবিশ্যি শেষ অব্দি, কাকাবাবু দোরে ধাক্কা দিয়ে বললেন:

—দাদা, বৌদি মারা গেলে আমাদের সকলের হাতে হাতকড়া পড়বে যে। মনোরমা বলতে থাকে:

এমনিতেই সন্দেহ-বাতিক, তার ওপর ছোটপিসির লাগানি-ভাগানি। কাল বিকালে বাবা বেরুলেন। মা খানকতক গহনা বার করে পরলেন। এমন সময় অবাক জলপানওলা পায়ের ঘুঙুর বাজিয়ে ছড়া গাইতে গাইতে এলো। সবার সঙ্গে ছুটে এসে মাও বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলেন। সে যদি তুই দেখতিস্‌, মা যেন কোন ছোট্ট মেয়ে,

তাঁর বাপের বাড়িতে আছেন, এমনি আনন্দ। রাতে বাবা খেতে বসেচেন, একপাশে মা পাখার হাওয়া করচেন, অন্যপাশে ছোটপিসি ; এটা খাও, ওটা খাও, আমার মাতা খা', করছেন। খাওয়া মাঝামাঝি, ছোটপিসি আর থাকতে পারল না। বলে উঠল, দাদা তো বেরুলে। তার পরেই বৌদি কী সাজের ঘটা আর বারান্দায় দাঁড়িয়ে হাওয়া খাওয়া। আমার মনটা হায় হায় করে উঠল, এমন রূপের বাহার আমার দাদাই দেকলে না।

দপ্ করে আগুন জ্বলে উঠল বাবার চোখে। থালা ঠেলে উঠে পড়লেন। সোজা শোবার ঘর। আমাকে বললেন :

—মাকে ডেকে দে।

বলির পাঁঠার মত কাঁপছেন মা। আমাদের চোখের সমুখেই ঘরে ঢুকলেন। দোর বন্ধ হল। তারপর কান্নার শব্দ। ক্রমে বাড়তে থাকল ক্রমেই।

মনোরমা ফের কেঁদে উঠল। বেণুর কান্না পাচ্ছে না। বুকের মধ্যেটা হুহু জ্বলে যাচ্ছে। ফেটে যাচ্ছে। ফট্‌ফট্ ফাটছে বাঁশ, অন্য গাছপালা। জঙ্গলে আগুন লেগেছে। আগুনের বেড়াজালে বনানী।

পরের শনিবার ফের এলো। মনের মধ্যে নানা প্রশ্ন। প্রশ্নগুলি করবে মেজদিকে। মেজদিদের বিছানায় একটা বাড়তি বালিশ পাড়তে দেখে জিজ্ঞাসা করল. কে এসেছে মেজদি? কাউকে দেখছিনে তো?

—কেউ না, কাকিমা শোবে।

—কাকিমা!

—কদিন থেকেই শুচ্চে।

অবাক বেণুর বোধগম্য হচ্ছে না বুঝে মনোরমা বলল :

—রাগারাগি হয়েচে। রাগ হলেই কাকাবাবু ঘর থেকে বার করে দেন।

—তাড়িয়ে দেন? কাকাবাবুও মারেন নাকি?

—মারেন না। বার করে দিলে কাকিমা আমাদের বিছানায় শুতে আসে।

—কাকিমার লজ্জা করে না? দুঃখ হয় না? রাগ হয় না?

অনেকগুলো প্রশ্ন।

—দুঃখ তো হয়ই। লজ্জাও। প্রথম প্রথম মুখ নিচু করে আসত। মুখে আঁচল-চাপা দিয়ে শুয়ে পড়ত, আমাদের সঙ্গে কথাটি কইত না। এখন উঁচু মুখে আসে। পান খায় বেনারসী জর্দা দিয়ে। গল্প করে, পানের পিক্ ফেলে এসে বলে .

—ব্যাটাছেলের মুয়ে আগুন।

বেণুর বুকের ভেতরটা হঠাৎ মরুভূমি। ধু ধু বালুরাশি, দিক্ দিগন্তজোড়া। দিক্‌বিদিক্‌হীন। কোথাও বৃক্ষলতা, সবুজের দর্শন পায় না বনানী। বড় তৃষ্ণা, অথচ একফোঁটা জল নেই! তপ্ত বালি। তৃষাতুর কণ্ঠে বলল:

—চলি মেজদি।

কদিন পর ফের মনোরমা সমীপে। এবার "বেণু" হাতে নেই। শুধু প্রশ্ন।

—মেজদি, সন্দেহটা কি জিনিস? কেন জ্যাঠামশায় সন্দেহ করেন?

—এক রকম বিশ্রী রোগ। সব সময় মনে হয়, অন্য পুরুষের দিকে নজর। আমার দিকে নজর নেই।

—তাহলে মেরে লাভ? মেরে কি ভালোবাসা পাওয়া যায়?

—ভালোবাসার জন্যে কে মারছে রে? পুরুষমানুষের দম্ভের প্রাণ, দম্ভতুষ্টির জন্যে মারছে?

—আর ঘরের বার করে দেওয়া?

—সেও দম্ভতুষ্টি। নেহাৎ মারতে বাধে, তাই।

বেণু অপলকে চেয়ে মনোরমার দিকে। এই মুহূর্তে মনোরমা অন্যরকম। যেন যাদের কথা বলছে তারা কেউ আপন নয়। বাবা নয়, কাকা নয়। তারা অন্য জাত। তারা পুরুষ।

বেণুর নির্বাক মুখের দিকে তাকিয়ে মনোরমা বলল:

—মেয়েমানুষ আমরা দাসী বৈ-তো নই।

—দাসী! বেণুর গলায় একরাশ তিক্ততা।

—দাসীরও অধম। তারাও রাগ করে, স্বাধীনতা আছে। মুখের ওপর চাকরিটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চলে যায়। আমরা তাও নই। বেণু, আমরা কেনা বাঁদী। আমাদের হাত-পা বাঁধা।

দাসী অপেক্ষাও অধম, কেনা বাঁদী। কদিন, ক'রাত বেণুর বড়ো কষ্টে কাটল, বড়ো যন্ত্রণায়।

মাত্র একটি সরলরেখায় জীবন হাঁটে না। যদি হাঁটত বেণু পুরুষ-নারীর তিক্ত সম্পর্ক অবলম্বনেই জীবন ব্যয়িত করত। জীবনের পদক্ষেপ নানাপথে, নানা বিচিত্ররেখার অলংকরণে। বেণুও মাত্র একটি রেখা ধরে অগ্রসর হ'তে পারল না। যদিও উক্ত রেখাটি তাকে দুঃখ দিয়েছে, যন্ত্রণা ভয়ংকর, তবুও। নানা ঘটনা জানা-অজানা তথ্যে জড়িয়ে এসে পড়ছে তার জীবনে। তাদের কিছু সরিয়ে, কিছু কুড়িয়ে, কিছু রেখে মর্ম-অভ্যন্তরে পথ হাঁটছিল যন্ত্রণায়—আনন্দে। কিছু হতাশার সঙ্গে কিছু আশা মিলিয়ে, আর কিছু বিশ্বাসে। ঘুমটা ভাঙা ভাঙা। ঘুমের ঘোরেই মনে হল কারা যেন কথা বলছে। খুব আস্তে, খুব নিবিড়। ঘুম ভাঙল। বুঝতে পারছে পাশের শয্যায় মা-বাবার যুগ্মগলা। রূপোপর্বের পর থেকেই একটা ভাবনা ওকে হানা দিত থেকে থেকেই। দাদামশায়-দিদিমা, মেসোমশায়-মাসিমা, মামা-মামিমা, বাবা-মা একই ঘরে থাকেন। অথচ দিদিমার পিতৃগৃহের কোনো এক বিধবা আত্মীয়াকে দাদামশায়ের সম্পর্কিত' কোনো এক পুরুষের সঙ্গে এক ঘরে নিভৃতে থাকতে দেখে নিগৃহীত হ'তে হয়েছিল। এমন কি চলে যেতে হয়েছিল তাঁকে। বেণু মাকে জিজ্ঞাসা করেছিল :

—সরলামাসিকে সবাই এমন বকছে কেন, মা?

—তুমি ছোট মেয়ে তোমার বড়দের কথায় থাকা কেন? আর যদি কখনো শুনি।

মায়ালতার এমন রুদ্রমূর্তি বেণু কখনো দেখিনি। ছোটমাসি বলেছিল : সরলাদিদি খুব অন্যায় করেছে, পাপ !

—পাপ কেন ? তুমি আর ছোটমেসোমশায়ও তো একঘরে থাক।

—কী পাকা মেয়ে রে বাবা, এখনি সব জানতে চায়। ছোটমাসি খুব হেসেছিল। আমরা স্বামী-স্ত্রী। সরলাদিদি বিধবা।

মাঝে মাঝে সব জানবার ইচ্ছাও তার হয়। ভাবে মেজদিকে জিজ্ঞাসা করবে। একথাও ভাবে এত ঢাকো ঢাকো ভাব যখন, আবৃত থাকাই ভালো। কে জানে, কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরুবে কিনা। সে ভাবে, কী করবে ? উশখুশ করবে ? করলেই মা বেরিয়ে আসবেন। বাবার মশারির মধ্যে মায়ের যাওয়াটা বেণুর চোখে উদ্‌ঘাটিত হয়, এটা মায়ের মনঃপূত নয়, তাই যখনি ধরা পড়েন, তার মনে হয় মা যেন কৈফিয়ৎ দেন। কী করবে, উশখুশ করবে না শুনবে মা-বাবার নিশীথ-আলাপ। শুনি, শুনিই না কেন। না না, এ'দোষ, এ' অন্যায়। শোনবার আগ্রহ, অপরাধ বোধ উভয়ের টানাপোড়েনে শোনবার ইচ্ছাই জয়ী হল। অসংযমী হল বেণু।

—তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে, কখনো এত কাজ করনি।

—নিজের সংসারে খাটছি, কষ্ট কীসের ?

—ঠিকে লোকটাকে ছাড়ালে কেন ? বাসন মেজে, কয়লা ভেঙে দিয়ে যাচ্ছিল।

—পাঁচটা টাকা বাঁচল। বেণুকে গানের স্কুলে দিলে চারটাকা করে লাগবে।

—গান স্কুলেই শিখছে। আবার গানের স্কুল কেন ? মায়া, তুমি বাড়াবাড়ি করছ। আমাদের ঘরে এসব মানায় না। বেণুকে কাজ শেখাও। বাবা বিরক্ত। বিরক্ত এবং আদেশের মত কণ্ঠ। মা নিশ্চিত থামবেন।

বেণু, অনেক কাজ করে।

—আমি বলছি, অন্য রকমের কাজ, রান্নাবান্না। শেষ পর্যন্ত এই তো করতে হবে। তুমি কি করছ? তোমার বাবা কত বড় চাকরি করতেন।

মায়ালতা বেশ স্পষ্ট স্বরে বললেন :

—আমি যা করছি বেণু তাই করবে কেন? আমি যা করতে চেয়েছিলাম করতে পারলাম না, হতে চেয়েছিলাম হতে পারলাম না, বেণু তাই হবে।

—মানে? বাবার গলায় বিস্ময়।

এম. এ. পাস করবে, কলেজে পড়াবে। গান গাইবে, কবিতা লিখবে।

বেণু তড়িতাহত। কেমন করে মা জানলেন তার কবিতা লেখার কথা। তবে কি আজ যেমন করে সংগোপনে বেণু শুনছে মা-বাবার আলাপ, তেমনি করেই মায়ালতা পড়েছেন তার লুকিয়ে রাখা খাতা। বরাবর লুকিয়ে রাখবে ভাবেনি, ভেবেছিল কয়েকটা মাস কেটে গেলে মাকে দেখিয়ে মুগ্ধ করে দেবে। হাহাস্বর বাবার :

—মায়া, আমাদের ঘরে এসব হয় না। এর স্বপ্ন দেখাও ভুল, মস্ত ভুল। তুমি জানো, আমার সাধ ছিল বিলেত যাব, ব্যারিস্টার হয়ে আসব। নামী দামী মানুষ। কিছু হলাম না। আজ পরের মন জোগাচ্ছি আর কোর্টে আসা-যাওয়া করছি প্রায় খালি পকেটে।

কিছুক্ষণ কোনো কথা শোনা গেল না। দুটো দীর্ঘশ্বাস পতন শব্দ। হয়তো বাবার এবং প্রতিধ্বনি তুলে মায়ের। মা বোধকরি বাবার মাথায় হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিলেন :—তোমার বাবা-মা কেউ কিছু ভাবেন নি তোমার জন্যে। কাকার বিরাট জমিদারী, ছেলে মাতাল, দুশ্চরিত্র। তুমি বাড়ি থেকে পালিয়ে পরের বাড়িতে থেকে ম্যাট্রিক পাস করলে, কাকা হস্টেলে রেখে ইনটারমীডিয়েট পড়ালেন। কথা দিয়েছিলেন বিলেতে পাঠাবেন। ব্যারিস্টার করে আনবেন। হঠাৎ মারা গেলেন। একা আর মানুষ কতদূর যেতে পারে? তাই ভেবেছি, তোমার না হওয়া, আমার না-হওয়া

সব বেণুর মধ্যে পূর্ণতা পাবে। ও অধ্যাপিকা হবে, গায়িকা, লেখিকা।

—সব একসঙ্গে হওয়া যায় না, একটা বেছে নিতে হয়। আমাদের ঠাকুর-পরিবার, চৌধুরী-পরিবার নয়।

বাবা বললেন : আমার ইচ্ছে, বেণু লেখিকা হোক্।

ঘাম ছুটেছে, সারা অঙ্গে কাঁটা। প্রবল চাপ আসছে। মা চান বেণু অসাধারণ হোক্। সে ইচ্ছায় বাবার ইচ্ছাকেও যুক্ত করে নিলেন। এই উচ্চাশাময় ভাবনাকে পূরণ করা দুঃসাধ্য-সাধন। মা-বাবাকে যতই ভালোবাসুক, সে মা নয়, বাবা নয়, সে বেণু। তবু জড়িয়ে যায় একটি সোনালী সরু জরির মায়াবী বেনারসী কাজ। ঝক্ঝকে স্বর্ণালী। মাসিক পত্রে বেরুবে তার নাম, তারপরে বই। নামী বেণু, দামী বেণু, উজ্জ্বল বনানী। ভাবতে গিয়ে আরাম লাগল। পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়ল এক সময়।

রেজাল্ট আউটের দিন। ইংরাজী, বাংলা ইতিহাস, ভূগোল, সংস্কৃত, স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানে বেণু ফার্স্ট। সবাই জানেন বনানীই প্রথম হবে। অঙ্কের টিচার ধমক লাগালেন : জিওমেট্রি, অ্যালজেব্রা কোনমতে ম্যানেজ করেছ। এরিথমেটিকে তোমার কী হয়ে যায়। কী হয়, বেণু নিজেই জানে না। অঙ্কে প্রথম হওয়া মেয়েটিই ফার্স্ট হল, দ্বিতীয় হওয়া মেয়েটি সেকেণ্ড। বনানী রায় থার্ড। একটু মন খারাপ হয়নি এমন বলবে না। স্থায়ী হল না, বিষণ্ন মুখে একটু এগোতেই দেখে হাইবেঞ্চে ঘাড়মুখ গুঁজে ধীরা। পিঠে হাত রাখতেই কেঁপে উঠল। নিশ্চয় পাস করতে পারে, নি। মা চিররুগ্ন, ঘরসংসার সামলিয়ে, ছোট ভাইবোনদের দেখাশোনা করে স্কুলে আসে, ফিরে গিয়েও কাজ, পড়বার সময় পায় না। এই মেয়েটি তাদের সঙ্গে আর একসঙ্গে বসবে না মনে করে বেদনায়িত হয়ে গেল। ভুলে গেল প্রথম না হবার দুঃখ। সান্ত্বনা কি দেবে বুঝতে পারছে না, ধীরা ফুঁপিয়ে উঠল :

—জানিস ভাই, আমার আর পড়া হবে না।

—কেন ?

—বাবা খুব রাগ করেন, সবটা সামলাতে পারি না তো। বলেছেন, ফেল করলে স্কুল ছাড়িয়ে নিয়ে যাবেন।

অপর্ণা, কমলারও একই কথা: এবার নিয়ে গিয়ে বিয়ে দিয়ে দেবেন। গলার কাছে কি যেন রুদ্ধ হয়ে আসছে থেকে থেকে। চোখ জ্বলছে, ব্যথা করছে। অদূরে নিরুপমাও বেঞ্চে মাথা রেখে। অথচ ফেল করবার মেয়ে নয়।

—নিরু।

আস্তে ডাকল। মুখ তুলল নিরুপমা. আরক্ত চোখ-মুখ, বলল:

—ফোর্থ হয়েছি।

—তবে কাঁদছ কেন ?

—সে তো বলবেই। নিরু ফুঁসে উঠল: থার্ড হয়েছো কি না। গলা নাবালো, কান্না কান্না গলা: দাদা কত পড়িয়েছেন! আমার আর মুখ দেখাবার উপায় রইল না। যদি সেকেণ্ড, থার্ডও হতাম।

এই মুহূর্তে বনানীর মনে পড়ল না মাও কত আশা নিয়ে বসে আছেন, বেণু প্রথম হবে। হয়তো বাবাও। নিরুর দুঃখের কাতরতায় ওর এতক্ষণের বেদনায়িত মন ঢেউ খেলিয়ে উঠল:

—বিশ্বাস করো, উপায় থাকলে আমি ফোর্থ হয়ে তোমাকে থার্ড করিয়ে দিতাম।

—বেণু, বাজে বকিস্‌নি বলছি।

—বাজে নয়, সত্যি বলছি।

পরবর্তী চালটায় মোক্ষম ভুল করে বসল:

—আচ্ছা নিরু, তোর মনে দুঃখ হচ্ছে না, ধীরা, অপর্ণা, কমলা, সুধা, হেমলতার জন্যে। ওরা পাস করতে পারেনি। ওদের কাউকে কাউকে ছাড়িয়ে নিয়ে যাবে, কারুর বিয়ে হয়ে যাবে, শুধুই ঘরকন্না করবে। কেউ নিচের ক্লাসে বসবে, আর আমাদের সঙ্গে বসবে না।

নয়, প্যারালাল তুটি সমান্তরাল রেখাও নয়; বাহুকোণে বিচ্ছুরণ। বহুসমস্যা, বহুসংকট, সংকট মোচন প্রয়াস।

বহুবিধ সংকট তার। দেহমন্থন কামনা এবং এথেটিকসের নন্দন-আলোর আকুতি; নারীর অধিকার-অর্জন-অভীপ্সা, সঙ্গেই নারীর প্রেমের ক্ষমার আকুলতা; স্বদেশ, স্বরাজ, দেশপ্রেম তৎসহ বিশ্বজনীনতা, মানবধর্ম; অস্তিত্বের অহং, নাম-যশ-খ্যাতির মোহ অথচ দূরে রাখতে চাওয়া ক্ষমতার মদমত্ততা; সেইসঙ্গে আকার নিরাকারের সত্তা-আন্দোলিত প্রশ্ন, দ্বৈত-অদ্বৈত; এবং সঙ্গ-নৈঃসঙ্গ!

—বাবা, লাইব্রেরীতে দর্শনের বই নেই।

—থাকবে না কেন? অজস্র।

—এবার কয়েকখানা দর্শনের বই এনো।

প্রতুলচন্দ্র এনে দিতেন কবিতা, গল্প, উপন্যাস। প্রবন্ধের বইও এনেছেন। জীবনীও। ইতিমধ্যেই সে পড়েছে "রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ" "মুক্তির সন্ধানে ভারত", "দেশের কথা" দেবেন্দ্রনাথের জীবনী। এবার এলো—"রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "ধর্ম", "শান্তি নিকেতন প্রবন্ধাবলী", রাজা রামমোহনের বই, উপনিষদের অনুবাদ। এর আগে একটা ঘটনা ঘটেছিল, প্রতুলচন্দ্রের অজানা। গানের স্কুলের ঘটনা সেটা। মাসিমা পরেছিলেন গরদ-শাড়ী। খোঁপায় যুগ্ম-চাঁপা, কপালে সাদা চন্দন-টিপ্। বেশ ভক্তিমতী লাগছে। নতুন গান দিচ্ছেন:

পাদপ্রান্তে রাখ সেবকে
শান্তি-সদন-সাধন-ধন দেব-দেব হে।

বনানীর পাশেই বসে অমিয়া, কানের কাছে ফিস্‌ফিস্ করল:

—বেম্মদের কীর্তি দেখ, নিরাকারের কি পা আছে যে পায়ে রাখবে?

কথাটা বেণুকে রীতিমত বিব্রত করেছিল, পাজল্‌ড: সত্যি, ধানের ছড়ার পাশে লক্ষ্মীর পা, সরস্বতীর পা শ্বেতহংসে শতদলপদ্মে নারায়ণের পা, সিংহবাহিনীর সিংহে, এমন কি খড়্গধারিণী কালীর পা

মহাদেবের বুকে, এসব কল্পনাও করতে হয় না, মুহূর্তে ভেসে ওঠে চোখে—কিন্তু, যার আকার নেই তার পা, সেই পায়ের শেষতমপ্রান্তে নম্র, নত-অবস্থান, ভাবতে কল্পনাকে টেনে নিতে হয় বহুদূর। অমিয়ার কথাটা ওকে নাড়া দিয়ে চলেছে—একদিন নয়, দিনের পর দিন।

রাজশাহীতে শুরু করা পূজা এখনো সারে বনানী। বসে সকাল-সন্ধ্যায়। কিন্তু, কোথায় যেন সুর ছিঁড়ে গেছে। সত্যনারায়ণ কথা, লক্ষ্মীর পাঁচালি এসব পড়তে তার আর ভালো লাগে না। দেবতারাও এত নিষ্ঠুর। মানুষের চেয়েও নিচে নেমে যান? তাঁদের তুষ্ট করলেই খুশি, আর পুজো না করলেই শাস্তি দিয়ে বসেন। এর চেয়ে কি অন্য কোনো দেবতা নেই, পৃথক এবং শক্তিশালী। শক্তিশালী অথচ প্রেমিক? রবীন্দ্রনাথের গানে এমনি একটা আভাস যেন আধোআলো-আধোছায়ায় ফুটে উঠত। নাথ, প্রভু—অথচ যিনি প্রেমপথের সব বাধা ভেঙে দেন।

নিরাকারের দিকেই ঢুলে যাচ্ছে তার মন, তবু মিথ্যে বলবে না, এখনো মাঝে মাঝে মন হরণ করে সরস্বতীর বীণাপাণি মূর্তিটি, মুদিত নয়ন বুদ্ধ অথবা ক্রুশবিদ্ধ খ্রীষ্টের এলায়িত দুই বাহু, মাথায় কাঁটার মুকুট। মাঝে মাঝে মনে পড়ে গোরার উক্তি :

"মূর্তিপূজাতে ভক্তিতত্ত্বের চরম পরিণতি নেই একথা আওড়াতে পারব না।" বলেছিল : "শিল্পে, সাহিত্যে, বিজ্ঞানে, ইতিহাসে কল্পনা-বৃত্তির স্থান আছে, শুধু ধর্মেই থাকবে না?" সুচরিতাকে বলেছিল : "গ্রীসরোমের মূর্তি পূজায় কল্পনা সৌন্দর্যবোধকে আশ্রয় করেছিল। আমাদের মূর্তিতে কল্পনা সৌন্দর্যের সঙ্গে জ্ঞান ও ভক্তিতে জড়িত।"

আকার-নিরাকার—নিরাকার। অনুভব : হৃদয়-মনকে প্রবল আকর্ষণ করছে নিরাকার। তাকে আকর্ষণ করছে, রবীন্দ্রনাথের "ধর্মের" সেই উক্তি :

"যাহা ধারণা করিতে পারি তাহাতে আমাদের তৃপ্তির অবসান হইয়া যায়।"

হে ধারণাতীত, তৃপ্তির অতিরিক্ত হে তুমি, বেণুর অন্তর সেই অতিরিক্তেই সিক্ত করো।

উপনিষদ বেণুর বালিশের নিচে, বুকের পাশে।

"এই বিচিত্র জগৎসংসারকে উপনিষদ ব্রহ্মের অনন্ত সত্যে, ব্রহ্মের অনন্ত জ্ঞানে বিলীন করিয়া দেখিয়াছেন। উপনিষদ কোনো বিশেষ লোক কল্পনা করেন নাই, কোনো বিশেষ মন্দির রচনা করেন নাই, কোনো বিশেষ স্থানে বিশেষ মূর্তি স্থাপন করেন নাই—একমাত্র তাঁহাকেই পরিপূর্ণ ভাবে সর্বত্র উপলব্ধি করিয়া, সকলপ্রকার জটিলতা সকলপ্রকার কল্পনার চাঞ্চল্যকে দূরে নিরাকৃত করিয়া দিয়াছেন।"

হে নিরাকার, হে সকলস্থান-অতিরিক্ত, সকল বিশ্বব্যাপী হে, তুমি বনানীর হৃদয়-মনকে তোমাতেই অভিষিক্ত করো।

মনে মনে আবৃত্তি করত বার বার—হে নিরাকার. কেননা—তখনো মাঝে মাঝেই আকার দিত দোলা।

মনোরমা ইতিমধ্যে স্বীকার করেছে নারীতত্ত্বের অভিজ্ঞতায় সে নিজেও অভিজ্ঞ। এই দেহজ ঘটনাটা বারো তেরোতেই ঘটে।

কারুর চোদ্দয়। বিয়ের প্রত্যক্ষ সংযোগ নেই, হলেও হবে, না হলেও। পরোক্ষ সম্বন্ধ আছে বিবাহের এবং সন্তান জন্মের।

সন্তান জন্মের অপরূপ রূপকথা শুনেছিল মায়ালতার মুখে। একদিন বাবা-মা কাতর-প্রার্থনা করেন: হে ঈশ্বর, আমাদের একটি শিশু দাও। প্রার্থনায় আন্দোলিত ঈশ্বর নেমে আসেন শিশু নিয়ে। চোখে দেখা যায় না তার রূপ, কানে শোনা যায় না তার গলার স্বর। নয়ন দেখে না, শ্রবণ শোনে না সেই অবাঙ্‌মনসোগোচরম্ ঈশ্বর—অনুরূপকে। তাকে মায়ের জিম্মায় দেন তিনি। সবচেয়ে নিরাপদ ভেবে মা তাকে লুকিয়ে ফেলেন গর্ভে। তারপর একদিন যন্ত্রণায় যন্ত্রণায় উন্মোচিত গর্ভগৃহ, যন্ত্রণার আবর্তে পড়া মা ও শিশুকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন ঈশ্বর। ঈশ্বর মা ও সন্তান ত্রয়ী সম্মেলনে শিশু মাতৃগর্ভ থেকে নামে মাটিতে। নেমেই উচ্চকান্নায়

অধিকার ঘোষণা—আমি এক নব ব্যক্তিসত্তা। ঠিক যেন একটি কবিতার জন্মকথা।

মনোরমা বলেছিল—শিশুর জন্মকথায় শুধু কবিতাই নেই রে, অনেক বাস্তব কথা আছে।

প্রকৃত-বাস্তব-জন্মকথায় সুখানুভূতি আসেনি। কষ্ট, ভয়, যন্ত্রণার পাশাপাশি কৌতূহল মিলে প্রায় অসুস্থ করেছিল। ইতিমধ্যে পড়েছে এঙ্গেলসের অনুবাদ বই "পরিবার-গোষ্ঠী ও রাষ্ট্র"। এগারোতে জেনেছিল "নারী-পুরুষের প্রেমের শুরু চারচোখের সম্মেলনে, সমাপন-চুম্বনে। অনেক জলধারা গড়িয়েছে তারপর। কিন্তু, শুদ্ধীকরণে বিশ্বাসী বেণু বাস্তব তথ্যের পাশাপাশি রাখতে চেয়েছে অপরূপ রূপকথা। রেখেছে, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, বৈষ্ণবকাব্য-পদাবলী। ভাবতে চেয়েছে, প্রেমে দেহ-সম্পর্ক কবিতায় ভাষা-ছন্দের সম্পর্কের মতই।

মনোরমা আঘাত হানল: তোর ইচ্ছে না থাকলেও সন্তান হতে পারে।

—মায়ের অনিচ্ছায়? দূর, তাও কি হয়?

"যৌবনেতে যখন হিয়া
উঠেছিল প্রস্ফুটিয়া
তুই ছিলি সৌরভের মত মিলায়ে।"

—হয়। দেখিস না, কত বিধবার ছেলে হয়ে যাচ্ছে, কত কুমারী মেয়ের। তারপর ঢাক, ঢাক, বাচ্চা নষ্ট কর, ডাস্টবিন নয়ত অনাথ-আশ্রম।

—তাতে কি প্রমাণ হয়, তাদের ইচ্ছা ছিল না, আবেগ ছিল না? সামাজিক নয় বলেই অনিচ্ছের নয়।

—কথাটা মেনে নিলাম। কিন্তু, তোর ইচ্ছে নেই, কোনো ইচ্ছেই নেই,—মনোরমা হঠাৎ নিষ্ঠুর হয়ে উঠল: কোনো পুরুষ বেকায়দায় তোকে জোর করে—আর তাতেই মা হয়ে যেতে পারিস্ তুই।

—মেজদি, চুপ করো। বনানীর আর্তনাদ: রূপোর মত কথা বোল না।

বেণুর মূঢ়তায় ক্রুদ্ধ মনোরমা :

—চুপ করবো কেনরে? লেখিকা হতে যাচ্ছিস। সব জানবি।

ওকে অবরুদ্ধ রোদনে ঘিরেছিল বেশ কয়েকদিন। ক্লেদাক্ত পাশবিক অত্যাচারেও জন্ম নিতে পারে একটি শিশু? বুকের মধ্যে তথ্যের দুর্বহ ভার, যেন ভারী প্রস্তর। ওর মন বলে, শিশুর জন্মকথা শুদ্ধ, অপাপ-বিদ্ধ হওয়া উচিত ছিল। অন্ততঃ বাবার প্রেমে মায়ের ভালোবাসায়।

নৈঃসঙ্গ-সঙ্গ; সঙ্গ-নৈঃসঙ্গ। স্কুলের বন্ধুরা সহযাত্রীরা, শিক্ষিকারা মেজদি, বাবা-মা, জ্যেঠু-জ্যেঠিমা সকলে মিলিত হয়ে যে সঙ্গ, তার চেয়েও অধিক এক নৈঃসঙ্গ তাকে একসময় আবৃত করে। তখন বড়ো একাকী লাগে। নৈঃসঙ্গের প্রথম দেখা রাজশাহীতে। দুবার এসেছিল সে। দুপুরের ধুধু রোদে নির্জন পদ্মার বালুরাশিতে পা ফেলে হাঁটতে হাঁটতে মরু বালুভাবনায়, আর একবার পদ্মার জলে পা ডুবিয়ে মুখ নিচু, তারার ঝাঁক দেখতে গিয়ে জলের আকাশে—বুকে টান লেগে গেল। মা-বাবা, প্রিয়জন, গানের ভুবন, বইয়ের জগৎ সমস্ত থেকে সরিয়ে এনে একান্তে অল্পসময়ের জন্যও নিরাশ্রয় করেছিল। অদ্ভুত নিরালম্ব, বিপন্ন। কে তুমি হে বেণু? কেন এই জন্ম? কেন যে এই অসংখ্য দিনরাত্রির হেলাফেলার মেলা? বিপন্ন করে রেখে যাবার সময় রসিকতা করেছিল : চলি বন্ধু, আবার দেখা হবে।

সে এখানেও আসছে। ভালো লাগে না তার আসা। বেণু এখন বনানী। নিরালম্ব, নিরাশ্রয় বোধটার কাছে নতি স্বীকার করতে রাজী নয়।

হারিকেন জ্বেলে ছাদে ওঠে বেণু। এখনো আকাশ অন্ধকার। খাতার ওপর লিখে চলেছে পেনসিলে। কখনো কেটে দিচ্ছে কোনো শব্দ। সময় জ্ঞান ছিল না। একটি কবিতা লেখা হল। নিভিয়ে দিল লণ্ঠন। তাদের ছাদ, আশপাশের ছড়ানো নারকেল-সুপুরী গাছ, আমড়াগাছের মাথাগুলো আলোয় আলোয় ভরা। তার মনে হয়, আজকের কবিতায় সে হৃদয়-মন ঢেলে দিতে পেরেছে। তার

হৃদয়-মন উন্মোচিত হয়ে দেহের অভ্যন্তর দিয়ে বয়ে এসে আঙুলের ডগা দিয়ে ঝরে পড়েছে। এই সেই সময়। সমুদ্র-মন্থনে উঠে এসে স্বতন্ত্র। এসেই তাকে জড়ালো নিবিড় এক আলিঙ্গনে। তার অনুভব হয়, কে যেন একজন এই নিভৃত অবসরে আসি, আসি, করেছিল, পারেনি—ফিরে গেছে। যে ফিরে গেছে, বনানীর মনে হয়, তার নাম নৈঃসঙ্গ।

—বেণু, এবার গল্প লিখতে শুরু কর। বাবা বললেন।

—ওরে বাবা, সে আমি পারব না। আতংকিত বেণু।

—আমার দ্বারা গল্প লেখা—হয়ে উঠবে না।

—কেন হবে না? এবার যে বড়ো কবিতাটা নিয়ে গেলাম, সম্পাদকমশাই সেটা পড়েই বললেন, চমৎকার গল্প আছে। বনানীকে গল্প লিখতে বলুন।

আছে বটে একটা গল্প। কিন্তু, লিখতে বসলেই এসে যায় কবিতা—ছন্দ মিল। ছন্দ-মিলের শব্দগুলিকে সরিয়ে সরিয়ে নিছক গদ্য—বনানী ভাবে—অসম্ভব; এই পরিবর্তন অসম্ভব-প্রায়। প্রায় আড়াই বছর তার কবিতা ছাপা হচ্ছে। প্রথম যেদিন ছাপার অক্ষরে বার হল তার নিজের লেখা, আজও মনে পড়ে, দুরুদুরু সেই বুকের কাঁপন। বাবার মুখে হাসি, হাসি মায়ের মুখে—বেণু অবশ্য হাসেনি, বেশ লজ্জিত লজ্জিত ব্রীড়াময়ী। বাবা প্রথমদিনেই পত্রিকাখানি নিয়ে গেলেন কোর্টে, বন্ধুদের দেখাবেন। জ্যেঠু বললেন পরের দিন:

—বেণু মা, মাসিকপত্রটা দাও তো, আপিসে নিয়ে যাবো।

জ্যেঠিমাও দুপুরের মহিলা-মজলিশে কথাটা ওঠালেন। সকলের অনুরোধে মায়ালতা সরু সরু গলায় পড়ে শুনিয়েছিলেন মাসিকপত্রে ছাপানো কবিতা। প্রমীলা পিসিমা, মগনমাসিমাও একযোগে বললেন:

—কী আশ্চর্যি গা। একরত্তি মেয়ের মধ্যে এত!

বেণুকে বলেছিলেন:

—হ্যারে বাণী, আমাদের নিয়ে পদ্য লিকবি তো?

মনোরমা অনেকক্ষণ নীরব, স্তব্ধ ছিল। তার আবেগবর্জিত নিরুত্তরতায় বিস্মিত হয়েছিল, যে মনোরমা খাতার লেখা পড়েই এতদিন মর্মরিত হত, ছাপার লেখায় সে মর্মাহতা ?

—মেজদি, ভালো হয়নি ? খুশি হওনি তুমি ?

—ভালোমন্দের কথা কীরে, তোর লেখা মাসিকপত্রে বার হল। আমি খুশি হবো না তো ও বাড়ির পদ্মীপিসি হবে ?

—না, তোমাকে যেন কেমন কেমন—

—জানিস্ বেণু, একটা ছবি দেখলুম। অবিশ্যি আজকের নয়, বেশ কিছুদিন পরেকার কথা। তোর নাম হয়েছে, লেখিকা হয়ে গেছিস্। অনেকদিন পরে আমার সঙ্গে তোর দেখা, চিনি চিনি করছিস্ কিন্তু চিনে উঠতে পারছিস নে। আমি এক লহমাতেই চিনেছি। তবু চিনি বলতে লজ্জা পাচ্ছি। তোর মধ্যে আমার মধ্যে দূর হয়ে গেছে। —বাঃ সুন্দর। হেসে ফেলল বেণু।

—তুমি এই গল্পটা লেখো মেজদি। চমৎকার হবে।

—ওই খানেই মুস্কিল যে রে। আমাদের ভাব আছে, ভাষা নেই। আমাদের মত ভাষাহীনদের জন্যই বিধাতা তোদের বেশী ভাষা দিয়ে পাঠিয়েছেন। আমাদের মনের কথা ভাষায় গেঁথে গেঁথে কবিতা, গল্প, উপন্যাস লিখবি। কিন্তু, দেখিস, শেষপর্যন্ত আমাদের ভুলে বসিস নে।

—আমি অনেককে মনে রাখব। আর তোমাকে—মনোরমার প্রতি নিবদ্ধদৃষ্টি :

—কোনোদিনো ভুলব না। কক্ষনো নয়।

—বেণু, একটা চিঠি পড়বি ?

—কার ?

—আমার।

—তোমার চিঠি আমি পড়ব কেন ছোড়দি ?

—আমিই তো দিচ্ছি। তোর খুব ভালো লাগবে। চমৎকার কবিতা আছে। নিরুপমা দেখতে সুন্দর। কিন্তু, কেন জানি,

তার ভালো লাগে না। মনে হয় ছোড়দি স্ব-যৌবন-চেতনাকে নিয়ে আসে অশ্লীলতার পাশাপাশি। তবু কৌতুকী হল, হাত বাড়াল—দাও।

বুকের কোটরে হাত ঢুকিয়ে দিল নিরুপমা। সযত্নে বার করে আনল, ভাঁজকরা এক চিঠি।

"তোমার লাল লাল ঠোঁট, গোল গোল বুক নিয়ে তুমি আমাকে সারারাত জ্বালাচ্ছ,

ঠিক্ করো না সই

রাতটা দুজনে কোথায়ো আরামে ঘুমোই।"

চিঠি পড়ে গেল হাত থেকে। কিছু বলবার আগেই মনোরমা কুড়িয়ে নিল পতিত-পত্র। কখন এসে গেছে অগোচরে।

—সব্বোনাশ, কার চিঠি?

—দাও। নিরুপমা রেগে গেছে।

—হতচ্ছাড়ী, এ চিঠি কি করবি?

—রেখে দেব। মাঝে মাঝে বার করে পড়ব।

—বাবা জানলে আস্ত রাখবেন না।

—জানি। কিন্তু, বাবা জানবেন কি করে? তোমরা আমার পেছনে কাঠি দিয়ো না। কেউ কিছু জানবে না।

একদিন নিরুপমা ধরা পড়ল। শাস্তি জুটল গালমন্দ, চড়-চাপড়। জ্যাঠাইমা চুলের মুঠি ধরে মাথা ঠুকে দিলেন। জ্যাঠামশায়ের হাতে চাবুক।

—হারামজাদী, আজ তোকে খুন করে ফাঁসী যাব।

বাড়িশুদ্ধ লোক তটস্থ। শেষরক্ষা করলেন কাকাবাবু। চাবুক কেড়ে নিয়ে বললেন :

—আর লোক হাসিও না দাদা। এখনো আইবুড়ো ছ'ছটা মেয়ে বাড়িতে। একটারও বিয়ে হবে না এই কেলেংকারী জানাজানি হলে।

এইজাতীয় শাস্তিদান বনানীর যেন মনে হয় ন্যায়-অন্যায় শোভন-অশোভনতার চেয়ে নিরুপমা মেয়ে বলেই। আহত হল, এর অপমান

নিরুপমার গায়ে লাগেনি বলে জানালার ধার, বারান্দা ছাদ সব বন্ধ নিরুপমার। রাতে তালাচাবি পড়ে ঘরে।

—ছেলেটা কে মেজদি?

—কে জানে? ছেলেটা রাস্তায় দাঁড়াত আর পাগলের মত ছুটে আসত ছোটকু।

—কেমন ছেলে, কেমন শিক্ষাদীক্ষা কিছু না জেনেই।

—কী করবে বল? ভালোবাসলে মানুষের জ্ঞানগম্যি থাকে না।

—ও আবার ভালোবাসা নাকি? যাই বলো, ছোড়দির প্রায় সবটাই শরীর।

—কিন্তু, বেণু, একথা তো মানবি, ভালোবাসায় শরীরও আছে। শুধু ছোটকুর শরীরই নয়, আমার আছে, তোরও আছে।

—জানি, জানি। বনানী অস্থির। অস্থির গলায় বলল, আমি সেইজন্যই শরীরটাকে মন দিয়ে, হৃদয় দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে মুড়ে ফেলতে চাই।

—তাহলে পুরুষমানুষকে তোর একেবারেই দরকার নেই বল। এতই কবিতা যখন।

অষ্টাদশীর দিকে তাকাল চতুর্দশী।

—তাতো বলিনি। সেই পুরুষকেই চাই, যে আমার হৃদয়-মন-বুদ্ধিতে মোড়া দেহটাকে বুঝবে। যে আমার কবিতাকে বাঁচিয়ে রাখবে, নষ্ট করবে না।

—আজকাল রবিঠাকুরের কবিতা, গল্প, উপন্যাস পড়ে পড়ে তোর এই দশা হচ্ছে। আগে তো বিয়ের কথায় খেপে যেতিস।

—এখনো বিবাহের কথায় লুব্ধ নই তবে সব পুরুষ নিশ্চিত এক নয়। বিনয়, গোরা, নিখিলেশকে রবীন্দ্রনাথ এমনি এমনি সৃষ্টি করেননি। নিশ্চিত এমন কেউ আছে যার জন্য অপেক্ষা করা যায়।

চোখে ঘনায় নীলাঞ্জন ছায়া।

নিজেই নিজেকে পড়ছে। না নার্সিসাস নয়। স্ব-প্রেমে মজেনি গ্রীষ্মকালের মত। জল অতলে নিজের মুখের ছায়াতেই নয় মুগ্ধ।

নিজের অনেক কিছুই তার মনের মত নয়। সে ভালোবাসে মাকে-বাবাকে, জ্যেঠু-জ্যেঠুমাকে মনোরমাকে, স্কুলের দু'চারজন বন্ধুদের— হৃদয় মেলে রেখেছে আরো অনেক ভালোবাসার জন্য। আসলে লক্ষ্য করছে অন্তর-বাহির পরিবর্তন। তার বুক, নিতম্বে এসে পড়ছে ঈষৎ বর্তুলতা, আপেক্ষিক ভাবে ক্ষীণ কোমর, মাথা চলছে দীর্ঘতার দিকে। চোখের পল্লবে লেগে মায়া। মনের মধ্যে সুদূর চঞ্চলতা। মিথ্যে বলবে না, মিথ্যাকে ঘৃণা করে বনানী। শুধুই মায়া, সুদূর চঞ্চলতা নয়; অতিবাস্তব এক অস্থিরতা আপনার মধ্যেই নিরীক্ষণ করে। রক্তের বিন্দু বিন্দুতে জন্ম, চঞ্চলতা উঠে আসছে, উঠে আসছে অতল থেকে অঙ্গে অঙ্গে, প্রতি কোষে। কোথায় যেন আছড়ে পড়তে চায়। যেমন করে পদ্মাতীরে আছড়ে পড়ে ঢেউ। তখন বনানী বোঝে শরীরের বাস্তব সত্য। স্বীকার করে মনোরমার উক্তিকে। মেজদির শরীরবোধ, এমনকি ছোড়দির শরীরবোধের চেয়েও কম নয় হয়তো বা। উর্বশীর জন্মকথা, হাতে বিষ হাতে সুধা। যৌবন হতে পারে বিষসিক্ত, সুধায় ভরে যেতেও পারে। যে যেমন চায়, যে যেমন পারে। শুদ্ধিকরণে বিশ্বাসী বনানী তার রক্তজ অনুভবকে নিয়ে যেতে চায়, যেখানে ফুলগন্ধ, ধূপের ধোঁয়া, মস্ত আলপনা। বনানী বিশ্বাস করে প্রেমেই আছে এই শুদ্ধলোক।

এগারো বছরে মনে ধরেছিল মিষ্টি স্বভাবের বিনয়কে। বারোতে মনে হল গোরাই পুরুষ-প্রতীক। গোরার আকর্ষণ ছিল একবছরেরও বেশী। পড়েছে চোখের বালি, নৌকাডুবি, বিহারী, রমেশ, নলিনাক্ষকে ভালো লাগলেও পুরুষ-প্রতীক মনে হয়নি। কেউ অধিকার করতে পারেনি গোরার স্থান। ঘরে-বাইরে হাতে এসে বুকে টান লাগিয়ে দিল অসম্ভব জোয়ার-টানে। শুরু তেরোর আশ্চর্য-পুরুষ নিখিলেশ, এখনো আশ্চর্য চোদ্দতেও। হয়তো রয়ে যাবে পরবর্তী বহুদিন বহুরাত্রি ধরে।

ঘরে-বাইরে নিয়ে এসেছে মনোরমার কাছে। বার বার পড়ে যার বহু অংশই মুখস্থ-প্রায়। আজ পড়বে:

"আমার পথের সঙ্গিনীকে এবার কোনো আইডিয়ার শিকল দিয়ে বাঁধতে চাইব না ; কেবল আমার ভালোবাসার বাঁশি বাজিয়ে বলব, তুমি আমাকে ভালোবাসো। সেই ভালোবাসার আলোতে তুমি যা তার পূর্ণবিকাশ হোক্, আমার ফরমাস একেবারে চাপা পড়ুক,—তোমার মধ্যে বিধাতার যে ইচ্ছা আছে তারই জয় হোক্— আমার ইচ্ছা লজ্জিত হয়ে ফিরে যাক্।"

জমকিয়ে বসেছে বৌদিদি। মধ্যমণি এক অপরিচিতা কিশোরী। নববিবাহিতা। তাকে ঘিরে মেজদি, ছোড়দি আরো অনেকে।

—বল্ না, বল। মুখের এঁটো পান দিয়েছে, বল ?

—ধ্যাৎ।

—ধ্যাৎ কিরে। চুমু খেয়েছে, না খেয়ে ছেড়েছে নাকি ? ক্ষীরভোজন কেউ ছাড়ে ?

—যাঃ।

—যাঃ মানেই হাঁ। চুমু খেয়েছে, খেয়ে বোতাম খুলেছে ব্লাউজের—

নববিবাহিতা লাল হবার আগেই ছোড়দি খিলখিল হেসে উঠল। হাসতে হাসতে লুটোপুটি মাটিতে—চুল এলো, আঁচল গড়াচ্ছে।

—মেজদি, একটা বই এনেছিলাম দেখবে ?

ঘরে অসংগত, অশোভন কিছু ঘটল। সকলের ভুরু উঠল ক্ষেপে মনোরমাও আসর ছাড়তে অনিচ্ছুক।

—একটু বোস এখানে, তারপর দেখব'খন।

—তাহলে আমি যাচ্ছি, বেশীক্ষণ থাকতে পারব না। অনিচ্ছাতেই উঠল মনোরমা। ঘরের বাইরে পা দিয়েই বলল :

—তোর এসব কথা শুনতে ইচ্ছে করে না ?

—একটুও না।

—কিন্তু, সকলেই তো শুনছে, সকলেই কি খারাপ ?

—আমি কিছু বলতে চাইনে খারাপ-ভালো। আমি একটা অন্যমন নিয়ে এসেছিলাম, তোমাকে খুব ভালো কিছু শোনাব বলে।

—বৌদিরটাও এমন কিছু খারাপ নয়। আর মিথ্যেও নয়।

মনোরমার গলা গম্ভীর।

বেণু রক্তাক্ত হচ্ছিল ভিতরে ভিতরে। ঘরে-বাইরের বিশ্ব থেকে এসে পড়ে এই বিশ্বে। রক্ত কান্না হচ্ছিল। রক্ত কান্না মেখে বলে উঠল :

—মেজদি, এ-যে একেবারে পার্সোনাল, নিজস্ব। একে হাটের মাঝখানে টেনে আনলে কোনো শ্রী থাকে তার? এসব কথার কবিতা ছাড়া, সুর ছাড়া কোন মানে আছে নাকি?

প্রেম এবং বিবাহ-বিরোধিতা দুটো পাশাপাশি বনানীর। প্রেমেরই বক্তব্য অনুভবের শুদ্ধিকরণ। বিবাহে অনেক অপমান। মেজদিকে প্রায়ই দেখতে আসে পাত্রপক্ষ। রোদ থাকতেই দেখতে আসে, বেলা গড়িয়ে গেলে রঙ বোঝা যাবে না। মোটা গড়নের মনোরমা এমনিতেই শ্লথ ভঙ্গীর, কুণ্ঠা জড়িয়ে আরো শ্লথতর। পাত্রপক্ষ বেশী প্রশ্ন করে না। বলে যায়, পরে খবর দেব। খবর আসে না।

—রোজ রোজ কেন সকলের সামনে এমন করে বার হও?

—কি করব বল? এই নিয়ম।

—ছাই নিয়ম। বলো তো, কে এই মানুষগুলোকে অধিকার দিয়েছে তোমাকে না বলার?

—বেণু, তুই আমাকে ভালোবাসিস, তাই তোকে এমন বাজছে। একটু চুপ করে থেকে মোটাগড়নের শামলা মেয়েটি বলেছিল : —তুই যখন গান গাস—তোর চেহারা আশ্চর্য বদলে যায়। আমি ভাবি, আমার ভেতরটা ঠিক ওই রকম। তোর গান গাবার সময়ের মত। আমি কি ভাবি জানিস, আমার যে বর হবে সে এই ভেতরটাকে দেখতে পাবে, আমাকে ভালোবাসবে। সে আমার উঁচু কপাল, মোটা গড়ন, শামলা রঙ কিছুই দেখবে না!

বেণুর হাতে যদি থাকত একটি শতদল পদ্ম, কেউ বলত, বিবাহের

সপক্ষে রায়কে রক্তিম করো, বিপক্ষে রঙ্ ধরিয়ো না—শতদলের আশীটি পাপড়িই থাকত শ্বেত, কুড়িটিও পুরো রক্তিম নয়, কিছু রাঙা কিছু সাদা। কিন্তু যদি কেউ প্রেমের সপক্ষে রায়কে রক্তিম করতে বলত: বৈষ্ণব কাব্য পড়া, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র পড়া বনানী পুরো শতদলটিকেই রক্তরাঙা করে তুলত।

বিবাহ-বিরোধিতা, যা কিছু পূর্বসঞ্চিত তার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছিল অবমাননার বোধ। যেন মনোরমা নয়, বার বার বনানীই প্রত্যাখ্যাতা। মেয়ে হিসেবেই বিশ্বসংসারের সব মেয়ের সম্মান-অসম্মানের অংশী এই ভাবনা কোনোমতে খারিজ করা যায় না। বনানী ভাবে: প্রেমে যে পুরুষ বলে:

ত্বমসি মম জীবনং ত্বমসি মম ভূষণং
ত্বমসি মম ভব-জলধি রত্নম্

সেই পুরুষই সংসার সমাজে নারীর মূল্যায়নে কেন হারিয়ে ফেলে তার ভব-সমুদ্রের রত্নটির মূল্যমানকে? কেন দিতে পারে না—নিজস্ব ওজনের একটি সম্মান—প্রেমে যে দেয় আপনারও অধিক।

এখনো পূজা সারছে বনানী, যদিও ভাবছে বন্ধ করে দেবে কি দেবে না? এখনো সম্পূর্ণ প্রত্যয় আসেনি তার—যদিও নিরাকার অভিমুখ নিরন্তর।

মানবজগৎ, প্রাণিজগৎ, তরুলতা-তৃণের শ্যামলজগৎ; আকাশ-ভরা সূর্য-তারা, বাতাস-ভরা বিশ্বপ্রাণ—সব কিছু বিধৃত যে ব্রহ্মে যাঁকে চোখ দেখতে পায় না, বাক্য প্রকাশ করতে পারে না; মনও ফিরে আসে, সেই অশ্রুত; অব্যক্ত অবাঙ্মনসোগোচরম্ শান্তম, শিবম, অদ্বৈতমের আনন্দে আনন্দিত হতে পারা মস্ত পারা—এমন একটা বোধ জন্ম নিচ্ছে তার মধ্যে। কিন্তু, ঠিক পেরে উঠছে না। তার হৃদয়-দোলানো দুটি গানের সঙ্গে,

সীমার মধ্যে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর
তাই তোমার আনন্দ আমার 'পর

অঙ্কিত করতে পারছে না ওই গানটিকে

পাদপ্রান্তে রাখ সেবকে

নিরাকারের পদযুগল এখনো খুঁজে পায়নি বনানী, খুঁজতে গেলেই যেতে হয় সাকারে—তাছাড়াও যিনি সমস্ত জন্ম-মরণে নিস্পৃহ, কিংবা বলা ভালো, যাঁর লীলায় জন্মমৃত্যু একই তালের সোম-ফাঁক, সেই ত্রিভুবনেশ্বরের ক্ষুদ্র, নগণ্য বনানীকে কী-বা প্রয়োজন, কেন প্রয়োজন ?

সন্ধ্যার আগেই ছাদে এসেছিল। আলসেয় হাত রেখে বিষণ্নমন বনানী, মনরে ওরে মন, নিচে তাকাল। স্থির ডোবা পানায় ভরে বিজ্‌বিজ করছে। আপন মনেই উচ্চারণ করল :

—ভরে না বনানী, এইটুকু দিয়ে জীবন ভরে না।

এমন সময় সূর্য অস্তে নামল। দূরদিগন্তরেখার দিকচক্রবালে নারিকেল-সুপারির বনরাজিনীলা। দূর দূর বাড়িগুলোর দিগন্ত-প্রসারিত উঁচু-নিচু ছাদ অস্তরাগের রাঙা ঢেউতে প্লাবিত হল। বিস্তারিত একটি রক্ত-সমুদ্র। উঁচু-নিচু ছাদে ঢেউগুলি উচ্ছ্রিত, স্ফুরিত। এমন কি পানায় ভরা তুচ্ছ ডোবাটা, আগাছার ঢেউ বুকে করা তাদের এই হাড়জিরজিরে বাড়িটা, আলসেয় হাতরাখা নগণ্য বনানী, অকস্মাৎ গোধূলি-লগনে অবিশ্বাস্য রক্তিম। কেন জানে না, চোখে জল এসে গেল তার। মন বললে :

—বিশ্বজোড়া এই রূপ সৃষ্টিই নিরাকারের যুগল চরণ দুটি। আর এই আলসেয় হাত রেখে দাঁড়িয়ে থাকা বিষণ্ন বনানী তাকেই যে বড়ো দরকার সেই ত্রিভুবনেশ্বরের—বনানী নইলে কে বুঝবে তাঁকে ?

শাঁখ বেজে উঠল। কাছে থেকে দূরে, দূর থেকে আরো দূরে, সমুদ্র-গভীর শব্দ। শঙ্খধ্বনির ছিদ্র গলে গলে বাজছে অসীমের সুর। বেজে বেজে এক সময় সমুদ্র-হৃদয় স্তব্ধ, নিঃস্তব্ধ-নিথর হল। বনানী নিচে নেমে এলো।

মায়ালতা দেখলেন, বেশ ভালো করে ঝেড়েমুছে চন্দন ইত্যাদির

দাগ উঠিয়ে মেয়ে লক্ষ্মী, নারায়ণ, সরস্বতীকে আলমারি বন্দী করছে। একদিন তাক থেকে পুতুল পেড়ে ঠাকুর সাজিয়েছিল বেণু, আজ ঠাকুর উঠিয়ে পুতুল রেখে দিচ্ছে বনানী। মায়ালতা অবাক্ :

—কী রে, আর পুজো করবিনে ?

—ভালো লাগছে না মা। সংক্ষিপ্ত জবাব।

মনোরমা শুনে সাদা :

—ঠাকুর আলমারিতে তুলে রাখলি ? ভয়ে বুক কাঁপল না ? পাপ হবে যে বেণু।

—ভয় কীসের ? পাপ বলে কোনো কথা আছে নাকি ? ন্যায়-অন্যায়, সত্য-মিথ্যা-সুন্দর-অসুন্দর আছে।

—বলিস্ কীরে ? পাপ নেই ? পাপের সাজা নেই ?

—আজকাল উপনিষদ পড়ছি। তার অনেক মন্ত্র আমাকে এমন নাড়া দেয়। একটি শুনবে মেজদি ?

—উপনিষদ্। মনোরমা ঢোঁক গিলল : তা বলছিস যখন, শুনি।

আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে
আনন্দেন জাতানি জীবন্তি
আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।

—মানেটা কী হল রে ? এমনিতে সংস্কৃতমন্ত্র শুনতে সুন্দর। কিন্তু, কিচ্ছু বুঝলুম না যে।

—আনন্দেই আমাদের জন্ম, আনন্দেই বাঁচি, আনন্দেই পুনঃ প্রত্যাগমন করি। আমাদের সুখ-দুঃখ, জন্ম-মরণ, বিরহ-মিলন সব আনন্দেই। পাপ বলে আমাদের কিছু নেই।

বেণুর হাসিমুখে রেগে উঠল মনোরমা।

—দেখ বেণু, তুই যখন মানুষের দুঃখ নিয়ে দুঃখ করিস্, মেয়েদের বঞ্চনায় রেগে উঠিস্, গান গেয়ে খুশি আর ইদানীং কবিতা লিখতে লিখতে কবি কবি ভাব, গল্প উপন্যাস পড়ে নায়কা ভঙ্গী, তখনো তোকে বুঝতে পারি। কিন্তু, এই উপনিষদ টুপনিষদ—

—খুব পাকা লাগে না মেজদি।

—ঠিক তাই। কথাটা মনে আসছিল, মুখে আসছিল না।

—সত্যি মেজদি, আমি একটু পাকাই হয়ে যাচ্ছি।

বেণু উচ্চাঙ্গ হাসল।

সকাল থেকেই সানাই বাজছে। বনানীর মনে হয়, সুরটা যেমন মিষ্টি, তেমনি করুণ, কোথায় যেন একটা ব্যথা লেগে আছে। যেন পাওয়ার সঙ্গেই কিছু হারানো। হে বিরহী, এমন মিলন কোথায় পাবে তুমি যেখানে কোনো বিচ্ছেদ নেই।

পনের দিনের মধ্যেই বিয়ে, ভাবা যায় না। জ্যাঠামশায় পদ্ধতি পাল্টাতেই সহজ হয়ে গেল। ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়র নয়, পশারওলা প্র্যাক্‌টিশনারের ল'পাস পুত্র নয়, বড়দির মত গাড়ি-বাড়ি নেই, ছেলে মার্চেন্ট আপিসের কেরানী, তবে প্রমিসিং। ভাড়া বাড়ি। পাত্রের বাবা বলেছিলেন : মেয়ে আমাদের পছন্দ। কিন্তু, রঙটা কালোরদিকে। ইঙ্গিত বুঝেছিলেন জ্যাঠামশাই। বলেছিলেন বিয়ের সময় রঙ দেখতে পাবেন না। ভয় ছিল সুদর্শন গ্রাজুয়েট পাত্র মেয়ে দেখে যদি পছন্দ না করে। মেজদি বলেছিল খুশি খুশি :—জানিস্, ও কী বলেছে?

মজা লেগেছিল। বিয়ে না হ'তেই মেজদি "ও" বলা শুরু করেছে। বড়দি বলেন "নিজে', ইংরেজী করে বললে কথাটা প্রায় কবিতা—my ourself, হেসেছিল :

—শুনি, কী বলেছে তোমার ও।

—বলেছে, এখন দেখব না, শুভদৃষ্টিতেই প্রথম দেখব।

মনোরমার চোখের পাতা থরো থরো :

—জানিস্ বেণু। আমার বুক কাঁপছে। শুভদৃষ্টিতে ও কী দেখবে কে জানে? আমার এই মুখ না ভেতরকার?

সানাইয়ের সুর ছড়িয়ে পড়ছে—যেমন মিষ্টি, তেমনি করুণ কোথায় যেন একটা ব্যথা বিঁধে আছে।

জ্যাঠামশায়, জ্যাঠাইমা উপবাস করে আছেন, মেজদিও। ঘরের

মনোরমার বিবাহেই প্রথম বিবাহ রীতিনীতি প্রত্যক্ষ করল। এর আগে দেখেছে বহিরঙ্গ, খুশির রূপ: আলো, সানাই, গান, কবিতা, ভূরিভোজ, সবচেয়ে বেশী চন্দন সাজানো বরকনে। অন্তরঙ্গ রূপে বিরোধী চিন্তারা সঙ্ঘাতমুখর। কোনটা সত্য, আমার হৃদয় তোমার হোক, তোমার হৃদয় আমার—না, পাঁচ হাজার নগদ, সত্তর ভরি সোনা, বরকনের যৌতুক, আলমারি-পালঙ্ক-ড্রেসিং টেবল, মোটর-বাইক? কোনটা সত্য—আলো, সানাই, বেলফুলমালা, কবিতা, বাসরের গান—না শ্বশুরের ভীরু হাত জামাইয়ের উরুতে। বনানী বিচলিত। এমন বিবাহবিধি কি হতে পারে না যাতে আলো, ফুল, সানাই, কবিতা, গান আছে—নগদ দান-যৌতুক, অলঙ্কার নেই। পুত্রস্থানীয়ের চরণ ধরবার হীনমন্যতা নেই।

বনানী হে, তোমাকে সবচেয়ে বিদ্ধ করছে, কেন কন্যা সম্প্রদান? কন্যা কি কোনো বস্তু? ব্যক্তিগতভাবে কারুর সম্পত্তি ছিল এবং কারুর হয়ে যাচ্ছে? সে কি সত্যই পিতার অধিকারের এবং পরবর্তীকালের স্বামীর। সেই মেয়েটির কি পুরুষের মতই নিজের সঙ্গে, আত্মীয়-পরিজনের সঙ্গে, স্বদেশে এবং অন্য দেশের সঙ্গে নিজস্ব সম্পর্ক নেই? হায় বনানী, নারীজীবন এমনি অস্তিত্বহীন, ভিত্তিহীনতার ওপর দাঁড়িয়ে?

বনানীর বিচলিতভাবে মায়ালতা ভাবলেন মেয়ে সখি-বিচ্ছেদে কাতরা!

ক্রমেই এসে পড়ছে অন্তর্লোক। বাইরের পৃথিবী সরে যাচ্ছে দূরে। মনোরমা চলে গেলে, ও-বাড়ি যাওয়া বন্ধ—স্কুল ছিল, স্কুলও বন্ধ হল। একদিন স্কুল থেকে ফিরল জ্বর নিয়ে। সেই জ্বর বেড়ে ব্রঙ্কো-নিমোনিয়া। সারবার পরও ৯৯°এর ধাক্কা যায় না। ডাক্তার অভিমত: বুকের অবস্থা ভালো নয়। স্কুল বন্ধ, গান বন্ধ।

মায়ালতা কেঁদে ফেললেন:

—আমার মন্দ কপালে আর কত হবে? ভেবেছিলাম মেয়েটা কলেজে পড়বে, গান শিখবে।

প্রতুলচন্দ্র খুশি। মিছিমিছি সাতটা-পাঁচটা সময় নষ্ট হচ্ছিল। এখন সবটাই লেখার কাজে লাগবে।

আরো লাইব্রেরী, আরো বই, আরো মাসিকপত্র, আরো লেখা। বনানীর বুদ্ধির গভীরে রয়ে গেল এই কথাটা। তার পারিপার্শ্বিক তাকে ক্লান্ত করে, আর ক্লান্ত সে চলে যায় সেই দীঘিতে।

"যদি সিনান করিতে চাও, এসো তবে ঝাঁপ দাও"

ঝাঁপ দেবার দীঘি তার একটিই। বইয়ের জগৎ। যেখানে চিন্তা, মনন, আনন্দ। সেই তার স্নানের জগৎ।

বনানী পড়ছিল। তার চারপাশে ছড়ানো প্রবাসী, ভারতবর্ষ, মডার্ন রিভিউ। পাশেই রাখা যোগেশ বাগলের মুক্তির সন্ধানে ভারত, সুরেন্দ্র ব্যানার্জীর নেশনের জন্মকথা, দেশের কথা সখারাম গণেশ দেউস্করের। ঝুঁকে পড়েছে গান্ধীজীর আত্মজীবনীর ওপর। বনানীর এইটেই পড়বার রীতি। কোন একটি বইকে কেন্দ্র করে ছড়িয়ে নেয় সেই জাতীয় আরো কিছু বই।

স্বাধীনতা, আসছেই। আসবে। তার জীবনেই আসছে স্বাধীনতা। স্বাধীন ভারতবর্ষ। আচ্ছা, স্বাধীনতা কী বস্তু ?

স্বাধীনতা, তুমি কি ক্ষুধার্তের মুখের অন্ন
লজ্জিত নগ্নের লজ্জাহরণ বস্ত্র
অপমানিতের উঁচুমাথা
স্বাধীনতা, তুমি কি বেণুর পায়ের বন্ধন-মোচন ?

স্বাধীনতা মনে হলেই একটা পুলক শিরশির করে বয়ে ওর দেহমনকে কাঁপায়। মনকে ডানা মেলবার আকাশ দেয় স্বাধীনতা। ডানা মেলতে গিয়েই ডানা গুটিয়ে যায়। তার আশপাশের বাড়িতে কোনো আন্দোলন নেই। মেয়েদের সেই রাঁধা-খাওয়া-রাঁধা, পুরুষদের একটু রকমফের—বাজার-ইস্কুল-আপিস-বাড়ি। প্রাত্যহিকতার জালে জড়ানো নিস্তরঙ্গ জীবন। কিন্তু, এই বইগুলি তাকে অন্য খবর দেয়। বলে বেণু, এই ছোট্ট জীবনটার বাইরেই ঘটে চলেছে অনেক ঘটনা। বইয়ের জগতে এসে পড়লেই বনানীর কালাকাল

ধারণার গোলমাল হয়ে যায়। অতীত এসে মেশে বর্তমানে, বর্তমান চলে যায় অতীতে, আর অতীত ও বর্তমানে মেশামেশি হয়ে একটা কাল হঠাৎ অচেনা, অজানা হয়ে যায়—হয়ে ভবিষ্যতের হাতছানিতে ডাকে।

পাশাপাশি দুটি রেখা বয়ে চলেছে সমান্তরাল, বনানী ভাবে, কোন্‌টি হবে জয়ী? এক বিশ্বাস হিংসায়। মরতে নির্ভীক, মারতেও অকুণ্ঠিত। হিংসা সেখানে ন্যায়তন্ত্রে। আমেরিকার স্বাধীনতা আন্দোলন, ফরাসী বিপ্লব, রুশ-বিপ্লব। সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার জন্য হনন, দেশজোড়া তিমির হননের জন্যই। আর একটি নির্মলনীল, কোথাও রক্ত মাখেনি। বড়ো সুন্দর: মরবার অধিকার আছে তোমার, নেই মারবার। স্বাধীনতা আমাদের সত্য-অধিকার, সে অধিকারেও আমরা অহিংসাকে অতিক্রম করব না। বনানীর মনে হয় সত্য অপেক্ষাও গান্ধীজীর বেশী দাবী অহিংসা। পড়ছিল:

—"এই পর্যন্ত বলা যথেষ্ট মনে করি যে, আমার জীবনের উপর গভীর ছাপ আধুনিক জগতের তিন ব্যক্তি অঙ্কিত করেছেন; রায়চাঁদ ভাই তাঁর জীবন্ত সংসর্গ দিয়ে, টলষ্টয় তাঁর বৈকুণ্ঠ তোমার হৃদয়ে ( Kingdom of God is within you ) গ্রন্থ দিয়ে এবং রাস্কিন তাঁর "আন্‌টু দিস্ লাস্ট" রচনা দিয়ে।"

—"বাবা, লাইব্রেরীতে টলস্টয়ের কিংডম অব গড ইজ্ উইদিন ইউ পাওয়া যাবে না, কিংবা রাস্কিনের "আনটু দিস লাস্ট"?

এর আগে খদ্দর শাড়ী-ব্লাউজ-সায়ার আর্জি পেশ করেছিল, খাদি ছাড়া অন্য কিছু পরবে না। বনানী সহজ বস্তুগুলি পেল, পেল শাড়ী-সায়া-ব্লাউজ—কঠিন বই দু'খানা পেল না। লাইব্রেরীতে পাওয়া গেল।

—আচ্ছা মা, বুদ্ধ বলেছিলেন: বৈরীতা নয়, সেবা, প্রেম, অহিংসা।' খ্রীষ্ট বললেন "পরস্পরকে ভালোবাসা"। গান্ধীজী কি এঁদের কাছাকাছি?

—তা বলতে পারো। মায়ালতা বললেন। তোমার মন কী বলে?

—আমার মনে হয় মিলে-অমিলে। ওঁরা দেশের হয়েও দেশকে পার হয়ে গেলেন। গান্ধীজী চলে গেছেন দেশের বুকের ভেতরে। স্বদেশ, স্বরাজই মূল লক্ষ্য।

বনানীর মনে হয় জীবন বড়ো জটিল। থিয়োরীতে যা স্বচ্ছ, প্র্যাকটিকালে তাই দ্বন্দ্বময়। "অহিংসা পরমধর্ম" এবং "পরস্পরকে ভালোবাসো" দুই তত্ত্বের বাহকেরাও হিংসার হাত থেকে রক্ষা পাননি। ক্রুশেডের লড়াই, বৌদ্ধ হিন্দুর লড়াই, বৈষ্ণব-শাক্তর লড়াই হিংসার রক্ত মেখেই হয়েছে। জীসাসের প্রেম, বুদ্ধের প্রজ্ঞাঘন করুণা, গান্ধীজীর শিশু-সারল্য তাকে নম্র করে নমিতা। কিন্তু, এও তো অস্বীকার করা যায় না বিপ্লবী আন্দোলনগুলির আকর্ষণও কম নয়। "একবার বিদায় দে মা, ঘুরে আসি" সেই গান, ক্ষুদিরাম ভগৎ সিং, দীনেশ গুপ্তর ফাঁসি, মাষ্টারদা সূর্যসেন, বাঘা যতীনের বীরত্ব, বিনয়-বাদল-প্রীতিলতার আত্মত্যাগ, বীণা দাশ-শান্তি-সুনীতির নির্ভীকতা, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, আর সেই ইতিহাস-সাক্ষ্য-ভাষণ, শ্রীঅরবিন্দের মামলা চালনায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের উক্তি

"He stands not only before the bar of this court, but stands before the bar of High-court of History, Long after this controversy hushed in silence, long after this turmoil, this agitation ceases, long after he is dead and gone, he will be looked upon as a poet of patriotism as the prophet of nationalism, and the lover of humanity' সমস্তই তার বুকে তোলে উত্তাল ঢেউ। ফুলে ফেঁপে ওঠে সমুদ্র হৃদয়।

বিভ্রান্ত হয়। কোন্‌টা সত্য? দুটি ধারাই তাকে টানে। মনে হয়, একটি যদি হয় ঈশ্বরের শান্তি, অন্যটি তবে ঈশ্বরের ক্রোধ। দুয়েরি প্রয়োজন আছে। আরো ভাবে—একজাতীয় সত্য আছে, যার বিপরীতও সত্য তবে কি কোনো একদিন দুটি রেখা মিলিত হয়ে একটি আশ্চর্য কোণের সৃজন করবে?

মায়ালতা আক্ষেপ করলেন :

—ডাক্তার স্কুল বন্ধ করল আর তোরা বাবা-মেয়েতে মিলে যে-ভাবে লাইব্রেরীর প্রেমে পড়ছিস, কিছুতেই পাস করতে পারবি নে।

—না করলে ক্ষতি কি, মা ?

—বলিস্ কি ? ক্ষতি নেই ? ডিগ্রী না নিলে হয় ? যে-সময়ের যা। ডিগ্রী খুব দামী বেণু। বিশেষ করে আমাদের মত মধ্যবিত্ত পরিবারে।

মায়ের মনোভাব বুঝেও বাবার ইচ্ছাতেই যুক্ত হয়ে যায়। ডিগ্রীর প্রতি ওর একজাতীয় অনীহা। মায়ালতা মরিয়া :

—এইবারেই প্রাইভেটে ম্যাট্রিক দিয়ে নে, দেখতে দেখতে চারটে বছর কেটে যাবে।

—দেখি।

—পরীক্ষা তোর কী কাজে লাগবে শুনি ? তার চেয়ে মোপাসাঁর সর্ট স্টোরি শুরু কর। গল্পগুচ্ছ তো অনেকবার পড়লি। গল্প লেখ বেণু। বাবা বললেন মেয়েকে। এই সময় প্রথম গল্প লিখল বেণু। তার ডায়ারীতে লেখা :

ভাবতেই পারিনি, মগনমাসিমাই হয়ে উঠবেন আমার প্রথম গল্পের নায়িকা। চোখ মেলে ভালো করে দেখিইনি। সেই যে কড়া নেড়ে দরজায় ধাক্কা দিয়ে প্রবেশ আসবার দ্বিতীয় দিনেই। সেই থেকেই নিত্য আসা-যাওয়া। মগনমাসিমা আসতেন দু'বার। সকালে ঝক্‌ঝকে মাজা ঘটিতে দুধ নিয়ে। দুপুরে নিয়ে যেতেন ছোট্ট বালতিতে রাখা ভাতের ফ্যান, কুটনোর খোসা, আটার ভুষি। গোরু খাবে। বসতেন না, দাঁড়িয়েই দুঃখ করতেন।

—ছেলেটা মানুষ হল না ভাই, কায়েতের পো, মুখ্যু হয়ে রইল। তাই কাজ শিখতে চায়ের দোকানে দিনু। নিজে দুধের ব্যবসা করি।

কোনদিন বলতেন :

—পরের কাছে চাকরগিরি করতে দিইনি ভাই, শ্বশুরঘরের মুখ

হাসাইনি, শাউড়ীর ভায়ের দোকানে দিয়েছি। তা মিনসে যেমন পাজী, মাগী তেমনি নচ্ছার। নাকে দড়ি দিয়ে খাটায় ঘরে-বাইরে। মাগ-ভাতারে এমন কঞ্জুষ, পয়সা দিতে চায় না।

মাস ছয়-সাত পর হঠাৎ চীৎকার শোনা গেল। রাত এগারোটা হবে। ঘুমিয়েছিল, ঘুম ভেঙে গেল।

—ও গুখেগোর ব্যাটা, ওরে-ও হারামজাদা মরতে গিলে এলি কেন? আমি মা-মাগী, বুড়ি, খেটে মরছি ভূতের মত, আর তুই পয়সা উড়োচ্ছিস।

জড়িত কণ্ঠের জবাব শোনা গেল:

—বেশ করেছি, খেয়েছি। কারুর বাপের পয়সায় খাইনি, ভাতারেরও নয়—নিজের রোজগার।

আমি সে-রাতে ভেবেছিলাম, কোনখানে এলাম আমি, কোন জঙ্গলে? সে রাতে আমি ঘৃণা করেছিলাম মগনমাসিমার আঠারো বছরের ছেলেটাকে, মগনমাসিমাকে। অভ্যস্ত হয়ে গেছি প্রায়, মাঝে মাঝের বাদ-প্রতিবাদ বিরক্তি ছাড়া যখন আর কোনো মনোভাবের উদ্রেক করায় না, তখনি ঘটনাটা ঘটল। মগনমাসিমার ছেলে বন্ধুর বিয়েতে বরযাত্রী গিয়েছিল সুন্দরবনের কাছাকাছি দক্ষিণের গ্রামে—আর ফিরল না। সেখানেই কলেরা, আনা গেল না। মগনমাসিমা আছাড় খেয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। কোনো শব্দ শোনা গেল না। কোনো কান্না নয়।

তারপর কান্না উঠল। কান্না উঠত প্রতিরাতে। সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বেলে কেঁদে উঠত মগনমাসিমা:

—কোথায় গেলি বাবা-তুই, ফটিক, ফটিকরে, ও আমার নাড়ী-কাটাধন, আমার সাতরাজার ধন এক মানিক। আমার শিবরাত্রের সলতে।

আমি অবাক্। মগনমাসিমার অভ্যন্তরে এ কোন অচেনা ছিল লুকিয়ে? এই অচেনাকে কে আনল বাহির করে। কোন পরম রহস্য? আমি কলম ধরলাম। গল্পটার নাম দিলাম—শোক।

সমাপনে লিখেছিলাম :

সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বেলে মগন তার ময়লা কাপড়ের আঁচল গলায় জড়িয়ে তুলসীতলায় প্রণাম করল। করে কাঁদতে বসল দাওয়ায় :

—কোথায় গেলি বাবা তুই, ফটিক, ফটিকরে। ও আমার নাড়ী-কাটা-ধন। সাতরাজার ধন এক মানিক। আমার শিবরাত্রের সলতে।

মগনের বুক থেকে কান্না যেই নামল মাটিতে, অমনি সমস্ত পৃথিবী উৎকর্ণ হল। সে কান্না যেই শুনল, সেই স্তব্ধ হল। অন্তত: সেই মুহূর্তটুকুর মত। তার অভ্যন্তরে এত বেদনা, এত সৌন্দর্য কোথায় লুকোনো ছিল? কে সে বাহির করে আনল এই সুন্দরকে? সে কি তবে শোক? তবে কি মানুষ দূরে চলে গিয়েই রেখে যায় তার গভীরতম পরিচয়? মৃত মাত্রেই পবিত্র।

স্ব-পরিবেশ ক্লান্তিকর। ক্লান্তিকর হলেও বুঝতে চেষ্টা করে বনানী, আগের মত বিরক্তি জাগে না তার। সম্প্রতি খোঁজ পরিষদের আর বিনয় সরকারের বই পড়া বনানী প্রোলেতারিয়েত শব্দটির সন্ধান পেয়েছে। বোঝে এ-পাড়া প্রোলেতারিয়েত পাড়া নয়। প্রায় সকলেরি গ্রামগঞ্জে দু'চার বিঘে জমি আছে আধি দেওয়া বা জন খাটানো। যেহেতু জমি আছে আধিদেওয়া বা জন খাটানো, রক্তের মধ্যেই আছে জমিদারী ইচ্ছেটা। হালচালে মধ্যবিত্তের অনুকরণ। আয়ের দিক থেকে নিম্ন মধ্যবিত্ত, শিক্ষায় স্কুল গণ্ডীটুকু পেরুনো এবং বেশীর ভাগই অফিস ক্লার্ক। হাওড়া জুটমিল, ম্যাকিনন ম্যাকেঞ্জি, বার্ন কোম্পানী কর্মস্থল। মেয়েদের স্কুলে পড়বার সৌভাগ্য হয়নি। ম্যাট্রিকুলেশন, ইণ্টারমীডিয়েট, বি, এ, জানেন না। বলেন একটা পাস, দুটো পাস, তিনটে পাস। কলকাতাকে বলেন ওপার। কারুর কোনো কাজের লোক নেই। বারো থেকে বাহান্ন সংসারের চাকাটার তলে। ডোবাটার পানা সরিয়ে বাসন মাজেন সকলেই, সোডা-সাবানে সেদ্ধ কাপড়-চোপড় কাচার ঠ্যাঙাস ঠ্যাঙাস শব্দ ওঠে

দুপুরে। ডুস্ করে ডুব লাগিয়েও নেন। অল্পবয়সী মেয়ে বউরা এই সবুজ সবুজ জলেই খড়ি ওঠা সাবানে মুখ মেজে ঘরের আঙিনায় যত্নে টিপ আঁকে কপালে। অতি সৌখীন কেউ কেউ দুপুরে দু'একটা জোলো উপন্যাস পড়তে চেষ্টা করে, যার শেষ সর্বদাই মিলনাত্মক। বেশীর ভাগ বধূই দূর অথবা নিকট ভবিষ্যৎ পিতৃগৃহে যাবে সেই আকাঙ্ক্ষায় উন্মুখ। এই তার পরিবেশ, পরিপার্শ্ব। এমন সময়েই কয়েকটি গল্প ছাপা হতে হতে একটি এলো ফেরত। এবার বাবার আক্ষেপ :

—কী লিখছিস সব বাজে বাজে ছোট গল্প। ভিকিব্যোমের গ্র্যাণ্ড হোটেলের মত উপন্যাস লিখতে পারছিস্ নে। তিনিও তো মেয়েই।

বাবার আক্ষেপে ধিক্কার। ছাদে দাঁড়িয়ে আলসেয় হাত রেখে তাকিয়ে ডোবাটার দিকে, মনে মনে বলেছিল :

—আমি ওই ডোবাটার মতই বদ্ধ, আমাকে দিয়ে অন্য কিছুই হবে না, কিছুই না।

চতুর্দশী বনানীকে প্রতুলচন্দ্র প্রেজেণ্ট করলেন গ্র্যাণ্ড হোটেল। জার্মান ভাষা থেকে ইংরেজীতে রূপান্তরিত। বনানীর মনে ধরেছিল দরজার বর্ণনাটা। যে দরজা দিয়ে মেয়েটি ঢুকেছিল আর বার হয়ে এলো সেই দরজা পার হয়ে, সে আর এলো না—যেন অন্য এক কেউ—অনেক অভিজ্ঞতায়, অনেক পরিবর্তিত। তখনো সে জানেনি, লেখিকা বই লেখার আগে হোটেলের পরিচারিকা-বৃত্তি নিয়েছিলেন স্ব-দায়েই।

কেটে গেল চোদ্দশ' একষট্টি দিন, চোদ্দশ' একষট্টি রাত। কী পেয়েছি, কী পাইনি, কী পেয়েছি, কী পাইনি। পায়নি দিগন্ত-বিস্তার প্রকৃতি, ছাদের খণ্ডতার খণ্ডিত, পায়নি সূর্য-তারা-চাঁদের সম্মেলনে পদ্মা, তার বদলে পেলো সুষনি, কলমী ঘেরা ডোবাকে। একমাত্র লাইব্রেরী তার জগৎ ধীরে উন্মুক্ত করছিল। যদিও জানে গ্রন্থজগতের মাত্র পাদপীঠতলেই এসে দাঁড়িয়েছে, সভাঘরে প্রবেশ করেনি। গানের জগৎ দুয়ার অল্প খুলেই বন্ধ করে দিল ফের।

অন্বিষ্ট হীরক-আলোর দেখা পায়নি। শেষ বছর দুটো এই ছিল সর্বাধিক অন্বেষণ। পরোক্ষ জেনেছিল: রামমোহন, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজীকে—গ্রন্থজগৎ থেকে উঠে আসছিলেন তাঁরা। প্রত্যক্ষ ব্যক্তিত্বে তুচ্ছতার ঊর্ধ্বে দাঁড়ানো এমন কাউকে দেখতে পেল না বনানী।

তাই বলেই অকৃতজ্ঞ হবে না। পাবার হিসেবও আছে। মেজদি, জ্যাঠাইমা, জ্যেঠু, মগনমাসিমা। কঠিন শুক্তির দুই ডানা—একডানায় জড়িয়ে অসংখ্য স্খলন, পতন, দুঃখ, হতাশা, অসুখ, ছোটখাট সব মিথ্যা। অন্যডানায় জড়িয়ে ক্ষমা, প্রেম, ভালোবাসা, উত্থান চেষ্টা আর একবুক জল কান্না: টলোমলো টলোমলো হ'তে হ'তে দানায় দানা বেঁধে টলটলে একটি মুক্তো।

চারবছর আগে এই দিনটিতেই শেয়ালদহ, স্টেশনে ট্রেন ঢুকেছিল।

# বন্ধুরা, প্রথম মুগ্ধতা, মোহভঙ্গ

—মেজমামা, তুমি ?

দরজা খুলেই বেণু উল্লসিত।

—সেই যে দেড় বছর আগে দিদিমা-দাদামশায়কে দেওঘর রেখে এলে, তারপর আর দেখাই নেই।

—এবারো সেই দেওঘর। তবে এরপর ঘন ঘন দেখবি।

সেদিনের সকালটা অন্যদিন থেকে ব্যতিক্রম। সেজমামা এসেই ঘড়ির কাঁটাটাকে থামিয়ে দিল। বাবা বললেন :

—আজ তোমার অনারে কোর্ট কামাই করব। কান্তবাবু, তোমার প্রোগ্রাম কি ?

—কাল দশটার গাড়িতে দেওঘর যাত্রা।

অনেক বদল হয়েছে মামাবাড়িতে। দাদামশায়-দিদিমা হাওয়া-বদল করতে গেলেন দেওঘরে। এত ভালো লেগে গেল, জমি কিনে বাড়ি শুরু। সেজমামা রাজশাহী কলেজ হসটেলে ছিলেন। বি, এ, পরীক্ষা দিয়ে দেওঘর যাচ্ছেন। রাজশাহীর বাড়িতে ভাড়া বসাবার খবরে বেণু মর্মাহত হয়েছিল। আর দেখা যাবে না পদ্মা, প্রমত্তাকে।

কিশোরকান্ত ফিরল জুনের শেষে। কদিন তাদের কাছেই থেকে ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হওয়া, এম, এ,—ল' হসটেল, তদারকি প্রতুলচন্দ্রের, তিনিই লোকাল-গার্জেন। প্রতি শনির রাতে আসেন সেজমামা, রবির রাতে ফিরে যান, কখনো সোমের সকালে। এই সময়টুকু পরিবেশকে হালকা, ঝরঝরে করে রাখেন।

সেপ্টেম্বরের শনির রাতে কিশোরকান্ত বলল :

—মেজদি, জোর তলব, তোমাদের দেওঘর যেতে হবে।

মায়ালতা বললেন : আমিও পেয়েছি চিঠি—নতুন গৃহপ্রবেশে যেতেই হবে। তোর জামাইবাবুকে বল।

অনেকদিন পরে ফেলে আসা ছোটবেলার সঙ্গিনীকে মনে পড়ল। টেঁপী। ধারোয়া নদী, নন্দন পাহাড়, লালরাস্তা, কী বড় বড় সব গাছ, কী সুন্দর, তোকে কী বলব রে ভাই।

ট্রেন ছাড়ল। বাকল্যাণ্ড ব্রীজের তলদেশ দিয়ে লিলুয়া, বেলুড় বালি, উত্তরপাড়া। শহর আর না-শহরের মাঝামাঝি। চন্দননগর ছাড়িয়ে পল্লীবাংলা। ধানক্ষেত, ক্ষেতের মাঝে মাঝে সাদা কাল, আমগাছ, নিমগাছ, জটাজূটধারী বট, মহাস্থূল অশথ, সারি সারি কলাগাছ, বাঁশঝাড়। প্রকীর্ণ হরিৎ। হঠাৎ উড়ন্ত বকের ঝাঁক, ও-মা, কী সুন্দর একলা বসে থাকা মাছরাঙা একটা টেলিফোন তারে। হুগলী শেষ হয়ে আসছে। শক্তিগড়ে বাবা কিনলেন সের তিনেক ল্যাংচা, বর্ধমানে চাঙাড়ি ভরে সীতাভোগ, মিহিদানা।

অন্ধকার হয়ে এলো অকস্মাৎ। দুপুরেই বিকেল নামল, না মেঘ করে এলো। মেঘ নয়, পার হচ্ছে ঘনজঙ্গল। নাম-না-জানা সব বিরাট-বিপুল গাছের অঙ্গাঙ্গী সম্মেলনে সমাচ্ছন্ন। যেন একটিও একটির থেকে পৃথক নয়, এক থেকে আরেক উদ্ভূত হতে হতে দিগন্ত সীমা পর্যন্ত ব্যাপ্ত। অজানা গাছ, অদেখা পাতার আকার, অচেনা ফুল-ফল, অপরিচিত গন্ধ। সঙ্গে মিশ্রিত অদ্ভুত এক স্তব্ধ-ভঙ্গী।

বাবা বললেন : বেণু, ডাকাতে জঙ্গল এর নাম। অনেকের ধারণা, বঙ্কিমবাবু দেবী চৌধুরাণীর ডাকাতি এই জঙ্গলকে স্মরণে রেখেই ঘটিয়েছিলেন।

মায়ালতা ফিস্‌ফিস্ করলেন :

—গাছগুলো ঠিক চিনতে পারছি নে।

—শাল-সেগুন, মহুয়া, বাবলা আর মাঝে মাঝে পলাশ।

বেণু নিথর-নিরুত্তর। এমন কিছু সে এর আগে দেখেনি। শিরোল জঙ্গলের প্রান্তেই গিয়েছিল, অভ্যন্তরে নয়। অস্ফুটে কিছু বলতেও তার ইচ্ছা করছে না—ভালো লাগে না, সম্বোধন, কিংবা মা-

বাবার স্বল্প আলাপ। তার মনে হয়, অল্প একটু শব্দেই সুর কেটে যাবে এই গম্ভীর-নৈঃশব্দের। শুধু মনে মনে বলে: হে অরণ্য, হে মহা-অরণ্য, হে ধ্যান-গম্ভীর।

গভীর-গম্ভীর বনানীর বুক ছুঁয়েছে।

জঙ্গল শেষ হল। আবার দেখা দিল আলো। ঝলমল করছে রোদ্দুর। ক্রমে বাঙলার চেহারা প্রকীর্ণ হরিৎ থেকে রক্তিম। আসানসোল, রাণীগঞ্জ, অণ্ডাল।

—বেণু, কারমাটার। বললেন সেজমামা। মুখ বার করল বেণু। জীবনের শেষদিকের অনেকগুলো দিন কাটিয়েছিলেন বিদ্যাসাগর মশায়। চোখ বুজেই প্রণাম করল মনে মনে। দু'একটা টুকরো পাহাড় দেখা দিল। পাহাড় এর আগে দেখেনি, তাই সুন্দর লাগল। বাঙলা ছেড়ে বিহার। নীল দিগন্ত, উঁচুনিচু ঢেউ খেলানো রক্তিম প্রান্তর, রাঙাপথ, মাঝে মাঝে দীর্ঘ সব গাছের ঋজু সৌন্দর্য, শালবন, ঝাউমর্মর আর পলাশের রাঙা কচিৎ কোনো বালুভরা ক্ষীণ তোয়া গৈরিক নদী নেচে চলেছে বর্ষাশেষের তিরতিরে জলধারার সঞ্চয়ে। বেণু নাম দেয় সঞ্চয়িনী। থেকে থেকে মাঠের মধ্যে এক একটা একলা বাড়ি, মস্ত ইঁদারা, ছড়ানো জমি। আঃ কী আনন্দ।

যশিডি স্টেশন। যাই যাই বিকেল। আলো নিভে যাবার আগের উজ্জ্বলতা। শরৎ আমেজে একটু শীতশীত বাঙলা অপেক্ষা কিন্তু, আদ্র' নয়, বেশ টানটান। স্টেশনে নেমে আবার ট্রেন। ফেরী নৌকার মত ফের যশিডি আর বৈদ্যনাথধামের মাঝখানে। পশ্চিম দিগন্তের দিকে তাকাতেই রোমাঞ্চ। সূর্য অস্তে নামছে ডিগরিয়া পাহাড়-চূড়ায়। লাল হয়ে গেছে নীল চূড়াগুলো। নীলাভ সবুজে রক্তরঙ। দেওঘরে যখন নামল তখন গাঢ় গোধূলি। মাটি রাঙা, স্টেশন রাঙা, রাঙা পথটাও রাঙা। রাঙা হল বসন-ভূষণ। পুলক বইল দেহমনে।

বনানী যেন প্রেমে পড়ল।

যা দেখছে সুন্দর। সুন্দর ছোট্ট স্টেশনটি। সুন্দর রাঙাপথগুলো। পথপ্রান্তের দুধারে গাছের সারি, বকাইন ইউকালিপটাস, পলাশ।

সাজানো ঝাউয়ের ঢেউ। সুন্দর নন্দনপাহাড়, ধারোয়া নদী। সুন্দর বাড়িগুলি, আরো সুন্দর নাম :—মাতৃনিবাস, পিতৃধাম, আশীষ, ছুটি, অবকাশ। সবচেয়ে ভালো দাদামশায়ের বাগানটি। মরশুমী ফুলের বেড, গোলাপের কেয়ারী, বেলাবীথি, জুঁই কুঞ্জ, কামিনী গোল করে ছাঁটা। গেটে লতানো চামেলী, মাধবী, মালতী। পাঁচিলের ধারে সার বেঁধে ইউকালিপটাস, কোনো কোনোটা সবেই ঈষৎ খোলস ছাড়ছে—দারুচিনি রঙমধ্যে হস্তীদন্তসম শ্বেত। সাদা যে নিবিড় দৃঢ় হ'তে পারে এমন, ভাবাই যায় না। বাড়িটার ভৌগোলিক সীমা বনানীর মুখস্থ হয়ে গেল। উত্তরে নন্দনপাহাড়, পূবে উইলিয়াম্স টাউন, কাছারী বাড়ি, দক্ষিণে "রাধাকুঞ্জ" "কাঞ্চনজঙ্ঘা" নামের বাড়ি এবং রেললাইন, পশ্চিমে ডিগরিয়া।

বেণুদের আগেই এসেছে সকলে। গমগম্ করছে বাড়ি। প্রতিটি মানুষকে বনানী নতুন চোখে দেখল, দেখতে চাইল। অনেকদিন শুধু বাবা-মা, জ্যেঠু-জ্যাঠাইমা আর বইয়ের জগতে থেকে কোথায় যেন একটা মস্ত ফাঁকা ভাব। উৎসাহী হল বনানী। শুধু সেই নয়, তাকে দেখেও অবাক সকলে। ওমা—সেই মেয়ে—এই। কোথায় গেল সেই ভয় খাওয়া থরথর ঠোঁটের, ছলছলে চোখের মেয়েটা। সতেজ কিশোরী, পরিচ্ছন্ন যদিও কি লেগে আছে আলো-ছায়ার খেলা। এতদিনের ধারণাকৃত মতটাই গেল বদলে। শুধু ভালো নয়, অতি ভালো। নিজেকে অদ্বিতীয়া জানাবার লোভটাও হয়তো বা ছিল গোপনে, সঙ্গে এনেছিল ছাপানো পত্রিকাগুলি। কবিতা, গল্প পড়ে মুগ্ধ সকলে। এমন যে বড় মামিমা, সেই বিভাবতী বললেন :
—আমার এত আনন্দ হচ্ছে, তুই আমাদের ভাগনী। এমন মেয়ে যে লাখে একটাও মেলে না।

সব সময় নতুন কিছু করার ঝোঁক মণিমাসির। বললেন :
—এই বাড়িটার ভেতরে যাব। বেশ সুন্দর নাম "শ্রীনগর"। কাশ্মীর বানিয়ে রেখেছে।

—চেনা নেই, জানা নেই। বিভাবতীর আপত্তি।

—দূর বৌদি, এখানে সবাই চেঞ্জার। এ তোমার সফিস্টিকেটেড বম্বে নগরী নয়।

বড় মামিমা, মণিমাসি, বনানী খবর পেয়েই এলেন কয়েকজন। বসালেন আদরে। একটি মেয়ে এগিয়ে এলো বনানীর কাছে। দীর্ঘ-, গৌর-সুদর্শনা। কণ্ঠস্বর নম্র, মৃদু :

—তোমার নাম কি ভাই ?

—বনানী রায়। তোমার ? বনানী আজকাল নিজের নামের আগে কুমারী ব্যবহার করে না।

—শ্রীমতী সুরমা দেবী।

হাসি পেয়েছিল, যদিও হাসেনি। মেয়েটির আবার দেবী হবার সখ কেন ? ফের প্রশ্ন মৃদুকণ্ঠের :

—তুমি কি পড় ভাই ?

—ফার্স্ট ক্লাস চলছে। তোমার ?

—শরৎবাবুর "শেষ প্রশ্ন" পড়ছি আর নজরুল ইসলামের "অগ্নিবীণা"।

বেণু তাজ্জব। একি কেউ বলে ? স্কুলক্লাস, কলেজ ইয়ারই উল্লেখ্য। বড় প্রথামাফিক ভেবেছিল। অসংলগ্নতা প্রতি মানুষেই লগ্ন। এদিকে ডিগ্রী সম্বন্ধে কোনো মোহ নেই। সেদিন বুঝতে পারেনি অনেক দেরিতে শুরু করেও এই সুরমাই টক্‌টক্ করে পরীক্ষা দিতে দিতে ট্রিপল এম, এ, হয়ে বসবে।

গান বিনিময়ে অতঃপর দুজনেই রবীন্দ্রনাথ। সুরমা গাইল "মাধবী হঠাৎ কোথা হতে", বনানী গাইল—"কে গো অন্তরতর সে"

সময়-সরোবরে জাল ছড়াচ্ছে। ক্রমসংকুচিত, পরস্পরকে টানছে কাছে। অনুভব : পাশাপাশি। বেশী সময় লাগেনি। সুরমা বনানী থেকে রমা, বেণু। তুমি থেকে তুই। প্রথম-বন্ধুত্বের নিবিড়-অনুভব

দু'জনেরি। সুরমার সুন্দর মুখের বিষণ্ণ বেদনা উদ্ঘাটিত হয়েছে। সুরমাই দেখিয়েছিল চুলের অন্তরালে প্রায় ঢাকাচাপা সিঁথির সিঁদুর। স্বামীর পদবীতে অস্বস্তি তাই দেবীর ব্যবহার। দু'বছর বিবাহ হয়েছে। সুন্দর, সুদর্শন, শিক্ষিত। বাহিরে যে এত সুন্দর, রাতের অন্ধকারে •সেই হিংস্র, নিষ্ঠুর।

—জানিস বেণু, এটা মানুষের স্বভাব নয়, ব্যাধি।

সুরমার শ্বশুরবাড়ির ধারণা, এ রোগে একমাত্র অব্যর্থ ওষুধ, সুন্দরী, সুনম্রা স্ত্রী। ছেলে যদি রোগমুক্ত না হয়, দোষ স্ত্রীর। শাশুড়ী বলেন—শুধু শুধু তোমাকে মারবে কেন? ছেলে যা চায়, যেমনটি চায়,—নিশ্চয়ই তা করো না! স্বামীর পছন্দমত কাজ না করাই পাপ। এত পাপের পরেও যে তোমাকে মেরে ফেলেনি— এই তোমার ভাগ্যি।

বনানী ক্ষিপ্ত—তোর শাশুড়ির ফাঁসী হওয়া উচিত।

—শুধু পুরুষে যন্ত্রণা দেয় না, মেয়েদেরও সায় থাকে। মেয়েরা মেয়েদের দুঃখ বুঝলে মুস্কিল-আসান হয়ে যেত রে, দল বাঁধতে পারত।

বনানীর মনে পড়ে মেজদির ছোট পিসির কথা। সে না হয় বঞ্চিতা। এই মা তো বঞ্চিতা নয়। ভালোবেসেছিল স্বামীকে, ভালোবাসে ছেলেকে।

ভালোবাসা, কী তুমি তাহলে? তুমি কি নির্বোধ, লোলুপ, লোমশ, চটচটে এক জান্তব ক্ষুধা? পশু তুমি? তুমি মানবিক নও। তোমার ইচ্ছে করে না, মানুষের আকাঙ্ক্ষাগুলোকে ধুলোমাটি থেকে তুলে নিয়ে, ধুলো ঝেড়ে ধুইয়ে দাও! পরিচ্ছন্ন করে দাও আরো।

কেমন যেন মনে হয়, একটা চটচটে আঠা আঠা জান্তব ক্ষুধা, মাংসল, রোমশ হাত-পা, লক্‌লকে জিভ, স্থূল উদর নিয়ে প্রচণ্ড ভয়ংকরতায় সুরমার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। যন্ত্রণাকাতর বলে:

—কেন তুই গোপন রেখেছিস। আমি মাসিমাকে জানাব।

—না বেণু না। ভেবে দেখ, বাবা-মা কতখান ভেঙে পড়বেন? অন্ততঃ আর কিছুদিন চেষ্টা করি।

বনানী নীরব। সুরমাও তারি মত এক মেয়ে।

একদিন কথায় কথা :

—প্রথমদিকে কেমন ছিল রে ?

—শুরুতে ? সুরমা মিষ্টি হেসেছিল :—ওর একটু মাথা ধরলেই মনে হত—মাথাটা আমার ধরুক, ও সেরে যাক্।

একটু থেমেই বলেছিল :

—আসলে মাথা ধরাই ওর রোগ। প্রথম প্রথম হাত বুলিয়ে দিতাম, চুপ করে চোখ বুজে থাকত। তারপর শুরু হল বাহানা —আমি সাড়া দিতে পারিনে।

—কেমন বাহানা যে তুই সাড়া দিতে পারিসনে ?

থতমত সুরমা—এমন প্রশ্ন করবে বেণু ভাবতেই পারেনি। প্রথমে রক্তবর্ণ, পরে বিবর্ণ, বলল :

—সে আমি তোকে ঠিক বোঝাতে পারব না। বনানী আর শিশু নয়। নারী-পুরুষের প্রেমে শুধু যে হৃদয় মন প্রাণই নয়, আছে দেহ নামক কঠিন বস্তু, একথা জানে। এও জানে, সুরমা বিবাহিতা, দেহ অভিজ্ঞতায় অভিজ্ঞা। কিন্তু, দেহ-মন-হৃদয়ের ত্রয়ী সম্মেলন হয়নি, মস্ত হৃদয়ক্ষত তার। বিবাহিত জীবনে ঠিক কতখানি নর্মাল আর কতখানি নর্মাল নয় না জেনেই বলে বসল :

—অ্যাবনর্মাল ?

—ঠিক্ তাই। সুরমা আবেগে বলে উঠল :

—ওর ইচ্ছেয় সাড়া দিতে আমার প্রাণ চাইত রে। বিয়ের মন্ত্র গুনগুনিয়ে গানের মত বাজত মনের মধ্যে—

মম ব্রতে তে হৃদয়ং দধাতু, মম চিত্তে :

বনানী নিজেই বোঝেনি এমন আবেগে বাধা দেবে। বলল :

—ব্রত যেখানে নেই, চিত্তের পাত্তা পাওয়া যায় না—

—তাইত হলরে। ব্রত কি জানিনে, চিত্তকেও পাই না। শুধু দারুণ এক ইচ্ছে। মুহূর্ত থেমেছিল, থেমে বলেছিল :

—ইচ্ছেটার ভয়ংকর খিদে। একটা সময় ও অশ্লীল হয়ে পড়ত।

বাহানা করত, আমিও অপ্রাপ্ত হই। পারতাম না। তখনি মারধোর অত্যাচার।

বনানীর চোখ জ্বলছে। সত্য উদ্‌ঘাটনে এমন তথ্য উন্মোচিত হবে, ভাবতেও পারেনি। সে চায় রক্তকঙ্কুর আলোড়ন সুন্দর হোক্, সুস্মিত হোক্।

—আমি জেগে আছি। সারা শরীরে যন্ত্রণা, দুঃসহ প্রাণ। ভাবছি, মন্ত্র পড়ে, এত আলো জ্বালিয়ে, শেষ পর্যন্ত এই ?

বেণুর চোখ জলে ভরে গেলো। সুরমা বনানীর গলা জড়িয়ে ধরল :

—এই যে তোর গাল ভেসে গেল বেণু, এতেই আমার যন্ত্রণা অনেক ধুয়ে গেল।

সবটাই নিবিড় নয়। তর্কে বিরোধ। বনানী যতখানি রবীন্দ্র-শিষ্যা, সুরমা শরৎ-শিষ্যা ততোধিক। সুরমা বলত :

—আমাদের দেশের মেয়েদের অবস্থা শরৎবাবু যেমন বুঝেছেন, এমন কেউ নয়। শ্রীকান্তর সেই গল্পটা মনে আছে ? দেশের লোক ভেবে মেয়েটি একজন অপরিচিতের কাছে কেঁদে বলছে, শ্বশুরবাড়ির অত্যাচারে দিদি গলায় দড়ি দিয়েছে, আমিও দেব—একথা আমার বাবাকে জানিয়ে দিয়ো।

অত্যাচারিতা মেয়েদুটির অদেখা মুখ সুরমার দু'পাশে যেন ফ্রেমে আবদ্ধ, একীকরণ। বনানী ভাবে, সুরমা, তবুও জীবননাট্যে ট্র্যাজিডির নায়িকা হবে না—সবলা দাঁড়াবে শক্ত পায়ে—তার নিজস্বতাকে মুক্ত করে নেবে প্রাপ্ত অনৃত-সংসার থেকে। নিজেই রচনা করবে নিজস্বতাকে।

সুবর্ণর সঙ্গে লঘু-আরম্ভ :

—কই ভাই রমাদি, দেখি তোমার বন্ধুকে ? এত-যে গুণ গাইলে।

সরু গলা। মধ্যসপ্তকের চেয়ে তারসপ্তকে খেলবে ভালো। সামান্য কথাটাই গানের সুরের মত লেগে গেল। হয়তো লেগেই থাকবে সারাজীবন। বয়সটাই অনুকূল, প্রীতির—সৌহার্দ্যের। পরিবেশও

ছুত। বেড়ানো, গল্প, গান। দেওঘরকে তন্ন তন্ন করে ছুঁয়ে চলেছে তিনজন। সেদিন অনেকেই দেখেছে সেই ত্রয়ী। দু'পাশে দুটি মেয়ে, দীর্ঘ, গৌর, সুদর্শনা, মাঝের মেয়েটি মাথায় খাটো, রঙ শ্যাম, শুধু চোখে একটু বাহাদুরী।

—মন্দিরে যাব বেণু।

—যে মন্দিরে সকলে যেতে পারে না, সেখানে আমি যাইনে।

—এমনভাবে বললি, যেন অস্পৃশতা নিবারণকল্পেই যাচ্ছিসনে। আমাদের বাড়িতে সত্যনারায়ণ পুজোতেও তোকে প্রণাম করতে দেখলাম না। সুরমার কথার উত্তরে বেণু হেসেছিল :

—আকার আর আশ্বাস দিচ্ছে নারে ভাই।

—একদিন নিরাকারও হয়তো দেবে না।

মোক্ষম বলেছিল সুবর্ণ। সুরমা থামেনি। অনেকদিন চিঠিপত্রে চলেছিল : আকার-নিরাকার-সংবাদ।

ফীজ জমা দেওয়া সত্ত্বেও ম্যাট্রিকুলেশন দেওয়া হল না। ঠিক তার আগেই ব্রঙ্কোনিমোনিয়া আবার রিল্যাপস করল। মায়ালতার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। জল মুছে বললেন :

—ইচ্ছের একটা জোর আছে। তোরা বাবা-মেয়ে দুজনেই খুব ইচ্ছে করে ডিগ্রী থেকে সরে আছিস্। ইচ্ছের জোরেই ফের অসুখটা হল।

কিছুদিন বাদেই দেওঘর। ডাক্তার অভিমত কয়েকটা মাস চেঞ্জ জরুরী। জ্বার জ্বর লেগেই আছে। মা এলেন না, বাবার শরীরও ভালো নয়।

ম্লান দেওঘর প্রশ্ন করল :

—ও বেণু, একা কেন? আর দু'জনকে কোথায় রেখে এলে?

সেজমামা বললেন : তোর বড় একা লাগছে, না বেণু? সুরমা সুবর্ণ আসেনি।

—একটু একটু। বেণু লজ্জিত।

—আমার এক বন্ধুর বাড়ি কাছেই, আলাপ করিয়ে দেব। তার অনেক বোন। তোর একা লাগবে না।

বনানী একসঙ্গে এত মেয়ে এর আগে দেখেনি। বিশেষত কিশোরী। মিষ্টি চেহারার শেফালিকা, প্রথম দেখাতেই মনে হল বন্ধু। দ্বিতীয় দিনেই শেফালিকা থেকে সরে উৎসুকী ছিপ্‌ছিপে অশোকার প্রতি। একদিন বলল :

—তোমরা সবাই মিলে একটা গণ্ডীটানা দল। খড়ির দাগের বাইরে কেউ যাবে না, এর ভেতরে অন্যের প্রবেশ একেবারে টাবু—আমি এলেই তোমাদের দল হুঁশিয়ার হয়ে যায়—অনুচ্চারিত শব্দটা আমি শুনতে পাই—তফাত যাও।

—সে কথা ওরা ভাবে। আমিও প্রথম ভেবেছিলাম। অশোকা হেসেছিল, তুমি ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

পরদিনই বনানীর গান। দলটা নড়েচড়ে বসল। শুধু গলাটাই ভালো নয়, বেশ টিউটর্‌ড্‌ লাগছে। দ্বিতীয় দফায় মাসিকপত্রের গল্প-কবিতা। দলটার বাঁকা ভুরুতে জাদুর ছোঁয়া লাগল। বনানী হয়ে গেল—বেণু, বেণুভাই, বেণুদি, বনানীদি।

অনেকদিন পুরুষজগৎ বিচ্ছিন্ন বনানী। বাবা আর জ্যেঠু ছাড়া প্রায় কাউকেই দেখেনি। লোকমুখে শোনা পুরুষসম্পর্কটুকু সুখকর নয়। কিশোর, তরুণ যুবকদের সে চেনে না। তাদের আবিষ্কার করছে গল্প-উপন্যাস থেকে। ফলে তার ধারণাটাই কেতাবী। অশোকার কাছে ক্ষোভ করল :

—আমার দেখার দোষ আছে। কাউকেই বিশিষ্ট চেহারায় দেখতে পাচ্ছি নে, সেজমামা ছাড়া। সাহিত্যিকের চোখ নেই আমার।

—তুমি যে কেবলি গোরা, বিনয়, নলিনাক্ষ, নিখিলেশকে খুঁজে বেড়াচ্ছ। মধুসূদনকে দেখতেই চাইছ না।

বেণু ক্যাকাসে, ঢোঁক গিলে বলল :

—মধুসূদন !

—হাঁ বেণু, মধুসূদন বাস্তব। আমাদের যৌথপরিবারে আমি তাকে দেখেছি।

খুব ভোরে ওঠা বেণুর অভ্যাস। সবেই পুব আকাশে আলোর রেখা। বেণু গুন্‌গুন করছিল :—

এই যে তোমার প্রেম ওগো, হৃদয়হরণ
এই যে পাতায় আলো নাচে, অমৃতবরণ।

হঠাৎ আলিঙ্গনে কে জড়াল। কে সে জানে না। সামনের দিকে খস্‌খসে কোমল দুই হাত তার বুকে পড়ল। বুকে, নিতম্বে তরতর করে ছুটে গেল ঘৃণা।

—ছাড়ুন।

কথা নয়তো চাবুক। চমকে ছেড়ে দিল। দ্রুতগতি ফিরে দেখল তার গুরুস্থানীয় আত্মীয়। প্রৌঢ়, চার পাঁচ ছেলেমেয়ের বাবা। থতমত প্রৌঢ় :—তুমি বড্ড বডি কন্‌সাস্।

—যদি হই তার মর্যাদা দিতে হবে।

চোখ জ্বলছে। পারলে পুড়িয়ে মারে।

নন্দমাসিও কাঁদল—জানিস ভাই, সেদিন রাতে একটু শরীর খারাপ লাগায় একটু আগেই শুয়েছি, সরযুদি আসেন নি, হঠাৎ কেমন যেন মনে হল, সরযুদি নয়, অন্য কেউ আমাকে জড়িয়ে বুকে, মুখে—ছট্‌ফট্ করতে বলল চাপা গলায়, কেউ জানতে পারবে না। কেঁদে উঠলাম—ঝন্টুদা ছেড়ে দাও নাহলে আমি চীৎকার করব।

—দিদিমাকে জানালে না কেন ?

—জানিয়েছিলাম। পিসিমা বললেন—কয়েকটা দিন খুব সাবধানে থাক, তোর বিয়ের কথা হচ্ছে, পাঠিয়ে দেব। এসব কথা যেন কাক-পক্ষীতেও টের না-পায়। পেলে তোরই ক্ষতি। ঝন্টুর কি ? ও ব্যাটাছেলে, সাতখুন মাপ।

ঝণ্টুমামার বিয়ের কথা হচ্ছে। সম্ভবত বিয়ের পর মামিমার কানে কূজন, গুঞ্জন করবে, প্রেমের অভিনয়, যেমন করে চলেছে ওই প্রৌঢ়। অস্থির হয়েছিল, বলেছিল :

—অশোকা, পুরুষের অত্যাচারটা তবু বুঝি কিন্তু এই প্রতারণা ?

—জানো বেণু, শুধু প্রতারণা করা নয়। প্রতারিত হওয়াও। একটা গোটাজীবন কাটিয়ে ছিল একসঙ্গে, ছেলে হল, মেয়ে হল। দেহ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি। অথচ ভালোবাসা কী বস্তু জানল না। বেশীর ভাগ বিয়েই কিন্তু এই।

—না—না—না। অবরুদ্ধ রোদনে বেণু প্রতিবাদ করেছিল।

এ নহে এই নহে। আছে আরো কিছু আছে, অন্য কিছু।

—খুব ভোরে উঠিস্ তো, বেড়াতে যাবি।

—চলো।

কথা বলতে বলতে চলেছে।

—জানো সেজমামা, অশোকার পরের বোন এখন কলকাতায়, দারুণ ইন্টারেস্টিং।

—তোর বন্ধুর বোন কতটা ইনটারেস্টিং জানিনে, কিন্তু, আমার বন্ধু সত্যিই ইনটারেস্টিং। ইনটারেস্টিং এবং ওয়াণ্ডারফুল। অমন আর দেখিনি।

সেজমামাও ওয়াণ্ডারফুল। সেই মামার যার ওপর এমন আশ্চর্য ধারণা, না জানি সে কেমন মানুষ ? বনানী এই ঐশ্বর্যবান পুরুষটিকে দেখবার জন্য ভেতরে ভেতরে চঞ্চল হয়ে উঠল। মাঠ পার হল। নন্দনপাহাড়ের কিছুটা ভেঙে বেণু স্তিমিতগতি।

—তুই বড়ো আস্তে হাঁটিস বেণু।

—তুমিই বেশী জোরে হাঁটো।

—হবে। এটা আপেক্ষিক। আর আপেক্ষিক নিয়েই ভালো-মন্দের তর্ক।

একটু অপেক্ষা করে বললেন :

—তোদের মেয়েদের এই যে সব কিছুতেই ধীরতা, অনেকেই ভাবে মাধুরী। আসলে এটা শক্তিহীনতা, একেই নারীত্ব বলে ভুল করিস্ নে।

—করব না। কিন্তু, তোমাদেরও সব কিছুতেই জোর ফলানো, গায়ের জোরের অহংকার, তাই পৌরুষ নয়।

—বাঃ বাঃ বেশ। বেণু, তুই যে সব কিছু মুখ বুজে মেনে নিস্ না—চিন্তা করিস্, তর্ক করিস, তোর এই লাইভলি গুণটাই আমার ভালো লাগে। তবে একটা কথা বলব।

—বলো।

—একটা অধ্যায় পর্যন্ত মেয়েদের ভালো লাগে। মা, বোন, আত্মীয়া, এমন কি অনাত্মীয়াও। কিন্তু, কোনো পুরুষ কোনো মেয়ের প্রেমে উন্মত্ত হ'তে পারে, ভাবলেই আমার হাসি পায়।

—সে তুমি প্রেমে পড়োনি বলেই বলছ। আমিও পড়িনি। তাই কিছুতেই ভেবে পাইনে একটি পুরুষের প্রেমে একজন মেয়ে কেন তার নিজস্বতা, আইডেনটিটি হারাবে।

রাইট্‌লি সাভর্ড্। আমার মারটাই দ্বিগুণ জোরে ফিরিয়ে দিলি।

হঠাৎ হো হো।

—এত হাসছ কেন?

—একটা মজার ঘটনা মনে পড়ছে, শুনবি?

—নিশ্চয়।

—হসটেলের ছেলেরা মেয়ে দেখলে পাগল। স্কুলবাস যাচ্ছে, কলেজবাস, কেউ সিটি, কেউ গুনগুন। প্রতিবাদ করলাম। ওরা বলল, আমি নাকি পুরুষই নই, গ্ল্যাণ্ডুলার ডিফেক্ট আছে। মাথায় ঢুকে গেল। ভাবলাম হবেও বা। একটা এক্সপেরিমেণ্ট করা যাক্—সিটি না হোক্, গুনগুন না করি—শুধু দাঁড়ানো, একটু খুশি খুশি হবে তো। খুব চেষ্টা, স্কুল বাস যাচ্ছে, দাঁড়াচ্ছি একদিন, দু'দিন, চারদিন—বড়ো ক্লান্তি, শুধু বেণী, শুধু খোঁপা। সময় নষ্ট। ভাবলাম স্কুলের খুকি খুকি মেয়েতে কুলোচ্ছে না, অতএব কলেজ বাস—

বেণু হেসে উঠল :

—ফল লাভ পূর্ববৎ। মোহভঙ্গ আর ক্লান্তি। তবে ও রকম নয়, ধরো কোনো বাড়ি। সেখানে ইন্‌টেলিজেন্ট, ইনটারেস্টিং মেয়েদের দেখলে, তখন ?

—তাও তো দেখেছি। তোর সব বন্ধুদের দেখলাম। সুরমা, সুবর্ণ, শেফালিকা, অশোকা—এমন কি যে ইন্টারেস্টিংটি কলকাতায়, তাকেও দেখেছি।

—কোনো ভাবোন্মেষ হয়নি ?

—না। কোনো উন্মেষ নয়।

—কিন্তু, আমি দেখি তুমিই সবচেয়ে বেশী দুঃখ পাও, ব্যথা পাও মেয়েদের জন্যে। মেয়েদের অধিকার দিতে চাও। আমি ঠিক জবাব দিলে বলো, রাইটলি সার্ভড্।

—আমি মেয়েদের জন্যে দুঃখ পাই ওরা প্রতারিত বলে। দীর্ঘদিন প্রতারণাকে মেনে নিতে নিতে মেয়েরা সেটাকেই ক্ষমা, ভালোবাসা মনে করে সহজ প্রসন্নতায় থাকতে চেষ্টা করে, তাই ব্যথা পাই। আমাদের সমাজে মেয়েরা স্লেভ্ এমংগস্ট স্লেভ্স্। আমি মেয়েদের সপক্ষে লড়ি। যেমন নিরক্ষরতা দূরীকরণে কিছু কাজ করি। বাট ইট ইজ নট লাভ। অন্তত, তোদের কবিতা, গল্প, উপন্যাস যে প্রেমের জয়গান গায়।

প্রায় পাহাড়ের মাথায়। দুজনেই হাঁপাচ্ছে। বেণু বেশী কিশোর কম। বেণু বলে,

—ভালো না বাসলে এমনিই মনে হয়। যে মেয়েদের দেখে তোমার কোনো ভাবোন্মেষ হল না। হয়তো তাদেরি কারুর জন্যে কেউ পাগল হয়ে উঠবে।

—তাই দেখছি। আমার এক বন্ধু এমন মেয়ের জন্য পাগল যে সর্বাংশে তার ছোট।

পাহাড়ের মাথায় ওরা। যে পথটা ভেঙে এসেছে তার দিকে তাকাল বেণু। মেঠো পথ ধরে চলেছে গ্রামের নারী পুরুষ। মাথায়

ঝুড়ি, কারুর কাঁধে বাঁক। দূর বলে খুব ছোট দেখাচ্ছে। যেন তারা ছোট্ট মানুষ। অনেকটা চলন্ত পুতুল।

—তুমি যাকে ছোট দেখছ, দূর বলেই দেখছ। সেই মেয়েটিকে তুমি এমন কাছে থেকে দেখতে পাওনি, যাতে সমান-মাপে দেখো। মেয়েরাও এমনি দূর থেকেই দেখে সেজমামা, সুস্থ রুচির পুরুষ তারা দেখতে পায় না, সব স্থূল।

—হতে পারে। ছেলেরা হয়তো বা একটু স্থূল। আসলে কী জানিস্। ছেলেরা নামতেও পারে উঠতেও পারে। ইলাস্টিক। মেয়েরা মাঝখানেই থেকে যায়। যাকে ইন্‌টেলিজেণ্ট বলিস্, ওয়াণ্ডারফুল, অদ্বিতীয়া, সেই অদ্বিতীয়াও প্রতিভার হিসেবে মাঝখানেই আটকে থাকে। একটা স্টেজের পর আর বাড়ে না।

ডিবেটে সেজমামার জন্মগত অধিকার, বনানী জানে। বনানীর তর্কসভার রুচি নয়, সে চায় জীবন-সত্যের উন্মোচন। ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলে :

—কেন মেয়েরা একটা স্তরে আটকে থাকে, পার হয়ে যেতে পারে না এটা বিবেচনা করে দেখবে না ?

—বিবেচনার দ্বারা দয়া হয়, করুণা হয়, প্রেম নয়। ছেলেদের সমান মাপের মেয়ে আজো আমার নজরে পড়ল না।

বনানী আমূল বিদ্ধ। আর তর্ক করতে ইচ্ছা করছে না। সেজমামা বিদীর্ণ অংশকে তন্ন তন্ন উন্মুক্ত করছেন শানানো ছুরিতে।

—ভালোবাসা দু'রকমের। এক, সেণ্ট্‌লি লাভ ; বুদ্ধের করুণা, খ্রীষ্টের প্রেম। হিউম্যান লাভ অন্য রকম, তোমার শূন্যতা ভরিয়ে দেব, তুমি আমার শূন্যতা ভরাও, এদেশে হিউম্যান লাভও জোলো। একপক্ষে স্নেহ-করুণা, অন্যপক্ষে শ্রদ্ধা-সমর্পণ।

অবনত বনানীর মুখ। দুঃখ, হীনমন্যতা, সেজমামার উক্তির যাথার্থ-নির্ণয় সব মিলে জটিল। সেজমামা কি কোনো জায়গায় নীটশের মত, সোপেন হাওয়ারের মত ? ভাবেন মেয়েরা সর্বাংশে ছোট। তা হলে কেন এই দরদ ? অসংলগ্নতা বুঝি জীবনের সঙ্গেই লগ্ন। শ্রদ্ধাহীন দরদে হয়তো বিরাট জটিলতার জন্ম হবে। কোনো

মেয়েকেই ভালোবাসতে পারবেন না। কিংবা কোনো মেয়ে যদি ঝড়ের বেগে এসে ভূমিকম্প ঘটাতে পারে তাঁর ধ্যান ধারণায় তাকেই ভালোবাসবেন। মেয়েটি সমবয়সীই হবে, দু'এক বছরের বড়োও হ'তে পারে। সহপাঠিনী বা সহকর্মী। ডিবেটে থাকবে তারও জন্মগত অধিকার। শবব্যবচ্ছেদের নিপুণ ছুরি সেজমামার ওপর চালাতে তার একটুও হাত কাঁপবে না। তাঁকে তর্কে পরাজিত করবে। বনানীর দীর্ঘশ্বাসকে চেপে নেয়। নিজেদের যে কল্পনায় তারা রেখেছে সে কি কয়েকটি আত্মগরবী মেয়ের চিন্তা নয়। ছেলেরা কি চোখে দেখে তাদের ? বাজে ছেলে নয়, যারা সেজমামার মত। বুকে বেঁধানো কিশোরকান্তের বসানো ছুরি, নড়তে-চড়তে বাজছে। তবু কাতর-উক্তি করল না।

—একেবারে চুপ করে গেলি যে।

—ভাবছি।

—কী ভাবছিস্ ?

—ভাবছি, অসংলগ্নতা বুঝি জীবনের সঙ্গেই লগ্ন। তোমার এত সহানুভূতি অথচ শ্রদ্ধা নেই।

কিশোরকান্ত হেসে উঠল :

—ভুলেই গেছি, তুই কবিতা লিখিস্।

কদিন পরেই বললেন কিশোরকান্ত :

—আমার বন্ধু আজই আসছেন, আমি রিসিভ করতে যাব।

—জানি। অশোকার বোন শিশিরকণাকে নিয়ে আসছেন। আমরাও সদলে যাচ্ছি। বলল বনানী।

বনানীর মন চঞ্চল। দেখবার মত দু'জনকে দেখবে। আজ সকাল থেকেই ওর বড়ো ভালো লাগছে। এটা কি কোনো মিরাক্যলের পূর্বাভাস ? ও-বেণু, তুমি এখনো মিরাক্যলে বিশ্বাসী। মোহজড়ানো অলৌকিকতায়। বেণুর মনের একটা অংশ লজ্জা পেলেও আর একটা অংশ যেন ডানা মেলে দিল সুখদ-আবেশে।

স্টেশন বৈদ্যনাথ-দেওঘর। প্রথম দিনের মতই অনুভব। সময়

সেই গোধূলি। সূর্যাস্তের মায়াবী রাঙা, প্রথম দিনের চেয়েও বেশী রাঙা। বনানী তার প্রিয় গেরুয়া-রঙা-শাড়ী পরেছিল। রাঙা হল বসনভূষণ। শিশিরকণার সঙ্গে স্বল্প-আলাপ। ওদিকে দু'বন্ধু দু'জনের হাত ধরেছেন জড়িয়ে।

বনানী প্রস্তুত ছিল। এমনিতে খুঁটিয়ে দেখে না সে, তার তা স্বভাব নয়, অনেক কিছুই থেকে যায় তার চোখের বাইরে। দেখবে বলে সমস্ত মন লগ্ন করেছিল। লগ্ন করতে গিয়ে রাঙা হল বসন-ভূষণ, রাঙা হল শয়ন-স্বপন। সত্যিই কি টলোমলো করে উঠল রাঙা কমলটি ?

সে রাতে বনানীর ডায়ারীতে দুটি ভিন্ন জাতীয় রচনা লিখিত হল।

# ডায়ারী

অশোকার ইন্টারেস্টিং বোনটির সঙ্গে আলাপ হল। চোখ বেশী উজ্জ্বল, ঠোঁট বেশী ধারালো। প্রথমে মনে হয়েছিল ধারালো মেয়েটি রিজার্ভড্। পরক্ষণেই মন বুঝল ধারালোপনাটা ধার করা। মেয়েটির মধ্যে কী যেন কথা আছে যা সে গোপন রাখতে চায়। অশোকা আলাপ করলে :

—বন্ধু বনানী রায়। চমৎকার কবিতা লেখে।

—কবিতা-টবিতা এখন হাস্যকর লাগে। আগে অনেক পড়েছি। লিখেছিও।

আমি কোনো উক্তি করিনি। ঠোঁটে হাসিনি। হেসেছিলাম চোখে। আমার বয়েসাই হবে, এখনি অতীত-উক্তি? অশোকা অপ্রস্তুত। আমি কিন্তু আহত হইনি। অভিমত স্থির করেছি, গোপনতার আবরণ খসে যাবার শঙ্কায় সঙ্কুচিত মেয়েটি টান্‌টান্ ধনুকের ছিলার মত। প্রথম দর্শনেই অগ্নিবর্ণ চেহারায় জ্বলন্ত মেয়েটি আমার চোখে ধরা পড়ল বেদনার অশ্রুজলে।

পরবর্তী অনুচ্ছেদটিতে আমি অন্য রঙ, অন্য ধ্বনি দিতে আকাঙ্ক্ষা-করি। রমণীয় অথচ গভীর-গম্ভীর। আমার কলমে এমন জোর নেই, যাতে করে এত ঐশ্বর্য দিতে পারি। সংস্কৃত ভাষায় আছে এই ঐশ্বর্য। উপমায়, বর্ণনীয় ছবির পরে ছবি এবং সে ছবিরাও স্থিরচিত্র নয়, গতিময়। চলমানই নয় শুধু গানে মুখর। লঘুগুরু স্বরের ছোট বড় তানে, যুগ্ম-অযুগ্মের উত্থান-পতনে ঢেউ পরে ঢেউ। এই মুহূর্তেই মনে পড়ে যাচ্ছে ঋতুসংহার কাব্যে বর্ষাবর্ণনার প্রথম শ্লোকটি যেন মেঘমল্লারের গুরু গুরুগুরু গর্জন :

সসীকরাম্ভোধরমত্তকুঞ্জরস্তড়িত্‌পতাকোঽশনিশব্দমর্দলঃ
সমাগতো রাজবদুদ্ধত দ্যুতির্ঘনাগমঃ

আকাঙ্ক্ষা মিটল না। অত সংস্কৃত জানি না। সাধুভাষার শরণ নিলাম। নাম দিলাম "অন্যধারা।"

অন্যধারা

সেজমামার বন্ধুকে দেখিলাম। বুদ্ধির দীপ্তিতে জ্বলিয়া আলো হইয়া আছে তাঁর কালো রঙ। বড়ো চোখে, টিকলো নাকে, চওড়া কপালে ঝলমল করিতেছে তারি আভা। তাঁর বাচনভঙ্গী, তাঁর চলা সমস্তর মধ্যে একটা অত্যাশ্চর্য-নৈপুণ্যের সঙ্গে জড়িত শান্ত-গম্ভীর মহিমা। ঠিক্ ইহাকেই বলা চলিতে পারে সংহত।

৮ মে

গত বছরের মত এবারও সময়-সরোবরে জাল ছড়িয়ে গুটিয়ে এলো। পাশাপাশি আমি আর শিশির। গত বছর সুরমা-আমার মধ্যে সুবর্ণও এসেছিল। তিন বন্ধুর মধ্যে অলিখিত চুক্তি ছিল। এবার অশোকা রাজী হল না। আমিই এসেছিলাম দূরে সরে। অভিমানে অশোকা নিজেকে সরিয়ে নিচ্ছে। আমরা দু'জনেই কষ্ট পাচ্ছি—অথচ শিশিরের সঙ্গেকার নিবিড়তাকে অস্বীকার করতেও পারছি নে। দু'বন্ধু ভ্রমণ করে আসি, সামনে অশোকা পড়লেই আমার বুকের মধ্যেটা টন্‌টন্ করে ওঠে। অশোকা আমার চেয়েও বেশী ব্যথা নিয়ে সরে যায়। বন্ধুত্ব! সেও-কি প্রেমের মতই? নিবিড়তার সঙ্গেই স্বার্থপর। একটু অন্ধ, হয়তো বা একটু নিষ্ঠুরও।

১২ মে

আজ আমার পরম আশ্চর্য, পরম বিস্ময় দিন।

আজ আমি আবিষ্কার করিয়াছি, আমার দিকে চাহিয়া তাঁর চোখে যে দৃষ্টি জ্বলিয়া উঠিল, তাহা কেবলি দৃষ্টি নয়, তাহা আলো। সে আলোক বহুশিখা বিচ্ছুরিত। বিচ্ছুরিত আলোকটি বহুনৃত্যপর শিখায় আমার মুখের উপর পড়িয়া আমাকে আরতি করিল। শঙ্খরবের সঙ্গে ভ্রমরগুঞ্জন মিলিলে, যে গম্ভীর আনন্দধ্বনি, সুর ও ছন্দের উদ্ভব হয়; তাঁর দৃষ্টি সেই ধ্বনি, সুর ও ছন্দে গাহিল:

—তুমিই আমার পরমা

১৬ মে,

অশোকা আমাকে বড়ো করে দেখেছিল, শিশির কি অবমূল্যায়ন করছে! বলে, বেণু, শূন্যে ডানা মেল না। তুমি মেঘ নও, পাখি নও। অবমূল্যায়নই বা বলি কি করে? ওদের খিড়কি দিয়ে ঢুকলেই শিশির আপত্তি জানাত। তুমি সামনের দরজা দিয়ে এসো, খিড়কি দরজা তোমাকে মানায় না। আমি যেমন ওর শিশিরকণা নাম পছন্দ করতাম না। কণা নও, তুমি শ্রী—শিশিরশ্রী। একদিন আমার গল্পের একটা চিঠি পড়ে শিশির বলল: দূরে গেলে যদি এমনি চিঠি আমাকে দাও বেণু, এক্ষনি ফের কলকাতায় যাই।

২২ মে,

হাঁপাতে হাঁপাতে এসেছি। প্রায় ডুবতে ডুবতে উঠলাম। মনে হচ্ছে শিশির আমাকে জলে টেনে নিয়ে গলা টিপে—না না, আত্মপরতায় অন্ধ হয়ে যেন এমন ভুল না দেখি। শিশির বরং আমাকে হাতে ধরে তোলবারি প্রয়াস করছিল। ডুবে যাওয়া আমাকে ডাঙায় তুলতে গিয়ে আমাকে জড়িয়ে আমারি মত হাঁপিয়ে মরছিল। শিশির দাঁড়িয়ে আছে রাস্তার ধারের মহুয়া তলায়। যে মহুয়া গাছের ফল আমি আর শিশির একসঙ্গে কুড়িয়েছি। সোনালী দ্রাক্ষার মত ফলগুলি হাতে নিয়ে মদির গন্ধে বিহ্বল দুজনেই একযোগে আবৃত্তি করেছি:

"বধূরে যেদিন পাব ডাকিব মহুয়া নাম ধরে"

আমাকে বাড়ির মধ্যে ঢুকে যেতে দেখে আস্তে ফিরে গেল।

শিশির কি আমার জীবন থেকে একেবারে চলে গেল? আমরা দুই বন্ধু কি আর বন্ধু থাকলাম না।

২৬ মে,

কয়েকটা দিন যে কেমন করে কাটল, বুঝতেও পারিনি। যেন কয়েকটা দিন নয়, কত অনন্ত জনম-মরণ। মনে হয় সময় নিথর, সময় স্তব্ধ। বুকের মধ্যে গম্‌গম্ করে বেজে চলেছে সকলের অলক্ষ্য। অশ্রুত কান্নার অঝোরধারা। সে শব্দ, তার ঢেউ, তার আছাড় খেয়ে ভেঙে পড়ার কী-যে যন্ত্রণা, শুধু আমিই জানি। কী করব আমি? এরপরে কী?

২ জুন,

সকলের অলক্ষ্য নয়, সেজমামা নিরীক্ষণ করেছিলেন।

তোর কী হয়েছে বেণু, কিছুদিন থেকেই কেমন দেখছি। আমার মুখ মৃতের মতো অমানবিক হয়েছিল নিশ্চিত, সেজমামা বলে উঠলেন :

—থাক্ থাক্। কারুর প্রাইভেসি নষ্ট করতে আমি উদ্‌গ্রীব নই। বেঁচে গেলাম এ-যে কাউকে বলবার নয়। ভাগ্যিস মা নেই এখানে। তিনি ছেড়ে দিতেন না, খুঁটিয়ে শুনতেন, বলতেন :

—তোকে তো বলেছি, ছেলেদের দিকে পা বাড়াবি নে, ওরা শুধু দুঃখই দেয়। শুধু কাঁদায়।

৩ জুন,

সেজমামার মতো হয়তো আরো অনেকেই লক্ষ্য করছে। কথাটা মনে হতেই লজ্জা এসে আমাকে আবৃত করল। যেমন-তেমন লজ্জা নয়—সুগম্ভীর লজ্জা। আত্মবেদনায় আত্মহননের পথে কেন অগ্রসর হচ্ছি। লজ্জা, সম্ভ্রম, শ্রী, সৌন্দর্য, প্রীতি, মায়া কিছুই কি নেই বিশ্বসংসারে ? শুধুই ব্যর্থতা, হারমানা পরাজয়ের গ্লানি বহন করা শুধু। লজ্জার সুগভীর বোধটিই আমাকে আচ্ছন্নতার অস্বচ্ছতা থেকে নাড়া দিয়ে জাগিয়ে তুলল। বলল : বনানী, তোমার হেরে যাবার চেয়ে বেঁচে ওঠাটা শোভনীয় ভাবে শ্রদ্ধেয়।

৪ জুন

মৃত্যুর খোলসটা খুলে ছুঁড়ে ফেলেছি। ও আমাকে জড়িয়েছিল পাকে পাকে। নীল আকাশে. উঁচুনিচু লাল প্রান্তর, নন্দন-পাহাড়, ডিগরিয়া, খারোয়া, সূর্যোদয়-সূর্যাস্ত, আকাশ ভরা তারা, দীর্ঘ ইউ-কালিপটাস, মহুয়া, বকাইন, বাগানের ফুল লতাপাতা, আমার চেনা মানুষগুলি সমস্তকেই মনে হচ্ছিল বিষে জারিয়ে নীল। এবার তারা মৃত্যুর খোলস ছেড়ে এলো স্বরূপে। ঠিক আগের মতো নয়, একটা বেদন-মাধুরী মাখা হয়ে এলো। হয়তো এমনিই হয়। কান্না শেষের শান্ততা আমার সমস্ত অস্তিত্বে ছড়িয়ে পড়ে আমাকে সান্ত্বনা দিল। ঠিক করলাম, শিশিরের কাছে যাব।

কটা দিনের মধ্যেই কত-কী ঘটে গেল। সেজমামার বন্ধু, শিশিরের মাসতুতো ভাইয়ের সঙ্গে আলাপ, তাঁর দেওয়া বিবাহ-প্রস্তাব এবং আমার প্রত্যাখ্যান। আজ মনে হচ্ছে, সেজমামার অনেক কথাই ঠিক। আমরা সমর্পণের জন্যই বসে থাকি। আকাঙ্ক্ষার পুরুষকে গড়ে তুলি প্রায় ঈশ্বরতুল্য, পরমপুরুষ, প্রভু। যেখানে প্রণাম করব, নিবেদন করে দেব নিজেকে। কিন্তু, যে বন্ধু—ভালো-মন্দ, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিকে মিলে যে ঠিক আমারি মতো ; যে আমাকে শুধুই ঋণী করবে না, যে তার ফাঁক ভরিয়ে নেবে দু'হাতের অঞ্জলি পেতে আমার হাত থেকেই, যেটা হিউম্যান লাভ—তেমন দোসরের কথা ভাবিনে কেন ?

১২ জুন,

সেজমামা কলকাতা যাচ্ছেন। যাবার আগে কিছুক্ষণ আমার দিকে চেয়ে থাকলেন, দৃষ্টি গভীর, দৃষ্টি বিচারশীল।

—কী দেখছ, সেজমামা ? আমি লজ্জিত।

—তুই খুব লাইভ্‌লি ছিলি বেণু। এখন একটা ম্যাচিওরিটি এসেছে। আমার আনন্দ হল। বঞ্চনা আমাকে নষ্ট করতে পারেনি। আমার ওপর দিয়ে ঝড় বয়ে গেছে ঠিকই। তবু শেষ পর্যন্ত এই কথাই বলব, নিঃশেষে ভাঙিনি। আমার মধ্যে যা বৃক্ষ তার গুঁড়ি অটুট আছে—দৃঢ়। ঝড়ে কিছু ডালপালা ভেঙে উড়ে গেলেও আমার একটা ভাবনা-অংশ ভেঙে গেলেও অন্য ভাবনা অংশের উদ্ভব হয়েছে। যা ছবি বা সুর নয়, যা ভাস্কর্য—যার স্ট্রাকচার আছে। ভালোবাসা সম্পর্কে বড়ো বেশী রকমের ভাবুকতা করেছি। প্রায় বাবুয়ানার শামিল। এখন বুঝতে পেরেছি, শুধু রোমান্টিসিজম নয়, জীবনের শিল্পে বাস্তব সত্যের একটা শক্ত ভিৎ থাকা চাই। ভাস্কর্যে সেটাই সলিডিটি। সাহিত্যে বাঁধুনি, ক্লাসিক্‌স্।

১৬ জুন

সেজমামা তাঁর বন্ধু দুজনেই চলে গেছেন। স্বাভাবিক জীবন বোধ এসেছে আমার। কাব্যিয়ানা গেছে কমে। শিশিরের কাছেই

শুধু যাইনে, অশোকার কাছেও যাই। আমার দুঃখের ধারায় অশোকা তার অভিমান দিয়েছে ভাসিয়ে। সদলেও ভ্রমণ করি। শেষ রাতে জাগি, লিখি। লিখতে লিখতে সকাল। বেলা ন'টা থেকে এগারো দু'ঘণ্টা নতুন কাজে নিযুক্ত আছি। দাদামশাই হোমিওপ্যাথী ডাক্তার বসিয়েছেন বাড়িতে। আশপাশের গ্রাম তো বটেই, দূর-দূরান্তর থেকেও গোরুর গাড়ি করে আসছে রুগীরা। ডাক্তার, ওষুধ, পথ্য সব বিনামূল্যে। ডাক্তারের সহায়িকা আমি নাক্সভমিকা ক্যালিকার্ব, ক্যালকেরিয়া কার্বের, ক্যালিফসের পুরিয়া বানাই। নিরক্ষর মানুষগুলিকে একদাঁড়ি, দুইদাঁড়ি, তিনদাঁড়ির চিহ্নে বুঝিয়ে দিই ব্যবহার-বিধি।

এখানেই প্রথম দেখলাম অগণিত মানুষের অপরিসীম দারিদ্র্য। হাওড়ায় যাদের দেখেছি, যাদের মধ্যেই এলো আমার কৈশোর-যৌবন, তারা নিম্নবিত্ত। বিত্তহীন নয়। তাদের ভাষা, ভাবনা, কল্পনা, আমি চিনি। দেওঘরবাসী বাঙালীরা, অর্থস্বাচ্ছন্দ্যে, শিক্ষায়, জীবনযাত্রার সমৃদ্ধভঙ্গীতে সাবলীল। এদেরও আমি চিনি। আমার ছোটবেলায় দাদামশায়ের বাড়িতে এদের আমি দেখেছি। শুধু চিনিই না, এরা যেন আমার অনেক কাছের মানুষ। এদের ভাবনারা, চিন্তারা, কল্পনারা। কিন্তু, এই-যে কাহার, কাদর, কূর্মী, সাঁওতাল এদের ভাষাই শুধু ভিন্ন নয়, ভঙ্গী ভিন্ন—জীবন-স্বরূপই ভিন্ন। এদের ভাবনা, কল্পনা, কামনা, ইচ্ছার সঙ্গে আমার একান্তই অপরিচয়। যারা আড়াই টাকা মণ চালেও ফ্যান খুঁজে মরে হাড়ভাঙা খাটুনির পরেও—সেই মানুষ গুলিকে আমি চিনিনা। অথচ এরাই দেশের আদিবাসী, এরাই অসংখ্য।

অপরিসীম দারিদ্র্যের পটে, অশিক্ষায় অনাদরে, একটি মৌন-মূক-জীবনে দাঁড়িয়ে, যেমন দাঁড়িয়ে শাল, বকাইন, ইউকালিপটাস, মহুয়া, পলাশ নীল আকাশের নিচে। কে যেন আঁকিয়া গেছে। কিন্তু, এই আঁকা সত্য হতে পারে না। এরা অরণ্য নয়,—মানুষ। এই নীরব-মৌন মানুষগুলিকে চিনে নিতে আমার বুকের মধ্যে একটি আকাঙ্ক্ষা

জন্ম নিচ্ছে। আমি জানি, বাইরে যতই ভীরু মৌন হোক্, এদের মধ্যেও আছো মুখরতা। হয়তো স্তিমিত, মৌন, তবু পাথর-চাপা এক মুখরতা।

আমাদের মালীবৌকে পর্যবেক্ষণ করছি, জীবন্ত মেয়েটি। প্রয়োজনে রুখে দাঁড়ায়, যদিও মরদের কাছে মার খায় তার পরেই। ওকে নিয়ে একটা গল্প লিখেছি। নাম দিয়েছি লছমনীয়া। প্রথম নাম দিয়েছিলাম মৌন-মুখর। কেটে লছমনীয়া করলাম। জানি না, কতখানি আবিষ্কার করলাম আর কতখানি আমার রঙপাত্র থেকে রঙ দিলাম ঢেলে।

২০ জুন

আজ দূরে একটা কাদর পল্লীতে গিয়েছিলাম। প্রচণ্ড গ্রীষ্ম। কুয়োর জল গেছে শুকিয়ে। নোংরা কাদাগোলা জল খেয়ে সকলে পেটের অসুখে ভুগছে। এর পরেই নামবে বর্ষা। তখন শুরু হবে কলেরা। আমার কাজ, এদের বালি বাঁধতে, ফটকিরি দিয়ে জল পরিষ্কার করতে শেখানো। গ্রামটায় ঢুকে 'থ' হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম কতক্ষণ। একটা, দুটো সানকি, মাটির হাঁড়ি, কলসী, দু'একটা ছেঁড়া কাঁথা ছাড়া কিছুই নেই। ভাঙা ঝোপড়ি, তাতেই রান্না-খাওয়া-শোয়া—পাশেই কুকুরকুণ্ডলী পোষা শূয়োরগুলো। শূয়োর পালের সঙ্গে জড়াজড়ি, সরু হাত-পা লিক্‌লিকে—পেট ডাগর কয়েকটা উলঙ্গ নোংরা মাথা ছেলেমেয়ে—প্রথমে তাদেরও শূয়োরই ভেবেছিলাম। আমার মনের মধ্যে একটা ইচ্ছা কাজ করে চলেছিল গোপনে। এদের নিয়ে আমি লিখব। কিন্তু, এদের নিয়ে কিছু লিখি আমার সাধ্য কি? "না" এর অগাধ-রিক্ততায় পূর্ণ একটা মানুষকে আবিষ্কার করব, আমার এমন শক্তি নেই।

সেই যে হাওড়া কাসুন্দের স্যাঁত্‌সেঁতে ডোবাটার ধারে নেমেছিল অপরূপ রক্তসন্ধ্যা, সমুদ্র-শঙ্খরবে, আমি পেয়েছিলাম প্রত্যয় ঈশ্বর-সম্বন্ধীয়। দেখতে পেয়েছিলাম রূপরসের জগতেই অপরূপের দুটি চরণ। নিজেকে স্থিত করতে চেয়েছিলাম সেইখানেই। সংশয় জাগে নি। কিন্তু, যখন হৃদয়ে লাগত দোলা যে আমি শিল্পী, কবি,

প্রেমিক সেই আমি কল্পনা করেছি একটু মধুর-দোসরের। পথ চলছিলাম প্রায় আনন্দেই। জীবনের প্রথম মুগ্ধতার সঙ্গেই ঘনালো মোহভঙ্গ। কয়েকটা দিনের জন্ম-মরণে দুলতে দুলতে, নিজের দুঃখে কাতর এই একান্ত ব্যক্তি বেণু, নৈরাশ্যের গভীরে ডুবে, নিরাশার কালো কালিতে মাখিয়ে বিশ্বকে—দায়ী করেছিলাম ঈশ্বরকেই, বলেছিলাম: বিশ্ববিধানে এ তোমার চরম-নিষ্ঠুরতা।

তারপর শান্ত হলে মন, স্থিরজলে মুখ অবলোকন কালে ভেবেছি—আমি তো আর শিশু নই, তবে কেন এই শিশুর অভিমান? আরো ভেবেছি, ঈশ্বর নিশ্চিত আমার ফরমাস খাটছেন না।

কিন্তু, এই কাদর পল্লীটা, এ-যে কোনো আশ্বাস দেয় না। ক্ষুধার্ত শীর্ণহাতের শিরওঠা বাঁকা বাঁকা আঙুলে আমার স্থিরজল দিল ঘুলিয়ে। আমি বিশ্বাস হারালাম। কেন মানুষের জীবন মনুষ্যজগতের বাইরে? ক্ষুধা এমন একপেশে কেন? কেন শিক্ষার আলো, শিল্পের আলো, নন্দন জগতের আলো পৌঁছয় না সব মানুষের জীবনে? কেন মানুষ কাটায় এমন অবমানুষের জীবন কোন মঙ্গল বিধান-শর্তে?

এই সব প্রশ্নাবলী—এবং করুণাময় জগৎপিতা, জগৎ-প্রেমিক ঈশ্বর—ঈশ্বর এবং সত্য, শিব-সুন্দর—সত্য এবং জ্ঞান অনন্ত, অনন্ত এবং সান্তের পুনঃ পুনঃ প্রশ্নাবলী আমাকে বিচলিত করে চলেছে। বিশ্বাস-হারাচ্ছি আর বিশ্বাস আঁকড়াচ্ছি—দ্বিবিধের মাঝখানে দুলছি দোলকের মতো। আমার ভেতরে এক কান্না। জানিনে, সে কান্না বিশ্বাস-হারানোর জন্মকালেই জন্ম নেয় কিনা?

বিংশশতকের তিনের দশকেও আমার মত সাধারণ মানুষ যে মানুষকে ভালো বাসতে চায় সেও ব্যথিত হয়, বেদনার্ত হয়। শুধুই বেদনার্ত নয় অনেকাংশই বিশ্বাস হারায়। বিশ্বাস হারায় সেই দু'হাজার বছর আগেকার ক্রুশবিদ্ধ এলায়িত বাহু চিরপ্রেমিক মানুষটির মতই, গভীর যন্ত্রণা কাতর যার উক্তি: পিতঃ, কেন আমাকে ত্যাগ করলে।

## সময়ের মুখ

হে সময়, অনাবৃত করো তোমার জ্যোতির্ময় মুখ,
তোমাকে দেখি।

বনানী সময়কে দেখতে পাচ্ছে বহুরূপে, বহুমুখে। ১৯৩৭ সালকেই সে কত না চেহারায় দেখল। দেওঘরে দাদামশায়ের বাড়িতে, প্রতিবেশীদের বাড়িতে তার মুখ লাবণ্য-স্নিগ্ধ, অথচ অল্প দূরের কাহার কাদর গ্রামগুলোতে ভয়ংকর আঁকাবাঁকা। ১৯৩৭এর জুনে হাওড়ায় ফিরল। হাওড়া-কাসুন্দেতে সময় অবরুদ্ধ। তার মনে হয়, যেন দুই পায়ে বেড়ী পরানো। বেশীদিন অবরুদ্ধ থাকল না। প্রতুলচন্দ্র কর্মস্থলে বিরোধহেতু কাজে ইস্তফা দিলেন। ১৯৩৭এর জুলাইতেই কলকাতা।

সেজমামা ফ্ল্যাট নিয়েছেন বালীগঞ্জে। ওরা এলো সে ফ্ল্যাটের আধমাইলের মধ্যেই। বালীগঞ্জ স্টেশন লাগোয়া। এক পা এগোলেই ঝক্‌ঝকে রাসবিহারী অ্যাভেনিউ, এক-পা পিছোলেই কাদা প্যাচপেচে কস্‌বা। একদিকে সময় ছুটছে, অন্যদিকে দ্বিধাগ্রস্ত।

বনানীর বুদ্ধিতে একটা চিন্তা আসে। সময়ের যে মুখ শহরে, নিশ্চিত সেই মুখ নেই মফঃস্বল শহরের গ্রামগঞ্জগুলিতে। ঠিক একমুখ নেই, ইউরোপ, আমেরিকা, এশিয়া, আফ্রিকাতে। ভিন্ন জীবনধারায় সময়ের মুখ ভিন্ন, নানা পত্রপত্রিকা বই এবং স্ব-অভিজ্ঞতাও তাকে এই অভিজ্ঞান দেয়। কিন্তু, এতো সত্য :—

সময়ের মুখের একটি বিশিষ্টতা নিশ্চিত থাকা উচিত। মুখের সব চেহারাগুলি হয়তো এক হবে না কিন্তু সব চেহারাগুলির মধ্যে সেই বিশিষ্ট রূপটিই একান্ত লক্ষ্য হবে। বনানী এখনো ধরে উঠতে পারেনি সেই বিশিষ্ট রূপটিকে। হে সময়, সবিতা সময়, অনাবৃত করো তোমার হিরণ্ময় মুখ।

জ্যোৎস্না সিঁড়ি ভেঙে নেবে দরজার মুখে দাঁড়াল :

—বেণু, যাবি নাকি বেড়াতে ?

—রাত কোর না কিন্তু, জ্যোৎস্না, কাল তোমাদের রাত হয়েছিল। গম্ভীর প্রতুলচন্দ্র।

গলি পার হয়ে একটু হাঁটতেই রাসবিহারী অ্যাভেনিউ।

—মেসোমশাই একটু কন্‌জারভেটিভ।

—সব বাবারাই একটু সংরক্ষণশীল।

—আমার বাবা নন।

—তোরা চিরকাল কলকাতায়। আমরা ছিলাম হাওড়ায়।

—তাতে কি ?

—আমি দেখছি, বাবার ওপর পরিবেশ প্রভাব খুব বেশি। পারিপার্শ্বিক চাপটাকে বাবা এড়াতে পারেন না। আমাদের জায়গাটা ছিল পিছিয়ে পড়া। আমাকে স্কুলে ভর্তি করতেই মায়ের লড়তে হয়েছে। প্রতিবেশীরা খুব আপত্তি তুলেছিল।

—আশ্চর্য। পাড়া, প্রতিবেশী আবার কথা কইবে কিরে ?

—সে যে কলকাতা শহর নয়। এক্তিয়ার আছে বইকি; আমার অসুখে তারাই ডাক্তার ডেকেছে, মাথায় জল দিয়েছে; পাখার হাওয়া করেছে। সেজমামাদের ফ্ল্যাটে বাড়িটার একটা ফ্ল্যাটে একজনের ১০৫° জ্বরের ডিলিরিয়াম্, অন্য ফ্ল্যাটে তারস্বরে বেজে চলেছে রেডিয়ো।

—তা হোক্। তবু কলকাতা কারুর ব্যাপারে নাক গলায় না। সেটা মস্ত সুবিধের। বেণু, তুই একটু ভালোবাসতে শেখ কল্‌কাতাকে।

মার্কেট পার হয়ে ধরল গড়িয়াহাট রোড। বনানী বলল :

—বাবার মধ্যে বেশ একটা স্বতোবিরোধিতা আছে।

—যেমন ? জ্যোৎস্না গম্ভীর। কলকাতার বিরোধিতা ওর অপছন্দ।

—ভাবেন, আমি লেখিকা হবো। শুধু কবিতা বা প্রবন্ধ নয়, গল্প-উপন্যাস লিখব, রীতিমত প্রেমের।

—অন্যটি ? জ্যোৎস্না এখনো স্বল্পবাক্।

—অন্যটি আশংকা। এই বুঝি মেয়ে প্রেমে পড়ল।

হেসে ফেলল জ্যোৎস্না ; ঝরঝরিয়ে উঠল ঝরণার মত :

—চমৎকার বলেছিস। সেদিন আমার মামাত-ভাইয়ের সঙ্গে তোর আলাপ করাচ্ছিলুম, সবেই আলাপ হয়েছে, মেসোমশায় ডেকে নিয়ে গেলেন।

—বাবার ভয় কেন জানিস ?

—ভয় নয়, কন্‌জারভেটিভ মনের রাগ।

—ঠিক্ তা নয়। বাবা ভাবেন প্রেমে মেয়েরা শিকার হয়ে যায় আর পুরুষরা শিকারী। আসলে স্বজাতটাকেই তেমন বিশ্বাস করেন না।

গোলপার্ক পার হচ্ছে, যাবে লেকে। জ্যোৎস্না বনানীর মুখে দৃষ্টিপাত করে, বেণুর মুখে আলোছায়া। জ্যোৎস্না ইচ্ছে করছে বনানী ক্রুদ্ধ হোক, রাগী হোক। নিজের অধিকারকে মুঠো আঁকড়ে আদায় করে নিক্। মেয়েদের অধিকার এবং প্রিয়জনের প্রতি মায়া, হয়তো বাবা-মা এই জাতীয় প্রিয়তম মানুষগুলিকে যাচাই করা যায় না, কোথায় যেন বেধে যাচ্ছে বেণুর। জ্যোৎস্না কিন্তু মেয়ে-পুরুষের মধ্যে মস্ত মোটা রেখা টেনে নিয়েছে। এপারে মেয়েরা অন্যপারে পুরুষ। সেখানে নিজের বাবারও পৃথক সত্তা নেই।

জ্যোৎস্না, সুধাময়ী, শরৎকুমারদের নিচেতলায় ভাড়া এসেছে বেণুরা। দোতলা-তিনতলা জ্যোৎস্নাদের। একমাসেই ঘনবদ্ধ। বেণু-জ্যোৎস্না ; সুধাময়ী-মায়ালতাই বেশী, প্রতুলচন্দ্র শরৎকুমার সৌজন্যসম্মত। সুধাময়ীর সঙ্গে মায়ালতার নিবিড় মিল—দুজনেই কন্যাপ্রেমে মুগ্ধ ; দুজনেই নিজেদের জীবনের অচরিতার্থতার চরিতার্থ প্রতিফলন চান মেয়ের জীবনে। দুজনেরি পড়াশোনা ক্লাস সেভেন। এইটের ওপরে যায়নি, কিন্তু যখনি পেয়েছেন বাইরের বই, পড়েছেন আগ্রহে। যত পড়েছেন তার চেয়েও বেশী অনুভব-বেত্ততা। দুজনেরই রবীন্দ্রসাহিত্যে অগাধ-আস্থা। অমিলও আছে। সুধাময়ীকে স্বস্থান থেকে অগ্রসরের পথে সবসময়ের সঙ্গী শরৎকুমার, পক্ষান্তরে

মায়ালতাকেই টান লাগাতে হয় প্রতুলচন্দ্রকে। স্বামীর সংরক্ষণশীল ভাবধারার সঙ্গে বোঝাপড়াও করতে হয়, কখনো জেতেন, হার মানতেও হয় কখনো। সুধাময়ী হাসিখুশি, চিরকাল স্বগৃহে বাস করলেন, সংসারের কর্ত্রী। মায়ালতা অনেকদিন থাকলেন মা-বাবার আশ্রয়ে, সংসার পরিচালনা করলেন, অথচ কর্ত্রী নন, তাঁর মুখে বেদনার ক্ষীণ ছায়া জড়ানো এখনো।

রোজকার বাজার শরৎকুমার সারলেও সৌখীন মার্কেটিং সুধাময়ীর এক্তিয়ারে। মায়ালতাকেও টেনে নেন। প্রথম যেদিন গেলেন ভয়ে। জানেন, হাটবাজারের বহির্মুখিতা পছন্দ নয় প্রতুলচন্দ্রের। হয়ও নি। কিন্তু, ক্রমধাতস্থ হলেন তিনিও। মধ্যিখানে সবুজ ঘাস ছড়ানো ট্রামপথ, দু'পাশে ফুটপাথ নিয়ে বুকচওড়া রাসবিহারী অ্যাভেনিউ সোজা বালীগঞ্জ স্টেশন থেকে বেরিয়ে রসারোডে এসে মিলেছে। নতুন তৈরী হওয়া এই রাসবিহারী অ্যাভেনিউয়ের দু'পাশে বালীগঞ্জ, নতুন গড়িয়াহাট মার্কেট, লেকমার্কেট, কিছুটা দক্ষিণ অভিমুখ হলে রাসবিহারী ছেড়ে, সবুজ তৃণ-আচ্ছাদিত বিস্তীর্ণ জলরাশি, যার নাম লেক। প্রতুলচন্দ্রও বুঝতে পারছেন, নতুন প্রাণের বালীগঞ্জ, মায়ালতা বেণুর পদক্ষেপ ঠেকানো যাবে না, সুধাময়ী জ্যোৎস্নারা তা হতে দেবেন না।

কোনো এক ছোট বয়সে ট্রামে চড়েছিল বেণু, সে এখন স্বপ্ন। হাওড়া অধ্যায়ে স্কুলবাস ছাড়া সব যাত্রাই ঘোড়ার গাড়িতে। মায়ালতার জীবনে নতুন। প্রথম যেদিন ট্রামে চড়লেন, বেণু ভেবেছিল বেকায়দা হবেন। হাত ধরতে গিয়েছিল, দেননি। বেশ হাতল আঁকড়ে উঠে পড়লেন। বেঞ্চে হাত রেখে রেখে ঠিক বসেছিলেন লেডীজ সিটে: জ্যোৎস্না খুশী, বেণুকে বলেছিল: মাসিমা রিয়াল্ প্রোগ্রেসিভ।

দু'বন্ধুই অভিনিবেশে দেখছে দু'জনকে। বনানী দেখে জ্যোৎস্না যেন মহুয়ার সবলা—দৈবাগত দিনের জন্য দাঁড়িয়ে থাকতে রাজী নয়।

—জানিস আমাকেও খুব বেগ পেতে হয়েছিল। বাবারও বাবা থাকেন।

—ঠাকুর্দা ?

—হাঁ দাদু মারা গেছেন একবছর। খুব ভালো বাসতেন আমাকে। আমার তেরো-চোদ্দ হতেই বেশী দৃষ্টিপাত করতে লাগলেন, একটু বেশী সুরক্ষা। দূরে বাবা-মার সঙ্গেই যেতাম। একটুখানি যেতে হলেই—হিমানীশকে সঙ্গে নাও। আমি তখন প্রায় ষোলো, ক'মাস বাদেই ম্যাট্রিকুলেশন দেব, প্রোটেস্ট করলাম :

—হিমানীশকে সঙ্গে নেব না।

—একা যাবে, দুজনে যেতে দোষ কী ?

—দোষ নেই, আপত্তি।

—কেন ?

—হিমানীশ যখন বেরোয় কই তার সঙ্গে তো পাহারাদার দেন না।

—দিদিন তুমি যে মেয়ে ?

—মেয়েদের অপরাধ ?

—অপরাধ নয় দিদি। তারা ফুল। বড়ো বেশী কোমল, বড়ো বেশী সুন্দর। ঈশ্বরের পায়ে দেবার বস্তু। একটুকুতেই তাদের গায়ে ধুলো দেওয়া যায়, পাতা টেনে ছিঁড়ে দুমড়ে মুচড়ে ফেলা যায় সহজেই।

—দাদু, আমি আপনাদের এই উপমাগুলো মানিনে। উপমা কবিতায় সুন্দর মানালেও—জীবনে সুন্দরও না, সত্যও নয়। আপনারা আমাদের দেবী বলেন, বলছেন ফুল—আমি প্রোটেস্ট করি। আমরা দেবী নই, ফুল নই, আমরা মানবী, মানুষ, হিউম্যান বিং।

দাদু বিস্ফারিত নয়ন। রাগে টক্‌টক্ মুখ, রক্তবর্ণ। সোজাসুজি লড়ায়ে নামলেন। রাখঢাক নেই। উপমা নেই।

—তোমরা দুর্বল, একথা মানতেই হবে। দুটো ছেলে এসে ধরলে রক্ষা আছে ?

—হঠাৎ ধরবে কেন ছেলেরা ?

—বদমাইশ ছেলের অভাব আছে কলকাতায় ?

—সকলেই বদমাশ নয়। পথে ঘাটে সাধারণ সৎ মানুষই ঘোরাফেরা করেন—নিশ্চয়ই তাঁরা অন্যায় দেখলে রুখে দাঁড়াবেন।

দাদু বেকায়দায়। রণক্ষেত্রে কর্ণের রথচক্র ঢুকে গেছে মাটিতে। আমি সময়ের সদ্‌ব্যবহার করলাম :

—পশুশক্তিকে কেন এত ভয় করব দাদু, কেন বিশ্বাস রাখব না মানুষের শুভশক্তিতে ?

দাদু পরাজিত। শুধু বললেন :

—বেশ আর বাধা দেব না। একটু দেখে-শুনে পথ চোলো। চোখ-কান-খোলা রেখে। বুঝলে দিদিন। এখনো পশুশক্তির জোর বেশী। **Satan is more powerful than God.**

হঠাৎ হোহো হাসল জ্যোৎস্না।

—অমন হাসছিস্ যে।

—মজার গল্প আছে একটা। একদিন রাত ন'টা বেজে গেল। মা ছটফট্ করছেন—দাদু দু'তিনবার রাসবিহারীর মুখে এসে ঘুরে গেলেন। শুধু বাবাই বললেন—এসে যাবে, অত ভাবছ কেন তোমরা ? আমি আসতেই দাদু জুতোজোড়া আমার সমুখে রাখলেন :

—আমার দু'গালে জুতো মেরে তবেই ঘরে ঢুকবে।

আমি নিচু হচ্ছি, জুতো কুড়োচ্ছি—বাবা-মা-দাদু-হিমানীশ সব স্থিরচিত্র—অবাক্—কী করতে যাচ্ছি আমি ? জুতো নিয়ে সোজা চলে গেলাম নিজের ঘরে, ওদের স্তম্ভিত চেহারার সমুখ দিয়ে। বেশ কিছুক্ষণ বাদে এনে বসিয়ে দিলাম দাদুর সামনে, বুরুশে ঝাড়া। সবাই হেসে উঠলেন।

বনানীও হেসে ফেলে তাজ্জব। জ্যোৎস্না জ্বলছে রাগে :

—আমাদের লড়াইয়ের ট্যাকটিস স্বাধীনতা-অর্জনের জন্যই অল্প অধীনতা স্বীকার। কিন্তু জানিস এই ট্যাকটিসে আমার গা রি-রি করে।

আমার মন চায়, এই মুহূর্তেই মেয়েদের সব-অধিকার আদায় করে নিই।

"It is not surprising that another movement Sprang to life at this time—the demand that women should we geven to vote, Hither to women were classed with "infants criminals and lunatics, and, though they might he property owners and citizens, had no votes."

"Hither to all the agitation had been carried on by peaceful methods, Such as meetings, processions, petitions. Now organization which used "Violence" was created the women's Social and political union, headed by Mrs Pankfurst. This Society meant primarily to force the women's claims on public attantion.

ব্রিটিশ হিস্ট্রি ওয়ারনার, মার্টিনের। মেয়েরা ভাঙছেন দোকান-পাটের জানালা, নিজেদের শৃঙ্খলিত করে দাঁড়াচ্ছেন হাউস-অব-কমনসের সামনে দর্শক গ্যালারীর সমুখে, করে চলেছেন হাংগার স্ট্রাইক। বনানী দেখে, তাদেরি মধ্যে দাঁড়িয়ে জ্যোৎস্না, মুঠো বেঁধে মুঠি তুলেছে।

—বেণু, তোর মধ্যেও স্বতোবিরোধিতা লক্ষ্য করেছি।

—যেমন ?

—যেমন, মেয়েদের অধিকার বিষয়ে সচেতন ঠিকই, তবু জান লড়িয়ে লড়ে যেতে পারিস্‌নে। তোর মধ্যে ভয়ংকর উইকনেস, প্রায় পরবশ্যতা—বাবার সবকথা শুনব, মাকে দুঃখ দেব না।

—আসল কথা কী জানিস্‌ বাবা-মা তাঁদের জীবনে অনেক দুঃখ পেয়েছেন, আমি আর দুঃখ দিতে কষ্ট পাই।

ম্লানকণ্ঠ বেণুকে খাতির করল না জ্যোৎস্না, বলল :

—এত পরবশ্যতার মাশুল দিতে হবে বেণু। বললে, রাগ করবি, তবু বলব, উপনিষদ পড়তে পড়তে তুই বড্ড বুড়িয়ে গেছিস্।

—বুড়িয়ে গেছি!

তাজ্জব বনানী, আহত। প্রতিবাদ করবে, অবকাশ মিলল না, —একমেয়ে কোথায় স্পয়েল্ট চাইল্ড হবি—এ-চাই, ও-চাই বাহানা করবি, নাছোড়বন্দ, বাবা-মা ত্রস্ত-ব্যস্ত, মধ্যিখানে নিজের কাজ হাসিল করে বেরিয়ে যাবি সিদ্ধহস্ত। তা নয়, দুঃখ দেব না, কষ্ট দেব না।

জ্যোৎস্নার গলা থম্থম্ করছে। তার ব্যঙ্গে ক্ষোভ, এটাই বনানীর অনুভবে এলো। জ্যোৎস্নার ভালোবাসার চেহারাটাই অন্যবিধ। সে চায় বেণুর মধ্যে দৃঢ়বদ্ধ মর্মর যাকে খোদিত করে গড়ে তুলবে অভিযান। ছেনী হাতুড়ীতে প্রস্তর খুদে খুদে—মডার্ন। সুদূরের অভিযান ধুসর রঙ-বিস্তার, গৈরিকের টোন তার পছন্দ নয়। উপনিষদ-দর্শন এসব থাক না পড়ে পঞ্চাশোত্তর বয়সের জন্যে, যখন প্রৌঢ়া হয়ে যাবে। গ্রন্থজগতের অধিবাসীও নয়, স্পষ্টই বলে—আমি তোর বই পাড়ার প্রাণী নইরে। জীবনের একটুকরো কাজ, একশ' বই পড়ার বেশী। তবু যেন মনে হয় জ্যোৎস্নার মধ্যে আছে একদেশদর্শিতা—কম্প্যাসনকে ভাবে ভীরুতা। তাছাড়া বাবা-মাকে এবং তাকেও ভুল বিচার করছে। অসহ্য লাগল। বলবে কি বলবে না—বাবা-মায়ের জীবন কথা, উদ্ঘাটন, তার এক্তিয়ারে নেই যদিও। বনানী জানে, পরচর্চা জ্যোৎস্নার স্বভাব নয়, অসম্ভব ঋজু মেয়ে, তাকে ভালোবাসে বলেই যাচাই করছে তার পরিবেশ।

ঘাসের ওপর বসে, সমুখে জল বনানী উদ্ঘাটন করল আদি কলকাতা ও রাজশাহী পর্ব। মায়ের পিতৃগৃহে পরভৃতিকা জীবন, বাবার অসার্থক জীবন টেনে নিয়ে যাবার অস্তিত্বহীন এক বোধ।

—অথচ জানিস্, বাবা চিরকাল এমন ছিলেন না। শুনেছি, কলেজ-জীবনের প্রথম দিককার দিনগুলোতে তরুণ ব্রাহ্মদের সঙ্গে মেলামেশা করেছেন। বাবার থেকেই ইন্হেরিট করেছি নিরাকারের আকর্ষণ।

—তুই সবসময় দর্শনে চলে যাস্ কেন? সোসও পোলাটক্যাল কনডিশান্‌কে দেখ। ব্রাহ্মরা মেয়ে-পুরুষে মেলামেশার পক্ষপাতী, মেসোমশাই নন।

—সেকথাও ভাবি। আমার মনে হয়, বাবার অসার্থক জীবনটাই এর জন্য দায়ী। সাক্‌সেস্ মানুষকে জোর দেয়। সার্থক হলে ভয় পেতেন না—অনেক বাধা বিঘ্ন ঠেলে এগিয়ে যেতেন।

—হবে। তোর শিল্পীমন, সবটা দেখতে চায়। চারদিকটা ছুঁয়ে ছেনে নিতে চায়। আমি চুজী। আমার সবচেয়ে যা বেশী প্রয়োজন, সেই জরুরী অংশেই হাত দিই। আমার তোর জন্যে ভাবনা হয়। বি এ লিট্‌ল্ সেল্‌ফিস্।

বনানীর মুখ রক্তহীন :

—বন্ধু হয়ে আমাকে সেল্‌ফিস্ হতে বলছিস্?

—বলছি। জ্যোৎস্না অলজ্জ : আরও বলছি, অতীত-বিহার বন্ধ কর বেণু। মেসোমশাই-মাসিমার সেই পর্বগুলো আজ অতীত হয়ে গেছে। বর্তমানে দাঁড়িয়ে আছিস এখন। সময় একটা ফ্যাক্টর, এই সময়ে না ছাড়ালে আর ছাড়াতে পারবিনে।

জ্যোৎস্নার পণ : বনানী যাকে ভাবে সহৃদয় অনুভব অথচ তার মতে অন্তর্দ্বন্দ্বে ভীরুতা সেই ভীরুতাকে খসাবে। আলেয়ার কাছাকাছি এসে বলল : ছবি দেখব।

—বাড়িতে বলে আসিনি, মা-বাবা ভাববেন।

—একটু ভাবলেন বা। আমাদের কলেজে এই ছবি নিয়ে রীতিমত হৈ হৈ হয়ে যাচ্ছে। মিস্ করা যাবে না।

—তা নয়—একটু বলে এলে হয়—মাকে জানিয়ে—বনানীর বিব্রত ভঙ্গীকে উপেক্ষা করল, বলল :

—তারপর মাসিমা জানাবেন মেসোমশায়কে, তিনি বলবেন : মেয়েদের একাকী ছবি দেখা অনুচিত।

মেয়েরা দুজন হলেও তো একলাই।

সন্ধ্যে অনেকক্ষণ উৎরে গিয়ে রাত। ছট্‌ফট্‌ করছেন মায়ালতা, ঘর-বাহির প্রতুলচন্দ্র। সুধাময়ীও কিছু বলতে পারলেন না, শরৎ-কুমার বললেন: দুজন আছে, ভাবনার কিছু নেই। ফিরতেই প্রতুলচন্দ্রের গম্ভীর গলার প্রশ্ন:

—কোথায় গিয়েছিলে? এমন রাত হল কেন?

বেণু জবাব দেবার আগেই কল্‌কল্‌ করে উঠল জ্যোৎস্না:

—মেসোমশাই, একটা ছবি দেখলাম আমরা আলেয়ায়। অপূর্ব।

বনানীর প্রতি ক্রুদ্ধ হওয়া ও ক্রোধপ্রকাশের অধিকার থাকলেও জ্যোৎস্নার প্রতি অসংগত, তাই সংযত গম্ভীরে বললেন: একটা মত নিয়ে যেতে পারতে।

—আগে থেকে জানা ছিল না যে। জলযোগ পার হতেই মস্ত বিজ্ঞাপন: মডার্ন টাইমস। চার্লি চ্যাপলিন, মাথায় ফেল্টের টুপি, মুখে অদ্ভুত হাসি, অদ্বিতীয় সংস্থান দুইপায়ের, হাতে ছড়ি: ভাঁড়ামির ছলেই ছড়ির আঘাত। উঃ কী ছবি। দলে দলে ছুটে চলেছে ভেড়ারা একটা মেষপালকের নির্দেশে; কলের ভোঁ বাজল, অমনি বেরিয়ে পড়ল দলে দলে মজুররা। আশ্চর্য সিমিলি। প্রথমে হাসির রোল উঠল, পরক্ষণেই ভারাল, চিন্তা করলাম আমরা, তারপরেই অবাক। কী অসাধারণ ক্ষমতা। কমিকের মাঝখানেই ডাইনামিক, পরপর ত্রি-স্তরের উন্মোচন। আপনারা কালই ছবিটা দেখে আসুন। আপনি বাবা, মা-মাসিমা। হিমানীশকে নিয়ে আমরাও আর একদিন যাব।

বনানী অবাক্। প্রতুলচন্দ্রকেও রীতিমত বাক্যস্তব্ধ করে রাখল জ্যোৎস্না। যদিও জ্যোৎস্না অপেক্ষা তার পঠনপাঠন অনেক বেশী, কিন্তু অতখানি ঋজুতা তার নেই। গিরিডি বেড়াতে গিয়ে দেখেছিল উশ্রী। সফেন, সবেগ, প্রাণোচ্ছলা। উঁচু থেকে পড়ছে লাফিয়ে নিচে, অনেকখানি অংশ জুড়েই ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিচ্ছে প্রবল প্রাণের জলকণা—সেখানে যা কিছু পড়ছে ধুয়ে মুছে নিয়ে যাচ্ছে নিমেষে।

পচা ভাদ্র, অসহ্য গুমোট। একপশলা বৃষ্টি নামলে বাঁচা যায়। শুকনো কাপড়গুলো তুলে নিচ্ছিল, সুধাময়ী বাইরে থেকে এসে চলতে উঠোন পার হয়ে রকে দাঁড়ালেন। এইখানেই ওপরে যাবার সিঁড়ি:

—বেণু, জানো তো, কবি আসছেন।

—রবীন্দ্রনাথ?

—হ্যাঁ।

—কই জানিনে তো? কোনমতে উচ্চারণ করল:

—সে-কী, কাগজ পড়োনি? কাগজেই তো আছে।

—পড়েছিলাম বর্ষামঙ্গল হবে ছায়া প্রেক্ষাগৃহে। শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীরা করবেন।

—আর মঞ্চের ওপর কেদারায় বসে থাকবেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ, শান্তিনিকেতনের মঞ্চসজ্জায় ওইটিই রেওয়াজ।

একটা কাপড়ে হাত রেখেছিল বনানী, তুলবে, সেখানেই পড়ে আছে হাত নিশ্চল, বুকের মধ্যে দুন্দুভি: রবীন্দ্রনাথ।

—আজকেই বাবার কাছে আর্জি পেশ করো, দেরি হলে টিকিট পাওয়া যাবে না। বলবে, আমরাও যাচ্ছি।

বর্ষামঙ্গলের কথায় হৃদয় নন্দিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ মঞ্চে উপবিষ্ট থাকবেন জেনে হৃদয় নেচে উঠল ময়ূরের মত। যদিও সে রাশ টেনে ধরছে। অতি রোমান্টিকের অহেতু কল্প-বিহার আর যেন না ঘটে তার জীবনে। আর যেন না হয় অতীব মূঢ়। সুমিতার কথা ভাবে। সুমিতাই লক্ষ্য। সেহেতু জ্যোৎস্না তাকে তীব্র আকর্ষণ করলেও তার মনে হয় একদেশদর্শী। বনানী সপ্তসিন্ধুর জলে স্নাত হয়ে দশদিগন্তের রঙে রঙীন হতে চায়—সেক্ষেত্রে রোমান্টিকতার উত্তাল তরঙ্গের সঙ্গেই চাই ক্লাসিকের স্থিরজলে মুখ অবলোকন। জ্যোৎস্না যেন নারী প্রোমিথিয়ুস, নারী স্বাধীনতার আগুনই তার লক্ষ্য। বনানী তাকে শ্রদ্ধা করে। তবু জানে, মাত্র এই পথটিই তার নয়। বাবা ফিরলে তাঁর মত করিয়ে তাঁকে শুদ্ধ টেনে নিয়ে যাবে। হয়তো

মেয়েদের নাচে খুশি হবেন না বাবা। আবার বলাও যায় না—পরিবর্তিত হতেও পারে সুন্দর পরিবেশে, চাই কি মেয়েদের নাচের অর্থটাই বদলে যেতে পারে বাবার চোখে।

বাবা ফেরবার আগেই সেজমামা :

—বেণু, বর্ষামঙ্গল দেখবি ?

—ইচ্ছে তো খুব। বাবা আসুন, টিকিটের কথা বলতে হবে।

—বলতে হবে না, টিকিট হয়ে গেছে। আমাদের সঙ্গেই হয়েছে—তুই, মেজদি, জামাইবাবু।

বেণু হেসে ফেলল :

—বাবার মত না নিয়েই তাঁর টিকিট কাটলে ?

—মতের দরকার কীরে ? ভালো জিনিস। ও আমি ম্যানেজ করে নেব।

হঠাৎ মনে হল, সেজমামার সঙ্গে জ্যোৎস্নাকে খুব মানায়।

ছায়া প্রেক্ষাগৃহের দুয়ারগুলি একে একে বন্ধ হল। নামল অন্ধকার। সেই অন্ধকারে সেজমামা, তার বন্ধু, বাবা-মা, জ্যোৎস্না-মেসোমশাই, মাসিমা, হিমানীশ গেল হারিয়ে। তার সম্মুখে ফুটে উঠল কেদারা। সিংহাসনের আসন। আসীন রবীন্দ্রনাথ। বেণু কিছু ভাবতে পারল না—নির্ভাবনার জলরাশিতে একটি উন্মোচন হল নিঃশব্দে—"বড়ো বিস্ময় লাগে।"

ফেরবার পথে সকলেরই সংক্ষিপ্ত মন্তব্য। কেউ শ্রীমতী ঠাকুরের নাচের, কেউ অমিয়া ঠাকুরের গানের, কেউ উমা বসুর, আর প্রায় একযোগে কবিকণ্ঠের কবিতা আবৃত্তির সঙ্গে শান্তিদেব ঘোষের নাচের। সব মন্তব্যই মুগ্ধতার। কিন্তু, সেই যে ট্রামে লেডীজ সীটে জ্যোৎস্নার পাশে বসে আছে বেণু, একটি উক্তি করেনি। জ্যোৎস্না বনানীর মুখে দৃষ্টিপাত করল, খেয়াল করল তার চিত্ত উধাও। এই ট্রামবাস-মুখরিত কলকাতায় উপস্থিত তার চিত্ত লগ্ন হয়ে নেই। হয়তো বা উধাও না-দেখা শান্তিনিকেতনই।

কথনো কোনো ভাব, অনুভাবেরা মুখে বাসা বেঁধে তারপর চলে যায় গভীরে, কখনো গভীর থেকে আবেগরা উঠে তরঙ্গিত হয় দেহে। বনানীর ভিতরে মিশ্রক্রিয়া। রবীন্দ্রনাথ স্থিরজলে চলে গেলেন গভীরে—আর বর্ষামঙ্গল উঠে এলো বনানীর মুখে সর্বদেহে। চল্ছে, ফিরছে, কাজ করছে, জলছলোছলো ভাব। ইচ্ছে করছে পদক্ষেপে আসুক হংসভঙ্গী, হাতের আন্দোলনে ডানামেলা। গলায় গুনগুন গান লেগে গেল অনেকদিনের পরে।

"আমি তখন ছিলেম মগন, গহন ঘুমের ঘোরে"

ও বেণু, তুমি যে আবার রোমান্টিকের কল্পবিহারেই পাখা মেললে।

এমন সময় মণিমাসি। দেওঘর যাবেন, দুদিনের জন্যে বুড়ি ছোঁয়া কলকাতা। উঠেছেন মায়ালতার কাছেই।

—দূর দূর, ওটা আবার ফ্ল্যাট নাকি? ব্যাচিলরস্ কোয়ার্টাস্ মানেই লক্ষ্মী ছাড়াদের আস্তানা।

বেণুকে দেখে খুব খুশি :

—বাঃ বেণু, বেশ দেখতে হয়েছিস্ তো? ছলছলিয়ে বেড়াচ্ছিস্। শোনো মায়াদি, বেণুর বিয়ে দাও, এই ঠিক সময়। চমৎকার দেখাচ্ছে।

—কী-যে ভালো দেখলি জানিনে। কত রোগা হয়ে আছে বলতো?

মায়ালতা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

—মেয়ে তোমার খুব লম্বা নয়, তেমন হিরুষ্টু-পুরুষ্টু হলে গিন্নী বান্নী হয়ে যাবে যে গো।

—তা নয়। পরস্পর তিনবার ব্রঙ্কোনিমুনিয়া। শীতকাল এলেই জ্বর-কাশি।

—কলকাতা থেকে ওকে সরাও।

—তাইতো দু'বার দেওঘর পাঠালাম শীতকালে।

—তুমি বড়ো বোকা মায়াদি। একটা বরাবরের জায়গা স্থির করে দাও। চিরকাল তোমরা থাকবে না। ওর একটা ভাইও নেই।

মায়ালতা নীরব। বিবাহ-সম্পর্কে সাধারণ মায়েদের মত তাঁর

আগ্রহ নেই। বরং বিমুখতাই। তবু মাঝে মাঝে তাঁরও মনে হয় একথা।

—আমার এক মামাত দেওর আছে জব্বলপুরে। কলেজে ইংরেজীর লেকচারার হয়েছে। বেণুর সঙ্গে চমৎকার মানাবে।

— শুনেছি, ওঁরা বড়লোক, আমাদের সঙ্গে মানাবে কেন?

—মানিয়ে বিয়ে দিতে গেলে মেয়ে তোমার বাঁচবে না মেজদি, রাঁধতে, কাপড় ঠ্যাঙাতেই দিন চলে যাবে, সাহিত্য করবে কখন? তাছাড়া আপত্তি কেন তোমার? প্রবাসী বাঙালী, দাবী-দাওয়া থাকবে না।

—তুই তো জানিস মণি, আমাদের কোনো সঞ্চয় নেই। একটু সাজিয়ে দিতেও পারব না।

—তুমি একলা নও, আমরাও আছি। কিছু কিছু সাহায্য করব সকলেই। তারপর কিছু ধার করো, একটাই তো মেয়ে।

অসহ্য তোলপাড় বনানীর। সব লাবণ্য খসে গিয়ে শুষ্ক:

—না মণিমাসি, বাবা-মাকে ধারদেনা করতে দেব না। তাছাড়া সকলের কাছে হাতপাতা, ভাবতেও পারছিনে এই অসম্মান।

—ওরে বাস্‌রে—মণিমাসি একেবারে ফোঁস করে উঠল:

—মেয়ে যেন একলা বাপ-মায়েরি—আমরা কেউ নই, সব বানের জলে ভেসে এসেছি।

শেষের দিকে গলা ভেঙে এল মণিমালার, দু'চোখের কোলে জল। বনানী একেবারে গলা জড়িয়ে ধরল

—ছোটমাসি, বিশ্বাস করো, আমি তোমাকে একটুও দুঃখ দিতে চাইনি। কত দুঃখের মধ্য দিয়ে বাবা-মা গেছেন, সে তো তুমি জানো।

—সেইজন্যই চাই, তুই যেন অমন দুঃখ কখনো না পাস। মণিমালা একেবারে জল। আবার স্বরূপে এসেছেন:

—আমি আগেই ওদের কাছে কথা পেড়েছি, ভূমিকাও ফেঁদেছি, চমৎকার রবীন্দ্রসংগীত গায়, কাগজে গল্প-কবিতা লেখে। দেওরের সাহিত্য-বাই আছে। দেখিস্ টাকাকড়ি লাগবে না।

বনানী আবার চঞ্চল। তার লেখা তার গান কি যৌতুক? পণ্য তারা? কিন্তু, মণিমাসিকে আঘাত দেবে না। নীরব বনানীর চঞ্চলতা দমনকে মণিমাসি ভাবল কিশোরীর লজ্জা: খুশির গলায় বলল:

—আজই চিঠি লিখছি আমি।

খুব স্নিগ্ধ কণ্ঠেই বনানী প্রতিবাদ জানাল:

—না মণিমাসি।

—না মানে? মণিমালা আকাশ থেকে পড়লেন।

—আমি অপরিচিত কারুর সামনে বেরুব না।

—এত পর্দানশীন জেনানা হলি কবে থেকে? লেখিকা হচ্ছিস।

ইতস্তত করছে, বলবে কিনা? কণ্ঠ নম্র রাখল:

—ছোটমাসি, আমাকে দেখে কেউ পছন্দ করবে কি করবে না; এমন অধিকার আমি কাউকে দেব না।

কিছুক্ষণের মত স্তব্ধতা। মণিমালা অস্ফুট উক্তি করলেন:

—এই নিয়ম। আমাদের সকলেরি এমনি করে হয়েছে।

—আমার বেলায় নিয়ম মাফিক নাই হল।

বনানী স্নিগ্ধ হাসল। আবার ফিরে এসেছে তার স্নাতভাব, ছলোছলো লাবণ্য। মণিমালাও উজ্জ্বল, কৌটা খুলে পানের খিলি মুখে দিলেন, একটু বেনারসী জর্দা:

—তাই বল্, প্রেমে পড়েছিস্। ছোকরা কে রে, কিশোরের বন্ধু নীরদ নয় তো?

চমকালো বনানী। জীবনে প্রথম আনন্দ-বেদনায় যাকে রচেছিল, সেজমামার বন্ধুই। পরবর্তীকালে বনানী সাবধানী। তাঁর বন্ধু নীরদের সঙ্গে দু'চারটে কথাবার্তা বললেও কল্পবিহারে মাতেনি। এই মুহূর্ত পর্যন্ত কিছুই নেই। মণিমাসি বললেন:

—নীরদ ব্রাহ্ম ছেলে, জামাইবাবুও গোঁড়া হিন্দু-নন, আর তুই তো ভেতরে ভেতরে ব্রাহ্মই আছিস্। আজ রাত্তিরেই ছেলেটার সঙ্গে আলাপ করতে হবে।

—মণিমাসি, ছেলেমানুষী কোর না, আমি নীরদবাবুর প্রেমে পড়িনি।

—তাহলে ?

—বারে, এখন থেকেই সম্ভাবনাটা নষ্ট করব কেন ? ভবিষ্যতে পড়তে তো পারি কারুর প্রেমে।

১৯৩৮ সাল এলো বাঙলার দুঃখ বহন করে। জানুয়ারীতেই। বেশীদিন নয়, এই সেদিন জয়ন্তী উৎসব হয়ে গেল শরৎচন্দ্রের আশ্বিনের শরৎকালে—দেড় বছরও কাটল না, ২রা মাঘেই তিরোধান। ঠিক্ প্রস্তুত ছিল না কেউ, এমন তো বয়স হয়নি ; তাঁর কাছ থেকে আরো পাবার আকুলতা ছিল। বেণুর বন্ধুমহল, পরিচিত জনেরা দুঃখের ভারে অবনত। বাড়িতে বাবা, মেসোমশাই, এমনকি হিমানীশের মুখও ম্লান। অমন হাসিখুশি সুধাময়ী তাঁর চোখ মায়ালতার চোখের মতই আরক্ত-কাতর। দুজনেই খুব কেঁদেছেন জ্যোৎস্নার গলা থমথম করছে:

—একজন সত্যিকারের নারীদরদী চলে গেলেন।

স্তব্ধ বনানী। স্তব্ধতা ভেঙে জ্যোৎস্না বলল :

—বেণু, আমরা সব বন্ধুরা মিলে শনিবারটায় শরৎবাবুর প্রতি শ্রদ্ধা জানাব। তুই কিছু লেখ, লতিকা, বেলা, বাণীকেও বলব। আমি লিখব না, মুখে মুখেই বলব অভয়াকে নিয়ে, : শরৎ সাহিত্যে বিদ্রোহিণী।

বেণু বলল : বেশ তো, জানা সকলকে।

বনানীর অনেকদিনের পরে মনে পড়ল সুরমাকে। সুরমা এখন পাটনায়। সপ্তাহে দুখানা চিঠির দিন কবে শেষ হয়ে গেছে। দু'তিন মাসে একখানার পর ঠেকেছে নববর্ষ ও বিজয়ায়। অবশ্য একটা দিনে এখনো ভুল হয় না, দুজনেরি জন্মদিনে দুজনের হাতে পৌছয় চিঠি। তার মনে হল, সুরমার বেদনার্ত মনকে একটি সান্ত্বন-স্পর্শ দেওয়া জরুরী। শরৎচন্দ্রকে রমা ততখানিই ভালোবাসে, শ্রদ্ধা করে, আপন

বলে জানে—সে যেমন রবীন্দ্রনাথকে। অনেকদিনের পরে বুকের ভেতর থেকে একটা ভালবাসার চিঠি লিখল।

—বেণু, চণ্ডালিকা দেখবি? আসছে কলকাতায়।

বনানী অবাক প্রতুলচন্দ্রের দিকে তাকিয়ে। মূঢ়বৎ বলল:

—বাবা, নৃত্যনাট্যের কথা বলছ?

—হ্যাঁ, চণ্ডালিকা তো নৃত্যনাট্যই। বর্ষামঙ্গল খুব ভালো লেগেছিল।

আশ্চর্য প্রতুলচন্দ্রের পরিবর্তন। তাঁর সঙ্গীতপ্রীতি বনানীর জানা। ভালোবাসেন রবীন্দ্রনাথের বিলম্বিত লয়ের গানগুলি। আজ তাঁর কাছে নাচের অর্থও গেছে বদলে—তাকে দেহের সঙ্গীতরূপেই অনুভব করেছেন, দেহের ভারটাকে উড়িয়ে দেওয়া, নাচের ডানায়—আঃ কী আনন্দ। খুশি বনানী ঝর্ণার মত কল্লোল তুলল:

—নিশ্চয় যাব। আমি, তুমি, মা। জ্যোৎস্নাদেরও খবর দেব।

মণিমালা আবার এলেন ১৯৩৯ সালে দেওঘর যাবার পথে। তাঁর গলায় আক্ষেপ:

—তুই রাজী হলিনে বেণু, কী চমৎকার জায়গা জবলপুর। দেওঘরের চেয়েও ভালো। মহানিম, মহাবট, বিরাট বিরাট ইউকালিপটাস্, বকাইনে ঘনছায়া করে আছে। চারদিকে অসংখ্য টিলা। নর্মদা বয়ে চলেছে। কালিদাস নর্মদাকেই বলেছেন রেবা।

—তুমি আজকাল সংস্কৃত কাব্য পড়ছ নাকি, ছোটমাসি?

—পড়ছিই তো। যখন মেঘ নামে না, অপূর্ব, দেখতে হয়। রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয় জবলপুর দেখেই লিখেছিলেন:

"সেদিন এমনি মেঘের ঘনঘটা রেবানদীর তীরে।"

কী জানি, লাইনটা ঠিক বললাম না ভুল বললাম।

—ওরে বাসরে। তুমি একটা থীসিস লেখো: জবলপুর-নিসর্গ ও কাব্য সম্ভাবনা।

—নাই বা লিখলাম। বলতে দোষ কী? জবলপুরে থাকলে তোর কবিতা আরো সুন্দর হয়ে যেত, নাম হয়ে যেত তোর।

বনানী খুব হাসল :—কিন্তু, মণিমাসি বাঙলা সাহিত্যের নামী কবিরা জবলপুরে থাকেন না, কলকাতাতেই থাকেন। কেউ এসেছেন ঢাকা থেকে, কেউ বরিশাল, কেউ বা হুগলী। জীবনানন্দেরও নদী আছে, ধানসিড়ি নদী, ভালোনাম ধনশ্রী।

—আচ্ছা বাপু, আর বলব না। কিন্তু, জবলপুরে থাকলে ত্রিপুরী কংগ্রেসের টিলাটা দেখতিস্। শহর থেকে অনেকদূর গিয়ে এক গাঁ, নীচেই বয়ে চলেছে নর্মদা, ওপরে টিলা, সেই টিলাতেই অধিবেশন হয়েছিল।

—মণিমাসি, ত্রিপুরী কংগ্রেসের কথা বলতে তোমার মন কেমন করছে না?

—তা আর করছে না। আমরা সবাই ভেবেছিলাম, সুভাষচন্দ্রই আমাদের বাঙলাকে আর একদিকে বড়ো করে তুলবেন। যেমন করেছেন রবীন্দ্রনাথ, জগদীশ বসু, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র। ভারতবর্ষ আর একবার চেয়ে দেখবে আমাদের।

মণিমালা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, তাঁর সেই উৎসাহী ভাব নেই। স্তিমিত কণ্ঠ :

—বেণু, তোর মনে পড়ে, রাজশাহীতে এসেছিলেন আমাদের বাড়ি। অবশ্য তখন ছোট ছিলি।

—খুব মনে আছে, দাদামশায়কে দেখতে এসেছিলেন! তোমার সঙ্গে গলা মিলিয়ে আমিও গাইলাম :

এসো হে এসো, সুভাষচন্দ্র এসো।

—সত্যি, কেন যে এমন হল? কেন-যে গান্ধীজী বললেন : সীতারামিয়ার হার আমার হার—বুঝতেই পারলাম না।

—পলিটিক্স্ আমিও খুব ভালো বুঝিনে মণিমাসি। আমার এক কলেজ বন্ধু আছে নিরুপমা, সে বোঝে। বুঝতে চায়।

সে বলে: সুভাষচন্দ্র সংগ্রামী বামপন্থীদের এক হওয়ায় বিশ্বাস রাখতেন—তাই তাঁকে সরে যেতে হল।

আশ্চর্য এই সাল ১৯৩৯। ৭ই মার্চ ত্রিপুরী কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্রের জয় হল। তবু সরে যেতে হল জয়ী মানুষটিকেও। তাঁর এই সরে যাওয়া অনেক মানুষকে বিচলিত করেছিল বাঙালী-অবাঙালী নির্বিশেষে। এমনকি রবীন্দ্রনাথও হয়েছিলেন বিচলিত। বিচলিত, ব্যথিত চিত্ত।

আশ্চর্য এই সাল ১৯৩৯। জার্মেনী ১লা সেপ্টেম্বর ঝাঁপিয়ে পোলাণ্ড আক্রমণ করল যুদ্ধ ঘোষণা না করেই। ৩রা সেপ্টেম্বর ব্রিটেন ও ফ্রান্স একযোগে যুদ্ধ ঘোষণা করল জার্মেনীর বিরুদ্ধে। ৩রা সেপ্টেম্বরেই "ডিফেন্স অব ইণ্ডিয়া অর্ডিনান্স" পাস হল পার্লামেন্টে। ইংরেজের আত্মরক্ষাই ভারতের আত্মরক্ষা। অতএব যুদ্ধের দায় ভারতবর্ষেরও। কিন্তু, ভারতের মানুষ যুদ্ধে জড়াতে নারাজ। ১৪ই সেপ্টেম্বর কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ঘোষণা করলেন—এ যুদ্ধে তারা সহযোগিতা করবেন না। প্রশ্ন তুললেন "Do they include the elimination of imperialism and the treatment of India as a free nation……? ২রা অক্টোবর বোম্বাইয়ের হাজার হাজার শ্রমিকের যুদ্ধের বিরুদ্ধে একদিনের ধর্মঘট পালন করলেন। কলকাতাতেও চলছে যুদ্ধ বিরোধী আন্দোলন। মীটিং, মিছিল, হরতাল, ধর্মঘট।

বনানীরা ফিরছে সুভাষ বসুর মীটিং থেকে। জ্যোৎস্না বলল:

—এরকম জোরালো বক্তৃতা আমি শুনিনি।

—ঠিক্ বলেছিস্। প্রত্যেকটি কথা যেন আগুনের শিখা।

লতিকার মন্তব্যে বনানী বলল:

—খুব ছোটবেলায় রাজশাহীতে ওঁর বক্তৃতা শুনেছি। ধীর, শান্ত। ভাবাই যায় না এই পরিবর্তন।

—কে জানে, হয়তো আমরা এখনো ভাবতে পারছিনে আরো কী পরিবর্তন হবে ওঁর।

উৎসাহে বেলা বলে উঠল। নিরুপমা ছিল চুপ করে, বলল:

—আমাদের পার্টিলাইনও এই। এই যুদ্ধে একটি মানুষ নয়, একটিও পয়সা নয়।

সময় জড়িয়েছে যুদ্ধে। শুধু ইউরোপ নয়। ভারতবর্ষের মানুষের মুখেও এককথা "যুদ্ধ"। সকালে উঠেই কাগজের হেডিং, রেডিয়োর নব ঘুরোনো, কোনো পান দোকানের সামনে ছোটখাট জনতা: প্রচণ্ড গতিতে এগিয়ে চলেছে নাৎসী বাহিনী, ঝটিকা বাহিনী অদম্য—ছুটছে দুর্বার বেগে। পোলাণ্ড চূর্ণ-বিচূর্ণ। ইহুদী-নির্ধন-যজ্ঞ চলছে। ন্যক্কারজনক ঘৃণায় পোলাণ্ডের মানুষ, ফ্রান্সের মানুষ দেখছে হিটলারকে। অথচ ভারতবর্ষের বহু মানুষ সেই ঘৃণা নিয়ে দেখলেও সকলেই দেখেন নি। অনেকেই দেখেছেন সম্ভ্রমে। ব্রিটিশ বৈরাগ্যই এই সম্ভ্রমের জন্ম দিয়েছিল। এমন যে কিশোরচন্দ্র তাঁরও বক্তব্য:

—হিটলায়ের মত নায়ক পেলে আমরা স্বাধীন হয়ে যেতাম।

শরৎকুমার, প্রতুলচন্দ্র দুজনেরি অভিমত:

দুর্বল দেশে জোরালো ডিক্‌টেটর জরুরী।

অনেক গল্প রচিত হয়ে গেছে মুখে মুখেই। অবিবাহিত হিটলার, নিরামিষাশী। মদ স্পর্শ করেন না। নারী সঙ্গের প্রশ্নই ওঠে না। ব্রহ্মচারী। ইভা ব্রন্‌ তখনো অনুদ্‌ঘাটিত।

দুঃস্বপ্ন। জেগে উঠে এক গেলাস জল খেল বনানী। এক নিঃশ্বাসে। ক্রাইস্টকে ক্রুশে তুলে ঠক্‌ঠক্‌—কারা যেন পুনর্বার বিদ্ধ করছে ঠক্‌ঠক্‌—করতে করতে একখানা হাত উড়ে গেল—পড়ল এক দেশে—একখানা পা নিয়ে টানাটানি। হানাহানি ক্রাইস্টের দেশেই। যিনি বলেছিলেন—পরস্পরকে ভালোবাসো। যে সময় পৃথিবীতে "মাইট ইজ রাইট"—শক্তিই ন্যায় প্রচারিত, সেই প্রচলিত সময় স্রোতের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন—"ভালোবাসো"।

আবার জলের গেলাস আঁকড়ালো বনানী—জল নেই। জলহীন শূন্যে গেলাস হাতে ধরে তার মনে হল: তাঁর সেই ভালোবাসার

কথা উচ্চারণের পর প্রায় দু'হাজার বছর হয়ে এলো—এখনো মানুষ ভালোবাসতে পারল না মানুষকে। ক্রীশ্চান পোলাণ্ডের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে ক্রীশ্চান জার্মেনীর এতটুকু বাধেনি।

ধর্ম ধারণ করছে না। কী ধারণ করবে মানুষকে, শিল্প? শিল্পের পায়েও তো চলেছে বেড়ী পরাবার আয়োজন। পণ্য হয়ে যেতে তার দেরি নেই। বড়ো কষ্ট, ফ্রাসট্রেশন। গ্যেটের দেশ, বীটোভন, ভাগনার, কাণ্ট-হেগেল-মার্কসের দেশই যদি এত বীভৎস হতে পারে—বিশ্বাস ন্যস্ত করবে কোথায়? স্বপ্নে নয়, জাগ্রতেই দেখতে পায়—গোটা জার্মান জাতটাই যেন মস্তিষ্ক খুইয়েছে। খণ্ডিত অংশে উর্দি খাঁকিতে-সবুজে। তার ওপর স্বস্তিকা। সেই খণ্ডিত মানব অংশই ধাবমান ঝটিকা বেগে।

সব কিছু কেয়স, সব বিশৃঙ্খল। রোজ কাগজ খোলো: যুদ্ধধর্ষণ কাহিনী—রোজ রেডিয়োয় কান পাতো: দুঃসংবাদ। জ্যোৎস্না-বনানী লাইব্রেরী থেকে বেরিয়েছে বই নিয়ে—একদল বেকার যুবকের মন্তব্য কানে এলো:—মেয়ে জাতটাকে হিটলারই ঠিক চিনেছেন—ঠেলে পাঠিয়েছেন রান্নাঘরে। এরপর রান্না করবে আর বাচ্চা বিয়োবে—পড়াশোনা কীসের?

জ্যোৎস্না রক্তবর্ণ। প্রতিবাদ করতে যাচ্ছে। বনানী আকর্ষণ করে টেনে নিয়ে এলো। পথ পার হল নীরবে। বাড়ির দরজাতেই নিরুপমা।

—জানিস্, ভাইটা যুদ্ধে চলে গেল।

তখনো থম্থম্ জ্যোৎস্না। পুরুষ জাতটার প্রতিই সহানুভূতি নেই। বনানী বলে উঠল:

—সে কীরে। সেদিনেই যে অসুখ থেকে উঠল।

—বলল, এমন ভুগে মরার চেয়ে যুদ্ধে মরা ভালো। নিজেও ভালো থাকব, তোমাদেরও কিছু পাঠাতে পারব। অসুখ থেকে উঠেই কদিন খুব খেল। বুক ফুলিয়ে ইন্টারভিউ দিয়ে এলো। আমার চেয়ে দেড় বছরের ছোট, সবেই আঠারো হয়েছে।

কঠিন মেয়ে নিরুপমা, জ্যোৎস্না অপেক্ষাও কঠিন। তার গলা ধরে এসেছে, ঠোঁট কাঁপছে, চোখের কোলে জল।

—কবে গেল? এবার জ্যোৎস্নার প্রশ্ন।

—কাল। একটু চুপ করে থেকে বলল: কী করি, বলতো? কিছু ভালো লাগছে না। বাড়িতে টিকতে পারছি না।

জ্যোৎস্না বলল:

—ছবি দেখতে গেলে রাত হয়ে যাবে। তার চেয়ে একটু বেড়িয়ে আসি। বেড়িয়ে তোকে পৌঁছে দিয়ে আমরা ফিরব।

—বেণু, বেড়াতে যাবি? শান্তিনিকেতন।

সব কিছু কেয়স। সব কিছু বিশৃঙ্খল—প্রবল একটা অসুখ ছড়িয়ে পড়ছে। অথচ প্রবল মীড়ের আঘাত সেতারে। ঢেউ উঠল: শান্তিনিকেতন!

—তুমি যাচ্ছ সেজমামা?

—নীরদের কাকা-কাকিমা ওখানকার শিক্ষক-শিক্ষিকা। ওর সঙ্গে যাচ্ছি। ভাবলাম তোকেও সঙ্গে নিই।

—বেশ। নিজের ভাগ্নীটিকে নিচ্ছেন আমাকে বেমালুম বাদ দিয়ে। সব সময় প্রস্তুত জ্যোৎস্না। সেজমামাও অপ্রস্তুত নন।

—এক্ষণি সুধাদির কাছ থেকে পার্মিশান নিয়ে নিচ্ছি।

একজোড়া যুবক, একজোড়া যুবতী নিটোল একটি উপন্যাস রচিত হতে পারত, ট্রাঙ্গল অথবা ট্রাঙ্গল বিহীন মধুর-সমাপনে, এই রকম ছোটখাট ঘটনা নির্ভর হয়েই বাংলা উপন্যাস ঘটতে পারত সেই শুরু যুদ্ধের দিনেও। অথচ কিছুই ঘটল না। যেমন গিয়েছিল তেমনি ফিরল চারজন। অবিদ্ধ। অক্ষত। যা কিছু পরিবর্তন শান্তিনিকেতন ঘিরে। রবীন্দ্রনাথকে ঘিরে।

এই বাঙলাকে বনানীর জানা ছিল না। বীরভূম যেন সাঁওতাল-

পরগনার কাছাকাছি। চৈত্রশেষের শুষ্ক, রুক্ষ রোদ্দুরে, বোলপুরের পথের লাল ধুলো, দেওঘরকে মনে পড়ালো। টান রোদ্দুরে টানা অতখানি পথ ভেঙে দুপুর বারোটায়, গুরুপল্লীর মাটির ঘর। খড়ের চাল, স্নিগ্ধ লাগল তার। স্নান সেরে খাওয়া। বিকেল শুরু হতে না হতেই কাকিমা ওদের নিয়ে বেরিয়েছেন: সঙ্গীতভবনে তখনো গানের, নাচের আওয়াজ, কাকিমা বললেন: রিহার্সাল চলছে। কলাভবন ঘুরিয়ে দেখালেন। বাঁক ঝোলানো সাঁওতাল পরিবার, এই ভাস্কর্যটি সকলেরই মন হরণ করল। মাঠ পার হয়ে আনলেন ওদের: এইটি শ্রীভবন, মেয়েদের হসটেল। দেখল, স্থিতধী, প্রাজ্ঞ বুদ্ধমূর্তি—আর দীর্ঘ সরল বৃক্ষের মতই সরল সুজাতা—মাথায় পায়েস নিয়ে চলছে। হসটেলের সমুখ দিয়ে রান্নাবাড়ি এসে বাঁক নিলো ওরা।

—ছাতিমতলা।

ছাতিম গাছের তলায় একটি সাদা পাথরের বেদী—ডাইনে ছাতিম-তলা, বাঁয়ে জলাধার, কিছুটা এগিয়ে উত্তরায়ণ। সমবেত ওরা পাঁচজন এগিয়ে চলেছে। কাকিমা বললেন:—সামনেই শ্যামলী। আর এই যে পূর্বদিকে দাঁড়িয়ে ছোট্ট দোতলাটি, এর নাম উদীচী।

মৃন্ময়ী শ্যামলীর সংবাদ সকলের জানা। চোখ দেখে মনে হল, যেন বৌদ্ধযুগের এক স্তূপগৃহের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। অজন্তা-চিত্রকলা-সংগ্রহ দেখেছে বনানী, যায়নি অজন্তায়। শান্তিনিকেতনে সব বাড়ির রঙই গৈরিক, শুধু শ্যামলীই কৃষ্ণ—যেন সাঁওতালী মেয়ে। উদীচী নামটা ওকে মাতালো শ্যামলী অপেক্ষা বেশী। কাকিমা বললেন: গুরুদেব উদীচীতেই থাকেন এখন। ছোট বাড়িই ওঁর পছন্দ।

উদীচীর উল্টো দিকেই রাজপ্রাসাদ উদয়ন।

কাকিমা বললেন: অতিথি-অভ্যাগত উদয়নের হলঘরেই হয়। আজ বেশ কিছু অতিথি আছেন। একটা সুখবর দিই। আমরা তোমাদেরও নিয়ে যাবার অনুমতি নিয়েছি।

আর সকলের কী হল জানে না, বনানীর বুকে একটা টান লেগে গেল। উঠল বারান্দায়, তারপর ছোটঘর অপেক্ষাগৃহ। পাটিমোড়া

দেওয়ালে স্নিগ্ধতা। আসন্ন প্রত্যাশায় প্রবেশ করল। বনানী কাউকেই দেখেনি, দেখতে পায়নি, যদিও হলঘরের অনেকখানি অংশেই অনেকজন, সে দেখল : এক আশ্চর্য আগুন। আগুনরঙে জ্বলছে জাফরানী জোব্বা, উন্নত ললাট পুড়ছে অদৃশ্য-আগুনে, তীক্ষ্ণ মরমী চোখে আগুন স্তব্ধ। বনানী হাত জোড় করল বুকের কাছে। সত্তা সংকটের দোলায় দোলায়িত যে বুক, সেই বুকের কাছে।

অনুভব করল তার মাথায় রবীন্দ্রনাথের দক্ষিণ হাত। রোমে রোমে পুলক। উঠে এসে বসতে স্বস্থানে দেখল বেশ কয়েকজন নারী পুরুষ, তাঁরাও অতিথি, ওদের অন্য চারজন ও গৃহকর্ত্রী সকলেই স্নিগ্ধ-সকৌতুক। সবচেয়ে বেশী জ্যোৎস্না—তার চোখেমুখে উচ্ছল-কৌতুক। কাকিমা বললেন গৃহকর্ত্রীকে দেখিয়ে :

—ইনি প্রতিমা ঠাকুর, আমাদের সকলের বৌঠান।

কিছু জলযোগ হল। তখনো ঘোর কাটেনি। খেল, টুকরো তোয়ালেতে হাত ঠোঁট মুছল—সবটাই এক আবেশে।

উত্তরায়ণ দেউড়ী পার হতেই জ্যোৎস্না হাসিতে ফেটে পড়ল।

—এমন হাসছিস কেন পাগলের মত?

—তুমি একটু বেশী সময় নিয়েছিলে প্রণামে।

কাকিমা মৃদু হাসলেন। জ্যোৎস্না বলে উঠল :

—আমি তো ভাবলাম। তুই দীক্ষা নিচ্ছিস। যেমন মুখের চেহারা, তেমনি পায়ে মাথা রাখা।

লজ্জা, লজ্জা। ছিঃ। এমন করে নিজেকে কেন উদ্‌ঘাটিত করল সকলের সামনে? অথচ নিজেকে সে ভাবে সংযমী। দু'একটা কথায়, আলাপনে আর যোগ দিতেও পারল না,—প্রায় নীরব সকলেই। গুরুপল্লীর দিকে এগিয়ে চলেছে। খেলার মাঠ থেকে ছেলেমেয়েরা চলে গেছে—নামছে অন্ধকারের ছায়া। দু'একটি তারা ফুটে উঠছে ঘনিয়ে আসা অন্ধকারে।

আঁধার এলো বলে
তাইত ঘরে উঠল আলো জ্বলে।

বর্ষশেষের উপাসনায় সকলের সঙ্গে বসে ওরাও এই গান শুনল। সকালবেলায় উপাসনায় লাইব্রেরী প্রাঙ্গণে ওরা যোগ দিয়েছিল পাঁচজন—এবার কাকিমা নন। ছিলেন কাকাবাবু। চারদিক থেকে আসছে ছোট বাচ্চারা, ছেলেরা মেয়েরা, বালক-বালিকা-কিশোর-কিশোরী—যুবক-যুবতী, আসছেন শিক্ষক-শিক্ষিকারা—আশ্রয় কর্মীরা। বনানীর অনুভব, চারদিক থেকে ধারাস্রোত বেয়ে নামছে ঝরনা, যেমন নামে পাহাড়ে।

ওঁ পিতা নোহসি, পিতা নো বোধি

গুঞ্জন উঠল মন্ত্রগানের। তারপরের গান :

তোমার সুর শুনায়ে যে ঘুম ভাঙাও

সংশয়ের কাঁটাটা বিদ্ধ হয়ে আছে, ঈশ্বর-প্রত্যয়ে। দেওঘরের সেই কাহার-কাদর-পল্লী ঘুরে বেড়াবার পর থেকেই উত্তরহীন প্রশ্নে। সেই কাঁটাটা ঈষৎ নড়ে গেল। চিরকালের মত গেল, একথা বলতে পারছে না—তাৎক্ষণিকের মত গেল। সমবেত গুঞ্জনে-সুরে-স্নিগ্ধতায়—সকালবেলায় আলোয় ছড়িয়ে পড়ল এক বিশ্বাসের আনন্দ—বিশ্বাস করতে ভালো লাগল। ভালো লাগল স্নিগ্ধ হতে বিশ্বাসে।

রাত্রে কাকিমা বললেন খাবার সময়ে :

—কাল আমাদের দ্বৈত-উৎসব। নববর্ষ-জন্মদিন একসঙ্গে। পঁচিশে বৈশাখ আমরা গুরুদেবকে পাইনে। পাহাড়ের জন্যে ছেড়ে দিতে হয়।

মন্দিরে ঘণ্টা বাজছে। কাকিমা আগে আগে, ওরা চারজন। শালবিথির মধ্যে দিয়ে চলেছে। একটি শালফুলমঞ্জরী ঝরে পড়ল মাথায়, মন্দিরে এসে তাকে রেখে দিল সোপানে। সঙ্গোপনে। মন্দিরের ভেতর ভরা, ভরেছে সোপানাবলী, বাহিরের আঙিনা উপচে থইথই। কাকিমা বললেন :

—সকলেই এসেছেন। শান্তিনিকেতন, শ্রীনিকেতন, আশপাশের

গ্রাম, ভুবনডাঙা, গোয়ালপাড়া, সুরুল। কলকাতা থেকেও অনেকে এসেছেন, তোমাদের মতো।

গুন্‌গুন্‌ হচ্ছিল। থেমে গেল গুঞ্জন। জনসমুদ্র চেয়ে আছে, উন্মুখ মন। উত্তোলিত নয়ন। এসেছেন রবীন্দ্রনাথ, উন্নত শালপ্রাংশুদেহ অনেকটা নত হয়ে এসেছে, তবু কাউকে ধরতে দেননি তাঁর হাত। পদক্ষেপ দ্রুত। জোব্বা নয় পরেছেন গরদের ধুতি-পাঞ্জাবি-চাদর—জন্মদিনের সাজ।

কবিই আচার্য। মন্ত্রপাঠ হল, গান, উপাসনা। তারপর ভাষণ। বনানীর মনে লাগল : তাঁর ভাষণে দুশ্চিন্তার কালো ছায়া। হয়তো দেখছেন রবীন্দ্রবিহীন শান্তিনিকেতন। আজ যে কবিতাখানি, সৃষ্টির আদিযুগে কত কাটাকুটি, কত জোড়া দেওয়া, কত খসিয়ে ফেলা—আজ যে বহুজনের কাছে সুন্দর, হয়তো কাল থাকবে না আর। নিজের সৃষ্টির ভবিষ্যৎ এমন করে দেখতে পাওয়া বড়ো বেদনার—সেই বেদনাবহকেই দেখছেন রবীন্দ্রনাথ—এমন মনে হল তার।

মন্দির শেষে সকলেরই প্রথম প্রণাম রবীন্দ্রনাথকে। কাকিমা আলাপ করালেন—ইনি শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন, শ্রীনন্দলাল বসু—আমাদের সকলের মাষ্টারমশাই, গুরুদয়াল মলিকজী, বিনোদদা, শান্তিদেব, অনিলদা, রাণীদি, মিস্‌ ম্যাজরী সাইক্‌স্‌। প্রণাম-নমস্কারের পালা শেষ হলে আম্রকুঞ্জে শালপাতা বিছিয়ে জলযোগ। সামান্য সেই আয়োজনই বনানীর মনে হল অসামান্য। শালপাতা সমুখে নিয়ে বসতে বসতে কেমন যেন মনে হল তার—সে অতিথি নয়—অভ্যাগত নয়—অনেকদিন ধরে রয়ে গেছে এখানে।

—এবার তোমরা খুব বঞ্চিত হলে, রাতে মালিনী নাটক হবার কথা ছিল, হল না।

—কেন ?

—এণ্ডরুজ মারা গেলেন। গুরুদেব সব বন্ধ করে দিলেন। শুধু গান গাওয়া হবে, আর গুরুদেব নিজে পড়বেন "অরূপরতন।"

—সেও তো একটা অভিজ্ঞতা। বনানীর উক্তি।

—খুব সত্যি। বললেন কাকিমা।

ঝক্‌ঝকে নিকোনো মাটি। মস্ত আলপনা, ফুলপাতা—চিত্রিত কলস। পড়ছেন রবীন্দ্রনাথ, গান গাইছে গানের দল। দু'একটি নাচও হল। অমিত প্রাণশক্তি। পুরো বইটা পড়লেন। মাঝে মাঝে কাশির দমক আসছে। কাশছেন—তবু থামছেন না। আশীবছর বয়স তবু থামছেন না। মনে লগ্ন হল এই কথাটাই। থামছেন না।

পরদিন ট্রেনে চড়েই জ্যোৎস্না বলে উঠল :

—বাব্‌বা, হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। দম বন্ধ হয়ে আসছিল।

—কেন ? বনানী বিস্মিত।

—বড়ো বেশী কবিতা। এমন নির্ভেজাল নিটোল কবিতা বেশীক্ষণ সহ্য করা মুশকিল।

কিশোর বললেন : ছাট্‌স্ রাইট। ইট্ ইজ টু ড্রিমি এণ্ড ট্যু পোয়েটিক। মনে হচ্ছে, একখানা দ্বীপ যেন। এই দ্বীপে যুদ্ধ বাধেনি। দেশ পরাধীন নয়—কোথাও দারিদ্র্যের দুঃখ-লজ্জা নেই। বাস্তবতা বর্জিত। নীরদ হাসলেন : মাত্র তিনদিন দেখলে তোমরা। বেশীদিন থাকলে গদ্যের দেখা পেতে—বাস্তবেরও। কবি বাস্তবতা বর্জিত নন।

কলকাতায় ফিরেও গুঞ্জরণ করছে কথাটা। এখানেই মানায়, এখানেই। ওরা প্রণাম সারল একে একে। কাকিমা সৌজন্য-বিনয়ে বললেন—আবার এসো। শুধু বনানীকে বললেন :

—তোমাকে আমাদের এখানেই মানায়।

বনানীর ইচ্ছের কথা শুনে জ্যোৎস্না বলল :

—মেসোমশাই রাজী হবেন না—শান্তিনিকেতনে কো-এডুকেশন তাছাড়া আমিও বলি—তোর যাওয়া উচিত নয়।

—কেন ? তুই সহপঠনের বিরোধী নোস।

—তুই যদি গান শিখতে, ছবি আঁকতে, বা পড়তে যেতিস আপত্তি করতুম না।

—শিখতেই তো যাব।

—না। তুই যাবি শান্তিনিকেতনের মর্মের মাঝখানে। ওই আম্রকুঞ্জতলে, শালবীথিকায়, মন্দির-সোপানে। সবচেয়ে বেশী রবীন্দ্র-পদতলে।

—তোকে অনেকবার বলেছি, আমার ভেতরে এক অশান্তি। আমার আগেকার শুদ্ধতা আমি হারিয়েছি। ওখানে শান্তি পেয়েছিলাম।

—আমাদের সময়টাই অশান্তির। তুই যদি শান্তি-আকাঙ্ক্ষায় অশান্তি থেকে দূরে সরে, সময়ের থেকে পিছিয়ে, দ্বীপবাসী হোস, থেমে যাবি, হারিয়ে যাবি।

—হারিয়ে যাবো কেন ?

—হারিয়ে যাবিই। সেদিন তোকে দেখেছি মুগ্ধভক্ত।

বনানী : ভক্ত কি ব্যক্তিসত্তাবিহীন ?

জ্যোৎস্না : তা নয় ( ক্ষণকাল ভাবল )। ভক্ত অনেকটা সাধ্বী স্ত্রীর মত—নিজের আত্মবিসর্জনের জন্যেই ব্যগ্র, স্ববিকাশের জন্য—

—উগ্র নয়। মুখের কথা কেড়ে নিয়ে এমন উক্তিতে জ্যোৎস্না রীতিমত ক্রুদ্ধ হল :

—তুই যদি অন্যের মত হতিস। কিছু বলতাম না। তোর ট্যালেন্ট আছে। তুই বলেছিস, রবীন্দ্রনাথ অগ্নিময়—সেই প্রজ্বলিত আগুনে নিজেকে আহুতি দিসনে—এই কথাই বলব।

বনানী হাসল : মিস্টিক হাসি :

—সে আগুন বুঝি ধ্বংসের ? সে আগুন সৃষ্টির।

জ্যোৎস্না : তুই লেখিকা হতে চাস। তোর একটা নিজস্ব আগুন চাই—পার্সোনাল—সে ছোট হোক্ বা বড়ো হোক্। তা না পেলে আমরা তোকে স্বীকৃতি দেব না, কিছুতে না। বন্ধু হলেও না।

জ্যোৎস্না উঠে দাঁড়াল।

১৯৪০ গিয়ে ১৯৪১এর মার্চ-মাস। যুদ্ধের ইমপ্যাক্ট ভারতবর্ষের ওপর, বাঙলার ওপর, কলকাতার ওপর। প্রত্যেকের জীবনেই যুদ্ধ পা ফেলছে। যদিও তা পোলাণ্ড বা ফ্রান্সের মত বারুদ-ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন, রক্তাক্ত, পুতিগন্ধময় নয়। না হলেও, কালো পদক্ষেপ। শকুনিডানায় নামছে কালোবাজার। মায়ালতা বললেন :

—কী যুদ্ধই যেন এলো, জিনিসপত্রের দাম তরতর করে বাড়ছে। সংসার চালাব কি করে, ভেবেই পাচ্ছি না।

সুধাময়ী : সত্যি। রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, উলুখড়ের প্রাণ যায়। আমাদের হয়েছে তাই। কে বলবে, এই যেদিনে আট আনা সের কাটা মাছ কিনেছি গড়িয়াহাট মার্কেটে। কসবা বাজারে গেলেই ছআনা।

জ্যোৎস্না : মা-মাসিমা, প্রথম যুদ্ধের কথা কিছু মনে পড়ে ?

মায়ালতা : তখন ছেলেমানুষ, বিয়েই হয়নি। সংসারের কিছুই বুঝিনে। দরদাম বেড়েছিল কিনা, মনে নেই। শুনেছিলাম, গান্ধীজী বলেছেন, আমরা সাহায্য করব। যুদ্ধ শেষ হলে আমাদের স্বায়ত্ত-শাসন দিতে হবে।

সুধাময়ী : যুদ্ধ শেষ হল। শুনলাম, আমরা স্বায়ত্ত-শাসন পায়নি। অবিশ্যি কাকে বলে স্বায়ত্ত শাসন তখন বুঝতাম না।

মায়ালতা : আমিও না। কতই বা বয়েস তখন। শুধু ভাবতুম গান্ধীজী যখন বলেছেন, তখন বিশেষ কিছু।

নিরুপমা হন্তদন্ত : জানিস ছোড়দার অসুখ, ম্যালেরিয়া, অথচ বাজার থেকে কুইনিন উধাও।

বনানী : উধাও ? কোথায় ?

নিরুপমা : কোথায় আবার ? কালোবাজার। চারদিকে ভুঁই-ফোঁড় কালোবাজারী গজিয়ে উঠছে। মোটা মোটা থাবাওলা হাতগুলোকেই মোটা করছে। সবকিছুর দাম বাড়বে। খাবার-দাবার ওষুধ। ভেবে দেখ ম্যালেরিয়াগ্রস্ত আমাদের দেশ, আর কুইনিন উধাও।

নিরুপমা বরাবর বলে : দেশের ওপর বিশেষণ প্রয়োগ করিস নে। দেশ দেশই।

সোনার বাঙলা শুনলেই সে ক্ষেপে যায়, বলে :

—একটু পা বাড়িয়ে ঘুরে আয় আমার দক্ষিণ-দেশে, তারপর এই সব কাব্য-কথা বলিস্।

সব কিছুর দাম বাড়ছে, অনেক কিছু উধাও। সুধাময়ী-মায়ালতা কয়েক জোড়া শাড়ী-ধুতি কিনে রাখলেন। শুনতে পাচ্ছি, কাপড় পাওয়া দুর্ঘট হবে। ঘরেই কেচে নিতে হবে।

সব কিছুর দাম বাড়ছে। অনেক কিছু উধাও। তাল সামলাতে রেশন, কনট্রোল। লাফিয়ে লাফিয়ে দাম চড়েও, বাজার ছেড়ে জিনিসপত্র নিমেষে কোথায় যাচ্ছে, কে জানে।

নিরুপমা বলে :

—আণ্ডারগ্রাউণ্ড। কালোটাকা ছাড়ো, ঠিক্ বেরিয়ে আসবে।

ওই পাহাড় থেকে সরে এসো। ওই বোধিদ্রুমতল থেকে।

ওই ঘন তপোবন, প্রজ্বলিত অগ্নিময় ভুবন থেকে।

সরে এসো। সরে এসো। সরে এসো।

—বেণু, সাবধান! বন্ধুরা বলে : তোর লেখা ভয়ংকর রবীন্দ্র অনুগামী হচ্ছে।

—চুরি করছি, বলছিস ?

—চুরি না হোক্। কাছাকাছিই বা হবে কেন ?

—আমার চিত্ত রবীন্দ্রচিত্তের কাছাকাছি।

বলত জাঁক করেই। জাঁকটা বাইরের। বন্ধুদের অভিমত তাকে রীতিমত ভাবাচ্ছে। বিচলিত করলেন এক পত্রিকা-সম্পাদক :

—আপনার মেয়ের লেখা ভালো, কিন্তু, বড়ো বেশী রবীন্দ্র-অনুগামী। ওকে বিশিষ্ট হতে বলুন। ওই সোনালী পাহাড় থেকে সরে আসুক।

সরে এসো। সরে এসো। সরে এসো।

সয়ে আসার এক কাহিনী কল্লোল-দলের। আর এক কাহিনী পরিচয়-গ্রুপের। লতিকা পরিচয় গ্রুপের বিবরণ দাখিল করে:

—মামার একবন্ধু পরিচয় সভার সভ্য। তাঁর সঙ্গে দু'একদিন গিয়েছিলেন আসরে। মামা বলেছিলেন: সে কী এক্‌স্‌পীরিয়েন্স যেন নক্ষত্রসভার সম্মুখীন হয়েছি হঠাৎ। ইনটেলেকচুয়ালদের ভিড়। সত্যেন বসু, ধূর্জটি মুখার্জী, হুমায়ূন কবির, সুশোভন সরকার আবুসয়ীদ আইয়ুব, নীরেন রায়, হীরেন মুখার্জী, হিরণ সান্যাল, সুধীন দত্ত, বিষ্ণু দে, সাহেদ-সুরাওয়ার্দি, বসন্ত মল্লিক, তুলসী গোঁসাই—বেশীর ভাগই বিলেত-ফেরত বাঘা বাঘা মানুষ। গিরিজাবাবু, অপূর্ব চন্দ্র, হানফ্রে হাউস। বনানী লুব্ধ হয়। দু'বন্ধুতে পরামর্শ অতঃপর। প্রবেশ অনুমতি পাওয়া যাবে কিনা জানে না—তবু হানা দিল দু'জনে শ্যামবাজারে লতিকার মামাবাড়িতে। দেখা হল না। ফেরবার পথে হাতীবাগানে কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটে দাঁড়ানো একটা বাড়ি দেখালে। অদ্ভুত বাড়িটা। একসার মাটির পুতুল সাজানো। বাড়ি হীরেন্দ্র দত্তর। বড়ছেলে সুধীন্দ্র দত্তের বৈঠকে এই পুতুল বাড়িতেই বেশীর ভাগ বসে পরিচয়ের আসর। একসার বেঁটে মানুষ কুর্তা-পায়জামা পরা মাটির পুতুল, খুব মজা লেগেছিল বনানীর, এখানেই বিদগ্ধ-আলোচনা!

১৯৪১এর এপ্রিল গেল, গেল মে। নববর্ষ গেল, গেল পঁচিশে বৈশাখ। জুনের সকালে কাগজ খুলে সমস্ত ভারতবর্ষ পড়ল মিস্ র‍্যাথ বোনের চিঠির ওপর লেখা রবীন্দ্রনাথের প্রতিবাদী মন্তব্য। বনানীর সব বন্ধুদের মধ্যে আলোচনা। নিরু ঝোঁক দিল যেখানে বলা হয়েছে মাত্র পনেরো বছরে সোভিয়েট রাশিয়ায় শিক্ষাদানের কথা। তার মতে "রাশিয়ার চিঠি"ই রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ রচনা। বন্ধু মহলে নিরুপমার সাহিত্য-বোধ সম্পর্কে প্রচুর পরিহাস ছিল। আজ কেউ পরিহাসের চেষ্টা করল না, মগ্ন হয়ে গেল। জ্যোৎস্না বলল: বেণু যে বলেছিলি, সত্যি, আগুনই বটে। আশীবছর হয়ে গেলো এখনো জ্বলছে। যেন ভলক্যানো।

বৃষ্টি পড়ছিল ঝিরঝির। জ্যোৎস্না, বনানী ভিজে ভিজেই হাঁটছিল। পথে নীরদের সঙ্গে দেখা।

—আপনাদের কাছেই যাচ্ছিলাম। ভাবছিলাম খবরটা দিতে যাই।

বেণু উৎকণ্ঠ : সেজমামার কিছু—

—না না, কিশোর ভালো আছে। কবি এসেছেন জোড়াসাঁকোয়।

—রবীন্দ্রনাথ। বনানী হৃদ্‌স্পন্দন শান্ত করে গোপনে।

—কাকিমারাও এসেছেন। তাঁদের কাছের শুনলাম, কবি খুব অসুস্থ।

—অসুস্থ। বনানীর মুখ সাদা হয়ে গেল।

—প্রথম থেকেই খারাপ ভাবছিস্ কেন?

জ্যোৎস্না সান্ত্বনা দেয়।

—বয়েসটাই যে খারাপ।

আস্তে বলল। এত আস্তে সোনাই গেল না প্রায়।

বনানীরা গেল কাকিমার কাছে। কাকিমারা আসা-যাওয়া করছেন জোড়া সাঁকোয়। ঠিক্ হয়েছে অপারেশন হবে।

শ্রাবণের তেরো। আজ অপারেশন : সারাদিন বনানীর মনে এই চিন্তাই জাগে। তারপর প্রতিদিন সংবাদপত্রে বুলেটিন পাঠ, প্রায় প্রতিদিনই কাকিমার বাড়ি হিন্দুস্থান পার্ক যাতায়াত। কুড়ি, শ্রাবণ থেকে দুঃশ্চিন্তা—দুর্ভাবনায় পৌঁছেছে। বাইশে শ্রাবণ, সূর্য মধ্যগগনে, সমস্ত দুর্ভাবনার জটা গেল এলিয়ে। সমস্ত কলেজ-স্কুল ছুটি হয়ে গেছে। মানুষ নেমে পড়েছে পথে।

বনানী, জ্যোৎস্না, লতিকা, নিরুপমা বার হয়ে পড়ল জোড়াসাঁকোর উদ্দেশে। পারল না, ভিড়ের ধাক্কার ছড়িয়ে ছিটকে, পরে সমবেত; ফিরে এল। সকলেই শোকবিহ্বল—বনানী যেন পুড়ে গেছে। যে জ্যোৎস্না তার ভক্তির প্রাবল্য নিয়ে বিদ্রূপ করেছে বার বার, সেই হাত ধরল, পথ চলতে সাহায্য করল। ঘরে ফিরে বিছানায় পড়ল বনানী।

এতবড় শোক কলকাতা আর প্রত্যক্ষ করেনি কোনোদিনও। সমুদ্রে সমস্ত নগর ডুবেছে শোকের। যাঁরা ঐ সোনালী অগ্নিময় পাহাড় থেকে সরেছিলেন। তাঁরাও উদ্‌ভ্রান্ত। উদ্‌ভ্রান্ত সুধীন্দ্র দত্ত বলেছিলেন : "it is going to make a difference"

রাত্রে প্রতুলচন্দ্র বললেন : বেণুকে খেতে ডাক।

মায়ালতা বললেন : না। থাক্।

শেষরাতে উঠে বেণু লিখল একটুকরো :

দেহ নেই, এ-যে নাস্তি, চিরহাহাকার
দেহই সেতু দেবার এবং নেবার
দেহ নইলে দিতে পারিনে—যে
ভরা হাত শূন্য।

যা লিখছে ছিঁড়ে ফেলছে পরমুহূর্তে। স্ব-রচনার প্রতি এই প্রথম যথার্থ সংশয়। কিছুদিন আগে পর্যন্ত মনে হত তার : সে ভালো লেখে। মিথ্যে বলবে না, শুধু ভালো নয়—ওই যে প্রতিভা নামক শব্দটি, কী যেন ব্যাখ্যা তার, নবনবোন্মেষশালী, সেই নব নব উন্মেষ ঘটে চলেছে। না জেনে, না বুজে, বিশেষ অনুশীলন বা চেষ্টা দ্বারা নয়—যেন আকাশবেয়েই নেমে আসা ঐশ্বরিক শক্তি কোনো—আশ্চর্যের কথা। শিল্প নৈপুণ্যের দরবারে যাকে তান সাধতে হয় না রাগের সর্গমে ; এমন সব প্রলোভিত ধারণা হয়েছিল তার। সেই এগারো বারোতে লেখা শুরু, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ছাপা, কিছু প্রশংসা পেতে পেতে চিত্তে গেঁথে গিয়েছিল ভ্রমাত্মক মায়া।

সময়কে চিনতে পারছে না বনানী। দেখতে পাচ্ছে না সময়ের উজ্জ্বল মুখ। উনিশ বছর বয়স তাকে করছে সংশয়পীড়িত, বিদ্ধ।

বেলা বলে : ব্যাড্ আর ব্যাড্ হয়ে যা বনানী। তখন চমৎকার সব অভিজ্ঞতা হবে। তার চেহারা পড়বে তোর লেখায়। বিষণ্ণতা যদিও এসে পড়েছে তার জীবনে, কিন্তু অশুভের আকর্ষণে এখনো অনীহা।

লেখা, সংশয় আর ছিঁড়ে ফেলা পরমুহূর্তে, উপস্থিত বনানীর এই কার্যলিপি।

ইনটারমীডিয়েটের সহপাঠীরা বিভক্ত। অনার্স বিভিন্ন, কলেজও। রেবার বাংলা, বেলার ইতিহাস, লতিকার ইংরেজী, ইকনমিক্স্ নিরুপমার, জ্যোৎস্নার এম. এর প্রথম বছর। কলেজ বদলে দেখাশোনার সম্ভাবনা গেল কমে। বন্ধুত্ব ভগ্ন হবার কথা। উইল ডুরাণ্ডের উক্তি মিথ্যা প্রমাণিত করেই মেয়েগুলি জানান দিল, বন্ধুত্বে তারা পুরুষ অপেক্ষা কম যায় না। শনিবারের আড্ডা ছিল তাদের মাসিক দু'দিন, তারা স্থির করল অতঃপর চারদিনই জরুরী। জ্যোৎস্নার ঘর আর লতিকার ঘরে অলটার নেটিভ্ আড্ডা। বালীগঞ্জ, পার্কসার্কাস।

কলকাতা শহর অনেক আড্ডা প্রত্যক্ষ করেছে। ভারতীর, সবুজপত্রের, জোড়াসাঁকো বিচিত্রাভবন। তার দক্ষিণের বারান্দার, শনিবারের চিঠির আড্ডা, আড্ডা কল্লোল দলের, পরিচয়-গ্রুপের। সবগুলিই সাহিত্যিক, শিল্পী, ইনটেলেকচুয়ালদের আড্ডা। যদিও উপরিউক্ত কারুরই অনুরূপ নয়, নেহাতই কয়েকটি ছাত্রীর জমায়েত, তবু জীবনতৃষ্ণা অগাধ। বিধিনিষেধের বাঁধন অবশ্য ছিলই। অমন তেজস্বিনী জ্যোৎস্না, তাকেও মেনে নিতে হত রাত এগারটা। বারোটার অধিকার তাদের নেই। রেবা আসত কড়েয়া রোড থেকে, নিরুপমার বাড়ি কস্‌বা। বেশী রাত হলেই রসিক-পুরুষরা সঙ্গ নিত। আর এখন তো কলকাতার বাতিগুলো ঠুলি মুখে এঁটে অন্ধকার।

সময়কে চিনতে চায় বনানী, বুঝতে চায়। রেখাময় অজস্র মুখের মিছিলে কোনটি যথার্থ, জানতে চায়। হঠাৎ মনে হয় অনন্য, আবার অনন্যতা হারিয়ে অন্যসন্ধান। কিন্তু, এখনো পায়নি খুঁজে সময়ের স্বরূপ। হে সময়—সবিতা সময়।

এতদিনেও এমন কিছু তোলপাড় হল না। তার লেখায়—কলেজও টানছে না। একমাত্র বন্ধুগুলিতেই কিছু আনন্দ।

প্রতিদিন ভোরে ঘুম ভাঙবার সময় তার গভীর ইচ্ছা জাগে, আকাঙ্ক্ষা : নতুন কিছু ঘটুক, আশ্চর্য কিছু—দুয়ার খুলুক নতুনের। নিশীথ রাতের অনুভব : দুয়ার রুদ্ধই, খোলেনি। কিছু না হতে পারার ক্লান্তি তার। ক্লাসিক জল অবগাহন যতই সাধন ভাবুক, ভেতরে ভেতরে রোমান্টিক। সে চায় সুদূর, সে চায় নূতন। তার সঙ্গেই মনে হয়, তার আশপাশ, তার দেশ, সমস্ত মানবসমাজ সুন্দর হোক। তবু এও তো ঠিক কথা—অস্তিত্বের একটা ভার আছে, মর্মর সলিডিটি। ও বেণু : তুমি যে পাথরটাকে ডানা করতে চাও, অথচ পারছ না—তাই দুঃখ, তাই ব্যথা। মাইকেল এঞ্জেলো নও তুমি, নও কোনো গ্রীক্ ভাস্কর, নও শিল্পী অজন্তা, খাজুরাহোর। নিজেও সুখী নয়, সুখী করতে পারছেও না কাউকে। অনার্স নেওয়া নিয়েও তিক্ততা। মায়ালতার ইচ্ছে ছিল ইংরাজী। কিশোর দিদির পক্ষে। সুধাময়ীর মত বাংলা, জ্যোৎস্নার রায় ইতিহাস। পিতা এবং অভিভাবক প্রতুলচন্দ্রের কোন অনার্সেই সম্মতি নেই এবং বলতে গেলে কলেজেও। তাঁর গলায় হতাশা :

—সেই এগার, বার, থেকে লিখছিস, এতদিন হয়ে গেল, কবিতা গল্পই লিখে চলেছিস, উপন্যাস কই? উপন্যাস ছাড়া কি লেখিকা হওয়া যায়। অনার্স-ফনার্সে সময় নষ্ট না করে উপন্যাস শুরু কর।

বনানীর ইচ্ছা অনেকাংশে পিতৃ-অভিমুখ। কিন্তু, তার অনুভব, উপন্যাস লেখবার মত বৃহৎ জীবন-উপলব্ধি এখনো হয়নি। অবশ্য লিখতে পারে একখানা বই—সেজমামার সেই বন্ধু, তাঁর প্রেমিকা ও নিজেকে নিয়ে। একটা ট্রাজিডি হ'তে পারে, যদিও তিনজনেই বেঁচে। তবু তিনজনেরি প্রথম-প্রেমের মৃত্যু ঘটেছে যার যার জীবন-অনুভবে। একটা নামও মনে আসে—ওরা তিনজন, প্রেম ও মৃত্যু। নাম ঠিক হলে কী হয়, লেখা হয়ে উঠছে না। শিল্পের জন্য যতখানি সংঘাত প্রয়োজন তা হয়েছে, যতখানি এ্যালিয়েনেশন দরকার, হয়নি। হয়তো আরো কিছুদিন কেটে গেলে পারবে। যেদিন নিজেকেই

দেখতে পারবে অন্য কোনো মানুষ দেখা চোখে। তার নিজের জীবনটাকেই মনে হবে কোনো এক অন্যচরিত্রের জীবন।

কলেজ সম্পর্কে বনানীর নির্মোহতা মায়ালতার জানা।

—অনেক কষ্টে তোকে কলেজে ভর্তি করতে পেরেছি, ওঁর কথা শুনে কলেজ ছাড়বিনে।

উঠতে বসতে মায়ালতা একথা বলেন। বার বার। জ্যোৎস্না দ্বিত্ব করে : মাসিমা ঠিক বলেছেন। খোলা দুনিয়াটায় পা দিয়েছিস্, সরে আসবিনে।

কলেজ ছাড়েনি। অনার্সও নিয়েছে। বিষয় নির্বাচনে সকলেই হতচকিত। আশাভঙ্গে মায়ালতার গলায় প্রায় কান্না :

—ইংরেজী বিশ্বভাষা, সারা দুনিয়া খুলে যেত তোর সামনে। সেই ইংরেজীই নিলিনে।

জ্যোৎস্না তাজ্জব। ইকনমিকস্ না, ইতিহাস নয়, এমনকি সাহিত্যও নয়। তার কণ্ঠেও খেদ :

—নাঃ তোর আর মর্ডান হওয়া হল না। সেই আদ্যিকালের বদ্যিবুড়ি দর্শন। দাদু অনার্স নিয়েছিলেন দর্শনে। জানি বাহির দুনিয়া থেকে চোখ ফিরিয়ে মুখে বই চাপা দিয়েই থাকবি। এমন একটা সময়ে বিচরণ করবি, যার পাস্ট, প্রেজেন্ট, ফিউচার সব একাকার।

তর্ক করতে ইচ্ছে করে না বনানীর। তার মনে হয়, পরিহাস করতে গিয়েও জ্যোৎস্না একটা বড়ো সত্যের উদ্‌ঘাটন করেছে। সময় এক যোগেই অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ। জ্যোৎস্না তার মধ্যেকার বর্তমান অংশটিতেই জোর দেয়। অনেকদিন সে বলেছে : বর্তমানটাই দামী, এই সময়টাতেই আমরা কিছু করতে পারি—অতীত আমাদের হাতে নেই। বেণুর ভাবনা : দর্শন চোখকে খুলে দিতে সাহায্য করে, চোখকে মুদিত করে না। জীবন এবং জীবনের অঙ্গাঙ্গী সাহিত্যে দর্শন জরুরী। দর্শন মানেই পশ্চাদবর্তিতা নয়। সম্প্রতি বার্ট্রাণ্ড রাসেল্ এসেছে তার হাতে। এসেই যুদ্ধ করেছে।

একটা অস্টিন এসে থামল। সুবর্ণ নামল। বনানী তৈরী হচ্ছিল শনিবারের আড্ডার জন্যে, সুবর্ণকে দেখে অবাক্। কতদিন পরে দেখা। দুজনে দুজনকে জড়িয়ে ধরল। তার বিবাহের খবর জানা—দিল্লীবাসী কোনো উচ্চবিত্ত পরিবারের ল'ইয়ারের সঙ্গে। চিঠিও চলে বছরে দু'একবার।

—সু, কী ভালো লাগছে, কী বলব।

ঝলমল করছে সুবর্ণ। চেয়ারে বসতে বসতে বলল :

—বড়ো ননদের বাড়ি এসেছি, দিন বার আরো আছি। ভাবলাম ঠিকানা আছে, খুঁজে বার করতেই হবে।

মায়ালতাকে প্রণাম, বনানীর সঙ্গে কিছুক্ষণ আলাপচারি, জ্যোৎস্নার সঙ্গে পরিচয়—ওঠবার সময় জ্যোৎস্নাকে বলল :

—চলুন না, আপনাদের একটা লিফ্‌ট দিই।

—তার চেয়ে আপনিই চলুন আমাদের আড্ডায়, ভালোই লাগবে।

—সাহিত্য ভালো বাসলেও আমি সাহিত্যিকা নই, যোগ দেব কী করে আপনাদের সঙ্গে ?

—ক্ষেপেছেন। আমরাও সাহিত্যিকা নই, আপনার বন্ধুটি ছাড়া। যা খুশি বলতে পারবেন, যা ইচ্ছে, নেহাতই আড্ডা মারা। ক্বচিৎ, কদাচিত বিষয় নির্বাচন হয়।

—ঠিক আছে। পরের শনিবার আসব। ননদের আবার গাড়ির দরকার হতে পারে।

জ্যোৎস্না-বনানীকে পার্কসার্কাস নামিয়ে দিয়ে সুবর্ণ চলে গেল। পরের শনিবার এসেও সুবর্ণ যেতে পারল না, বলল :

—ননদ আবার কোথায় যাবেন, একটু তাড়াতাড়িই ফিরব।

—ট্যাক্সিতে এলিনে কেন ?

—দেখ ভাই, একে কলকাতা শহর ভালো চিনিনে, বিহার থেকেই দিল্লী—তার ওপর একটু সন্ধ্যে হলেই শহরের চোখে ঠুলি। তাছাড়া—হঠাৎ থেমে গেল সুবর্ণ।

—তাছাড়া ?

—আমার শ্বশুরবাড়িতে মেয়েদের এখনো ট্যাক্সী চড়ার রেওয়াজ হয়নি।

বনানী হেসে ফেলল—সু, তবে তো তোর শ্বশুরবাড়ি আমার যাওয়াই হবে না। আমি ট্রাম বাসের পার্টি। পয়সা কমে গেলে সেকেণ্ড ক্লাস ট্রামেও চড়ি।

সুবর্ণ দমবার পাত্রী নয়—মিছিমিছি আমার শ্বশুরবাড়ি যাবি কেন তুই ? আমি যদি এখানে আসি, বাড়ি করি, তোর মর্যাদা রাখার দায় আমার।

একটু থেমে বলল—রমাদির খবর জানিস্ ?

—রমার চিঠি দু'মাস আগে পেয়েছি।

—কিছু ইংগিত পেয়েছিস্ ?

—ইংগিত, না তো !

—রমাদি প্রেমে পড়েছে।

—প্রেমে পড়েছে, গ্র্যাণ্ড। বনানী উজ্জ্বল।

—গ্র্যাণ্ড কী রে ? পরিস্থিতি জটিল না ? জামাইবাবু এখনো বেঁচে।

—রমার জীবনে সে মৃত। রমার অধিকার আছে সুখী হবার।

—কিন্তু, কী করে ? কেউ কি রাজী হবেন ? পিসিমা, পিসেমশাই, আমার বাবা, ঠাকুমা।

—মাসিমা অন্তত খুশি হবেন রমাকে সুখী দেখলে।

—পিসিমা মনে খুশি হলেও বাইরে এগিয়ে আসতে পারবেন না। জামাইবাবু আছেন আর ডাইভোর্সের আইন নেই আমাদের। এতক্ষণে বনানীর সুবর্ণর কথার যথার্থ্য অনুভব হল।

—সত্যিরে, আমাদের হিন্দুসমাজের মেয়েদের জীবনটা যেন কী। পুরুষরা যথেচ্ছ বিয়ে করতে পারবে—অথচ আমরা সোজা হয়ে একটা সত্যিকারের বিয়ে করব, তারি উপায় নেই।

সুবর্ণ উঠে দাঁড়াল। উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতেই বলল :

—অবশ্য ভদ্রলোক খুব সিরিয়াস্। দেখা যাক্, কী হয়।

—আশ্চর্য! এত কথা বলছি। অথচ ভদ্রলোক কে জিজ্ঞেস করতেই ভুলেছি।

—রমাদির কলেজের ইতিহাসের লেকচারার। সবেই এসেছেন।

—তাই। ওর চিঠিতে একটু প্রশংসাবাণী পেয়েছিলাম ভদ্রলোকের। ইয়ং, প্রাণবন্ত, সুপুরুষ। আমি কিছু ভাবিনি। ভেবেছিলাম সত্যিকারের কিছু হলে রমাই তো আমাকে জানাবে।

সুবর্ণর কানে লাগল বেণুর ম্লান কণ্ঠ। বলল :

—মন খারাপ করিসনে জানায়নি বলে—আমরা বাড়ির লোক বলেই জেনেছি। নিজেই কিছু ঠিক্ করতে পারছে না, পারলে তোকে জানাবে।

সোমবারই সুরমার চিঠি। পরিস্থিতি ব্যক্ত করেছে। বনানী বিবর্ণ। জ্যোৎস্না ঘরে ঢুকে দেখল, বেণু বিমূঢ় একটা চিঠি হাতে নিয়ে।

—কীরে, এমন সাদা দেখাচ্ছে কেন তোকে?

বনানী একটুও ইতঃস্তত না করে চিঠিটা এগিয়ে দিল। পড়তে পড়তে শেষের দিকে এলো জ্যোৎস্না।

"আমাদের কী কন্জারভেটিভ পরিবার তোর জানতে বাকি নেই। অনেকদিনের জমিদারী রক্ত গায়ে—পুরুষদের ব্যভিচার—আর মেয়েরা সব জোর করেই সতীলক্ষ্মী। বাবা, ঠাকুর্দা সকলেই চেয়েছিলেন, আমি ওই স্বামীরই ঘর করি। অত্যাচার সহ্য অনেক মেয়েই করেছেন—আমি অভিজাতীয়া হিন্দুমহিলা আমি করব, এমন কী কথা? তোড়জোড় চলছিল আমাকে সেই নরকে পৌঁছে দেবার। কিন্তু, আমার অমন নরম মা, যিনি একটু জোরে কথা বলতে পারেন না কাউকে, প্রতিবাদ জানালেন। বাবাকে বললেন: আমি বেঁচে থাকতে নয়। ওকে যদি নিয়ে যাও—আমার মৃত দেহের ওপর দিয়েই নিয়ে যেতে হবে। বাবা চুপ করে গেলেন। একটা আশ্চর্য কথা,

বাবার মধ্যে ব্যভিচার ছিল না, তাছাড়া, মাকেও ভালোবাসতেন। আশ্চর্যই বা বলি কেন, বাবা গরীব বাড়ির ছেলে, অপুত্রক ঠাকুর্দা তাঁকে দত্তক নিয়েছিলেন। মায়ের জন্যই বাবা আমার কলেজ মঞ্জুর করেছিলেন; ইতিমধ্যে ঠাকুর্দারও মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু, মা-ই বা কী করবেন? আমি স্বামীর ঘর না করতে পারি, নতুন স্বামী করব কী করে? সমাজ, আইন কিছুই তো আমার পক্ষে নেই।

ভদ্রলোক এত ছেলে মানুষ, তোকে কী বলব।

বলছেন: দুজনেই মুসলিম ধর্মে দীক্ষিত হয়ে যাই, তারপর শুদ্ধি নিয়ে হিন্দুধর্মে ফিরব। আমার মন তা চায় না, ধর্মকে আমি এত সস্তা ভাবিনে, কোনো উপায় সাধনের প্রোসেস্ বলে মনে করিনে। কিন্তু, ওর বক্তব্য: সোজা হয়ে দাঁড়াতে দিতে যেখানে আপত্তি, সেখানে বাঁকা হয়েই প্রবেশ করতে হবে। নাহলে, আমরা কী অনন্তকাল অপেক্ষা করব?

একদিন আমি অভয়াকে নিজের আদর্শ ভেবেছিলাম। আজ সেই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে বুঝতে পারছি, অভয়া পেরেছিল প্রবাস বলেই। তাছাড়াও তার আর কোন আপনজন ছিল না। ভদ্রলোকের বক্তব্য: আমরাও দূরে যেতে পারি, অনেক দূরে যেখানে আমাদের কেউ চিনবে না। আমার মা-দিদিমাকে, আমি ভালোবাসি—তাঁদের এমন ফাঁকির মধ্যে রেখে চলে যাব, ভাবতেই পারি না—তাছাড়াও এই দূরে পালানো পরাজয়ের মত লাগে। আমি তা চাইনে।

আমি জানি, তুই ওর সহমত হবি। অনেকদিন বলেছিস্—বিবাহের চেয়েও ভালোবাসা জরুরী। ভালোবাসা ছাড়া বিয়ে করবিনে, তোর পণ। কিন্তু, আমার যে বিয়ের উপায় নেই। বিবাহ বাদ দিয়ে একসঙ্গে থাকতেও ওর আপত্তি নেই। আমাকে শ' এবং টলস্টয়ের লেখার অনেক উদ্ধৃতি পড়িয়ে শুনিয়েছে—বুঝিয়েছে, ধর্মের আশ্রয়ে প্রস্‌টিটিউশান্‌কে জায়গা দেওয়াই বিবাহের কাজ। আমার চাইতে সে কথা কেউ বেশী জানে না। কিন্তু, "ফ্রী লভ" তখনি মানায়—যখন বিবাহের সামাজিক এবং আইনগত অধিকার থাকে।

মেয়েদের মানুষের অধিকার—সে এখনো সংগ্রামের। কবে প্রাপ্য পাওয়া যাবে, জানিনে। যুদ্ধ শুরু হয়েছে ১৯৩৯ সালে। ৩৯, ৪০, ৪১ পার হয়ে, ৪২এ পড়ল। হয়তো আর কয় বছর বাদে যুদ্ধ থামবে, অনেক ধ্বংসের শেষে, অনেক মৃত মানুষের স্তূপের ওপর দিয়ে—স্বাধীনতাও হয়তো একদিন আমরা পাব—অনেক আত্মবিসর্জনের পরে আমাদের মানুষের অধিকার, আমাদের মত কত মেয়ের জীবন পুড়িয়ে ছাই করে—কতদিনে আসবে জানিনে। হয়তো, আমার জীবনে আসবে না। কিন্তু, আমি যা চাই, মাথা উঁচু করেই চাই।

আমার নিজস্ব মতবাদ, আমার নিজের অসুবিধার জন্য অন্য মানুষের জীবন কেন নষ্ট করব। তাই কালই বলেছি: আমি তোমাকে ছুটি দিতে চাই। ও হাসল: আমার নিজের মধ্যে ছুটি পেলে তবেই ছুটি। তুমি আমাকে মুক্তি দেবে কেমন করে?

তোকে এতদিন কিছু জানাইওনি। মিথ্যে, দুঃখ পাবি বৈ তো নয়। ভালোবাসা। তোর সুরমা"

পরদিনই বনানী বলল জ্যোৎস্নাকে; হাতে একখানা বই: —এই পোড়া ভারতবর্ষে বিশশতক এখনো নামেনি, অন্ততঃ হিন্দু-সমাজে। জ্যোৎস্না: বিশশতক ইংলণ্ড, ফ্রান্স, রাশিয়া, আমেরিকায়। ভারতবর্ষে নয়। আবার হিন্দু-মুসলমান-খৃষ্টানদের মধ্যে আলাদা। কেমন করে হবে?

বনানী: রমার চিঠি পড়েছিস্। ঋজু মেয়ে, মুক্ত মনের মেয়ে, তবু কত অসহায়।

বনানীর হাতের বইখানায় দৃষ্টি রাখল—"The pleasures of Philosophy—Will Durant—তার সঙ্গে বিশশতকের সম্পর্ক কী? আমরা মেয়েরা তো চির পরাধীন। দর্শন পড়তে পড়তে বড়ো হেঁয়ালিতে কথা বলিস।

বনানী:—দর্শন নয়। দর্শনের আনন্দ। তোকে একটু শোনাচ্ছি, শুনলে হেঁয়ালি লাগবে না। যদিও আমি মিঃ ডুরান্টের সঙ্গে সব কিছুতেই সহমত নই।

বনানী খুলে ধরল : Chapter ix, The Modern woman —(1) The great change :

If in imagination we place ourselves at the year 2000 ; and ask what was the outstanding feature of human events in the first quarter of the twentieth century, we shall perceive that it was not the Great war, not the Russian Revolution, but the change in the status of woman. History has seldom seen so startling a transformation in so short a time" মনে রাখিস এ বই লেখা হয়েছে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে। ১৯৪২ সাল চলছে, বিশ শতকের এক চতুর্থাংশ পার হয়ে গেছি, কিন্তু, কিছু পরিবর্তন হয়েছে কি, অন্য শতকগুলো থেকে। ও দেশও অন্যশতকে মেয়েদের দেখা হ'ত—"a household slave, a social ornament or a sexual convenience"

জ্যোৎস্না : সেই জন্যই তোকে বলি মেয়েদের জন্যে জান লড়িয়ে লড়ে যা। আর সব কিছু মিথ্যে। এত পড়ে লাভ কী?

যুদ্ধের জাল ছড়িয়ে পড়ছে। ১৯৩৯, ৪০, ৪১ পার হয়ে ৪২। সুভাষ বসু চলে গেছেন আত্মগোপন করে কাবুল হয়ে বার্লিনে : "কদম, কদম বাড়ায়ে যা"। এদিকে সোভিয়েট রাশিয়াও জড়িয়েছে। শুধু জড়ানোই নয়, হচ্ছে চূর্ণ-বিচূর্ণ। ছুটছে জার্মানী, ছুটছে জাপান। অমিতাভ-বুদ্ধের বুকে আমূলবিদ্ধ ছুরি—যিনি বলেছিলেন, "অহিংস পরম ধর্ম।" বলেও যে বুদ্ধিবাদী বুদ্ধ মানুষ উচ্চারণ করেছিলেন : মধ্য পন্থাই মানুষের সাধ্য। তাঁর ধর্মের মানুষই মধ্য পন্থায় বিশ্বাসী থাকল না—চরম সুখের জন্যই কাড়াকাড়ি,—অস্ত্রাঘাত। সংবাদপত্রে এই সংবাদ, রেডিয়োতে। সংবাদ বাহুল্য লোকমুখে।

বনানী ভীত। চলছে কালের চাকা। সরলপথে নয়, শুভপথেও নয়। ঘর্ঘর বেগে, গুঁড়িয়ে। ভেঙে মাঠ, ঘাট, বাড়ি, ঘর। চোখের পলক ফেলতে না ফেলতেই মানুষ গৃহহারা। হারাচ্ছে প্রিয়জন—

আশ্রয়—আশ্বাস। সময় অন্ধ, সময় নির্বোধ। অদ্ভুত এক সময়কে প্রত্যক্ষ করছে বনানী। উদ্ধত অট্টহাস্যে চাবুক কশাচ্ছে। একসময় বনানী ভেবেছিল, যুদ্ধরত জাতগুলো কবন্ধ। আজ মনে হয়, কবন্ধ হলে এত ভাবনার ছিল না। বোতল বোতল ধ্বংসের মদ খেয়ে নেশায় মস্তিষ্ক বিকৃত। বিজ্ঞানীরা একত্র হও—দাও তোমাদের বিজ্ঞান বুদ্ধি, টেকনীশান্ এসো, বানাও মারণাস্ত্র—দেশবাসী দাও প্রাণ,—আর হে শিল্পী, হে সাহিত্যিক দল, আঁকো ছবি, লেখো গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা—বলো : অপর দেশ বিজয় জন্মগত অধিকার।

বনানী আতঙ্কিত। নামছে মন্বন্তর। রাসবিহারীর পথে পথে শেষরাত থেকেই সোনার বাঙলার মানুষরা। মানুষ নয়—কঙ্কাল : তাদের আর্তনাদ :

—মা ফ্যান দাও।

সুধাময়ী, মায়ালতা রুটি বানান, ক্ষুদে ফ্যান দিয়ে ঘাঁটে জ্যোৎস্না, বনানী। একখানা করে, একহাতা করে দিতে দিতে বোধ ; ফুটো ঘটিতে জল ঢালছে মাত্র।

দ্বারিকের দোকানের সামনে মেয়েটা চিৎপাৎ শুয়ে হাত-পা ছড়িয়ে—কোলের কাছে পড়ে ছেলেটা। বনানী চিনতে পারল : পরশুই আমাদের ওখানে পড়েছিল, দিয়েছিলাম রুটি। আজ দুজনেই মারা গেছে। দেখতে দেখতে আমরা পাথর হয়ে যাচ্ছি।

জ্যোৎস্না ফুঁসল : কাউয়ার্ড। মরবার আগে খাবার দোকানটা লুঠ করতে পারল না ?

—পারবে কি করে, ওরা যে কর্মফলে বিশ্বাসী। বোঝানো হয়েছে : অনেক জন্মের কর্মদুষ্কৃতিতে এই দারিদ্র্য জন্ম। দেখিস, অসংখ্য জন মরবে, তবু অক্ষত থাকবে এই খাবারের দোকান, চায়ের দোকান, মুদীখানার দোকানগুলো।

নিরুপমা আরো সংযোজন করল :

—ছোড়দা, গ্রাম ঘুরে এসেছে। চালের অভাব নেই। বাঙলার

চাষীর ঘাম-ঝরানো ধানের চাল নৌকা বোঝাই হয়ে চলে যাচ্ছে চোরা-গোপ্তা পথে। যুদ্ধের খাবার যোগাবার কনট্রাকট কনট্রাকটাররা সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে ফুলে-ফেঁপে উঠল—আর গ্রামে নামল আকাল, মড়ক। গ্রাম-বাঙলা মুখের গ্রাস মুখ থেকে নামিয়ে দিয়ে পথে নেমেছে। জোচ্চুরি, সব জোচ্চুরি।

মানবতায় ভরসা নেই। ঈশ্বরে সংশয় আগেই। শিল্প প্রত্যয়েও নেই আশ্রয়। বনানী, কী বাঁচাবে তোমাকে? তোমার মুঠি যে এলিয়ে পড়ল।

রাত থাকতেই ওঠে, ছাদে যায়, লেখে। এই তার অভ্যাস। কিছুদিন থেকেই লিখছিল এবং ছিঁড়ছিল। ক্রমান্বয়ে। আজ সেই লিখতেও ইচ্ছে নেই।

হঠাৎ দেওয়াল আঁকড়ালো। মাথা ঘুরছে, কান ঝাঁ ঝাঁ। চোখের সামনের শূন্যটুকু বিন্দু-বিন্দুতে ভরা। অর্থ নেই। কোনো অর্থই নেই আর। অর্থ নেই, এই লেখার—এই চেষ্টার—এই অনুসন্ধানের। নিস্ফল এই পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে তার মাথায় ঘুরে গেল এলিয়টের লাইন :

I can connect Nothing with No thing.

আমি মালা গেঁথে যাই শূন্য এবং শূন্যের।

তার এক একটি কবিতা শূন্য, এক একটি গল্প।

শূন্য, একপৃষ্ঠা জার্নাল—সেও শূন্য।

চৈতন্যের অখণ্ডতা হারিয়েছিল, এমন খণ্ডচৈতন্যের শূন্যতার উপলব্ধি আগে হয়নি।

—তোর কী হয়েছে, লেখা বন্ধ করলি কেন?

—রাবিশ্ বলে। জঞ্জাল জড়ো করে লাভ?

বন্ধুদের প্রশ্ন এই। মায়ালতার প্রশ্ন এই, প্রশ্ন প্রতুলচন্দ্রেরও :

—লেখা বন্ধ করলি কেন?

মায়ালতার গলায় বুকের জল, প্রতুলচন্দ্রের চোখে হতাশা, বন্ধুদের মত রাবিশ্ বলতে পারল না।

—এতদিন যা লিখেছি, লেখাই নয়। ছেলেবয়সে করেছি, এখন আর পারছিনে।

মায়ালতা মানছেন না :

—বললেই হল, এতজন এতদিন প্রশংসা করল।

প্রতুলচন্দ্র নির্বাক। বিস্ফারিত নেত্র। মুখের রক্ত সরে সাদা। আয়নায় প্রতিফলিত স্বমূর্তি।

হেরে যাচ্ছে বেণু—তাঁর মতই হেরে যাচ্ছে।

প্রায় সব মুহূর্তেই বনানীর মনে প্রশ্নের ভিড়। তুমি কেবলি খুঁজে বেড়াচ্ছ, অথচ পাচ্ছ না কেন? কেউ কেউ তো পায়। খুঁজছ জীবন, পাচ্ছ না। খুঁজছ শিল্প-প্রত্যয় পাচ্ছ না। তুমি নিজেই জানো না কী তোমার অন্বিষ্ট। একটি সুমিত জীবন কিংবা একটি পুষ্পিত শিল্প? কীসে তোমার আনন্দ। একটি সাহিত্যশিল্পী হবার গৌরবে না একটি সুন্দর মানুষ হবার সার্থকতায়। শিল্পী হিসেবে জয়ী মানুষ হিসেবে পরাজিত, অথবা মানুষ হিসেবে জয়ী আর দূরে ছড়িয়ে, ছিটিয়ে সব শিল্প রচনা, কী তোমার কাম্য? যেহেতু অখণ্ডতাকে আর পাওয়া যাবে না বিশ শতকের চারের দশকে। অখণ্ডতায় একদা বিশ্বাসী বনানী আজ নিরুপায়। বড়ো অসহায়।

এবং এই অনিবার্য-নিরুপায়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে তার মনে হয়, সে যেন কোন্-এক-নদী তীরবর্তী বেলাভূমি। সময়ের স্রোত, ঘটনার স্রোত তার উপর দিয়ে বয়ে চলেছে নিরন্তর। কাল—আজ—কাল। সরে গেলে স্রোতধারা বেলাভূমি থাকে পড়ে। সে কোথায়ও যায় না। পৌঁছয় না কোনখানে। বন্ধুরা সঠিক না বুঝলেও বুঝতে পারে কঠিন অন্তর্দ্বন্দ্বে পড়েছে বেণু। ওকে তারা ভালোবাসে। ওর আড়ালে তাদের আলোচনা।

জ্যোৎস্না : বেণুটা নিজেকে কেমন গুটিয়ে নিচ্ছে, বড়ো কষ্ট লাগছে ওকে দেখতে।

বাণী : রবীন্দ্রনাথ থেকে এত তোড়জোড় করে ওকে সরাবার

চেষ্টা না করলে পারতাম। ওর ঔপনিষদিক-ধ্যান ধারণাকে আমরা কম ঠুকিনি।

নিরুপমা: লেখক-শিল্পী মানুষদের নিয়ে এই এক যন্ত্রণা। একবার যদি কিছু নেগেটিভ হল তো সবই নেগেটিভ। অতঃপর, পজিটিভ বলে কিছুই নেই।

লতিকা: নিরু, তুই ঠিক্ ধরেছিস্, বেণুর এগ্‌জিস্‌টেনেস পজিটিভকে এনে দিতে হবে।

অতঃপর চিন্তা জ্যোৎস্নার: নারীর অধিকার, নিরুপমার সাম্যবাদ, বাণীর, রেবার সাহিত্যে আধুনিকতা এবং লতিকার ব্যবহারিকতা উত্তীর্ণ শিল্পে অবস্থিতি।

আবেগহীন সব মুহূর্তের মধ্যেই দিন কাটছিল বনানীর।

একদিন মুহূর্তের জন্য আবেগ এসেছিল, নিরু ছিল পাশে, বলেছিল:—শূন্যের সঙ্গে শূন্য সংযোগ কথা।

অঙ্কে মেধাবী নিরু বলেছিল: শূন্যকে একমাত্র অদ্বিতীয় না রেখে কোন এক সংখ্যার ডান দিকে বসিয়ে যা, কাজ হবে।

কথাটা প্রবেশ করে গেল মাথায়। সংখ্যা খুঁজতেই হবে। শূন্যতার অসম্ভব নিরাশা থেকে নিষ্ক্রমণ চাইছে হয়তো বা। সংখ্যা আবার বন্ধুসঙ্গ। খুঁজে খুঁজে বই পড়া ফের। আবার মানুষকে, প্রকৃতিকে ভালোবাসার চেষ্টা। কিন্তু, স্বতঃস্ফূর্ত নয়—সবটাই যেন চেষ্টাকৃত।

কিছু লিখছে না। খুঁজছে সংখ্যা। সংখ্যা বার করতে না পারলে বেণু জানে: শূন্যের সঙ্গেই গাঁথা শূন্য।

রেবার প্রিয় কল্লোলের লেখকরা: বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র। লতিকার প্যাসন পরিচয়-গ্রুপ। বলে, সুধীন দত্তর গদ্যকে জানলে একটা সাহিত্য-বীক্ষা ছুঁতে পারা যায়। বিষ্ণু দের প্রায় ফ্যান্। ওর মতে বিষ্ণু দেই হবেন নব যুগের কবি। এলিয়টকে হজম করে ছেড়েছেন। বলা ভালো, লতিকার সবেই এলিয়টে হাতে খড়ি।

সেদিনের বিষয়-নির্বাচন: বাঙলা সাহিত্যে প্রেম। রেবা শুরু করল বুদ্ধদেব বসুর কবিতা নিয়ে। সব পুরুষের বাসনার রসে ভরা সোনার বাটি, আমার বুকের ছাঁচে গড়া, উল্লেখেই জ্যোৎস্না ক্ষিপ্ত: —অ্যাবসার্ড। ছেলেরা বুঝি মেয়েদের অস্তিত্বে বুকের ছাঁচটাকেই বড়ো করে দেখে। তাদের আর সমস্ত নস্যাৎ?

লতিকা: বন্ধু, আমি ঠিক জানিনে, পুরুষের চিত্ত। আমার ধারণা, ওরাও ঠিক্ বোঝে না আমাদের। তবু মাঝে মাঝে ভালো প্রেমের কবিতা পেয়ে যাই—পুরুষ-উক্তিই। যেমন:

"একটি কথার দ্বিধা থরথর চূড়ে
ভয় করেছিল সাতটি অমরাবতী।"

রেবা উত্তেজিত: সুধীন দত্ত রোমান্টিক। রবীন্দ্রনাথ থেকে একটুও সরেননি।

লতিকা: রোমান্টিক বুদ্ধদেব বসুও। উর্বশী কবিতা মনে নেই? বাঙলায় অনার্স নিয়েছিস্, খুব বেশী তফাত আছে কী?

রেবা তীক্ষ্ণ: আলবৎ আছে। যে দেহ-উল্লেখে আমাদের লজ্জা. সেই দেহ লজ্জার মিথ্যে আড়টাকে বুদ্ধদেবরাই ভাঙছেন।

লতিকা তীক্ষ্ণতর: ভারতবর্ষে আবার দেহলজ্জার আড় কিরে? আদিরস আমাদের শিরায়, রক্তে। ব্যাস, বাল্মীকি, কালিদাস, কাকে চাস? মেঘদূতে নদীতটের সঙ্গে নিতম্বের উপমা, শুনতে চাস তো শুনিয়ে দিতে পারি।

বাণী চুপ করে বসেছিল এতক্ষণ। মুচকি হেসে বলল:

—আদি বাঙলা কাব্য পড়ছিলাম, বৈষ্ণব কাব্য পদাবলী।

রাধা-কৃষ্ণর সম্ভোগ বর্ণনা। মাইনাস অধ্যাত্মবাদ, সেও কম যায় না।

লতিকার ঝাঁঝ মরেনি: আমাদের দেবত্বর সঙ্গেই জড়িয়ে দেহত্ব। বেড়াতে গিয়ে মন্দিরের গায়ে কত-যে মিথুন-মূর্তি দেখলাম সীমা সংখ্যা নেই।

খুব চ্যাঁচামেচি করেই কথাবার্তা হচ্ছিল। একজনের শেষ হতে না হতেই আর একজন। গোলযোগটা তুঙ্গে উঠে নেবে গেল। নেবে যেতে বনানী মুখ খুলল:

—আমি একটা কবিতা পড়ব।

সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল সকলে :

—কবিতা লিখেছিস্‌ তাহলে ?

—আমার লেখা নয়—কিন্তু, একটা অনুরোধ ব্যাকগ্রাউণ্ড গ্রেসফুল রাখো।

—গ্র্যাণ্টেড। বন্ধুরা বেণুকে এখন অনেক কিছুই দিতে পারে।

বেণুকে কথা দিয়েছে পরিবেশ গ্রেসফুল রাখবে। কিন্তু কথা রাখা নয়, ওরা নিজেরাই অনুভব করছে একটি আশ্চর্য-বিষন্নতার সঙ্গেই একটি আশ্চর্য স্নিগ্ধতা। নিজেরাই চলে যাচ্ছে, বহু যুগ পরের বিদর্ভ-নগরে। এমন যে জ্যোৎস্না সেও বোধ করছে পার্ক সার্কাসে বসে নেই, চলে গেছে কোন এক অন্ধকারে বোধকরি, তাকেই বলা হয় মধ্যভারতের বিদিশার নিশা। লতিকার বুক ভরে উঠছে দারু চিনির গন্ধে। নিরুপমা, দক্ষিণেরগ্রামেঘুরতে গিয়ে যে কেবলি দারিদ্র্য-অত্যাচার আরবঞ্চনাকে দেখেছে, অজস্র জোনাকি যার মনে রেখাপাতও করেনি—আজ সেই দেখল জোনাকিদের ঝিলিমিলি। আশ্চর্য কবিতা।

অন্ধকার নেমে এলো লতিকার ঘরেও। ঘন, গাঢ়, অন্ধকার। অথচ কেউ উঠে আলো জ্বালল না, জ্বালতে ইচ্ছা করল না। তর্কহীন, আলোচনাহীন, নীরব-নির্বাক বসে আছে সকলেই। বেণুর পড়া শেষ হয়ে গেছে কতক্ষণ। কিছুক্ষণ অন্ধকারে বসে থেকে সকলেরি প্রায় মনে পড়ল একযোগেই—

সব পাখি ঘরে গেছে। এবার বাড়ি ফিরতে হবে।

সপ্তাহ পরেকার জ্যোৎস্নার ঘরে আড্ডাটা অন্য জাতের। জার্মেনীর অগ্রগামিতা নিয়ে একটু প্রশংসাবাণী উচ্চারণ করে ফেলেছিল বাণী। জ্যোৎস্না বলে উঠল :

—আই হেট্ হিটলার। মেয়েদের ধরে খোঁয়াড়ে পুরে দিয়েছে।

—একটা বুদ্ধিমান জাত ম্যাঁ-ম্যাঁ করা ভেঁড়ার মত হেইল্‌ হিটলার বলতে বলতে ফ্যাসিস্ট্‌ হয়ে উঠল।

নিরুপমার ক্ষিপ্ততা জ্যোৎস্নার মতই।

ইতিহাসের ছাত্রী বেলার বক্তব্য :

প্রথম যুদ্ধেই যে ওরা মার খেয়েছে। আহত জন্তু বড়ো ভয়ংকর হয়। মরণ-কামড় দেয় ঝাঁপিয়ে পড়ে। তেড়ে আসে, হয় এস্পার —নয় ওস্পার। এখন ওদের পরদেশ জরুরী—একান্ত জরুরী। এখন ওরা অন্য সব কিছু হারাবে।

নিরু বলে : কাঁচামাল কেড়ে নেবার দেশ—পাকামাল ফিরে পাঠিয়ে বিক্রি করার দেশ। মোদ্দা কথাটা আমদানি-রপ্তানি।— আজকাল সংস্কৃতির মূল্যায়নে ভরসা পাচ্ছিনে। এই সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত, দর্শন—সত্যি ধিক্কার জন্মে যাচ্ছে। তোর দাদুর কথাই ঠিক্ জ্যোৎস্না—Satan is more powerful than God.

—বেণু, এস্থেটিজম্ নিয়ে আমার বেশী মাথাব্যথা নেই। আমি ভাবি, আমাদের কথা। উই আর স্লেভ্ অ্যামংগস্ট স্লেভ্স্।

নিরুপমা : আমিও একরকমের জ্যোৎস্নাপন্থী। বেশী মানুষের যাতে ভালো—তাই ভালো। আমার অবাক্ লাগে, যে দেশ কার্ল মার্ক্সের জন্ম দিয়েছে, সে কেমন করে জন্ম দিল হিটলারের।

লতিকা : আমি কিন্তু বৃটিশ ডেমোক্রেসীর প্রশংসা করব— তাদের সঙ্গে আমাদের যত লড়াই থাক্। নিরু মনে রাখিস্— জার্মানী কার্ল মার্ক্সের জন্ম দিলেও, বুদ্ধি দিল ইংল্যাণ্ড।

হৈ হৈ করতে করতে ওরা চলে গেল। জানল না, এমন জমায়েৎ দীর্ঘদিন হবে না। এমন প্রাণ খোলা উচ্চারণ। তার পরেই ৯ই আগস্ট। জ্যোৎস্না চলে গেল "ভারত ছাড়ার" ডাকে। বন্ধুদের বলে গেল : মেয়ে হিসেবেই যাচ্ছি। ওদের আড্ডা গেল ভেঙে। দেখা-শোনা হলেও মাঝে মাঝে, ওরা সকলেই অনুভব করে জ্যোৎস্নাই ছিল মধ্যমণি। পড়াশোনা কম—কিন্তু, বন্ধু প্রীতিতে সেই ছিল সকলকে আঁকড়ে।

এই এক সময়। অদ্ভুত সময়। একদিকে গ্রাম-বাঙলা মরছে মন্বন্তরে। উজাড় হয়ে যাচ্ছে তলাকার মানুষগুলো। চাষী, কামার-

কুমোর, তাঁতী, শাঁখারি, কাঁসারি—মধ্যবিত্তদের অল্পস্বল্প নাড়া দিলেও মর্মমূলে মর্মান্তিক আঘাত হানেনি। অন্যদিকে—দলে দলে এসে পড়ছে বর্মা থেকে আগত বহির্বঙ্গের বাঙালী—ছড়িয়ে পড়ছে কলকাতায় —পড়ছে মফঃস্বল শহরে। তাদের মেয়েদের সাবলীল আনাগোনা, পথে-ঘাটে হাটে-বাজারে। শুধু বালীগঞ্জ, পার্কসার্কাস বা চৌরঙ্গী এলাকা নয়—কলকাতার উত্তর, দক্ষিণ পূব-পশ্চিমে মধ্যবিত্ত সমাজের মেয়েরা পথে বার হয়ে পড়ল তাদের প্রভাবেই। বর্মার নারী-সমাজের কিছুটা এনে ফেলল তারা।

একদিকে বেকার ছেলেরা দলে দলে যুদ্ধে। অন্যদিকে কুইক ইণ্ডিয়া আন্দোলনে অনেক পুরুষ, অনেক মেয়েরা কারা অন্তরালে।

একদিকে আজাদ-হিন্দ্-বাহিনীর রেডিয়ো-ভাষণ—সুভাষ বসুর কণ্ঠস্বর, বৃটিশ বিরোধীশক্তির সাহায্যে দেশকে স্বাধীন করবার আহ্বান—অন্যদিকে জনযুদ্ধ। মিত্রশক্তিকে সাহায্য করো—পরাজিত করো ফ্যাসিস্ট্‌দের। মানবতা বিপন্ন।

উত্তাল সময়। সময় জটিল। সময় আপনার আঙিনা ছাড়িয়ে বিশ্বের আঙিনায়। বিশ্বনাগরিকতা অথচ ঘরের গ্রন্থিগুলি খোলেনি। সবকিছু অসমাধিত অথচ সর্বাধিক আকাঙ্ক্ষা। সময়ের সংগীত শুনতে পাচ্ছে না, মিউজিক অফ্ টাইম। শুধু শব্দের ঝন্‌ঝন্ হট্টগোল, রক্ এণ্ড রোল্।

জ্যোৎস্না চলে গিয়ে বাড়ি খাঁখাঁ, শূন্য। সেই শূন্যতা থেকে আরো এক বৃহৎ শূন্যতায় মাঝে মাঝেই চলে যায় বনানী। নিষ্ক্রমণহীন বদ্ধতার দেয়াল ঘেরা ঘরে। চলে গিয়ে আতংকিত হয়। জাগ্রত অবস্থায় বদ্ধতাকে ভয় পায় বনানী। যে নেশা বিষণ্ণতার, বদ্ধতার—যে মজে যাওয়া-বাসনা—তাকে ভয় পায়। মনে হচ্ছে জ্যোৎস্নার মত ঋজু কেউ পাশে থাকলে ভালো হ'ত।

—বেণু যাবি লাইব্রেরীতে? লতিকার কাছে? বেড়াতে যাবি লেকে?

একদিন বলল : চল্, আমাদের সেল মীটিংএ। ছোড়দার কাছ থেকে কার্ড যোগাড় করেছি।

নিরুপমার আসা-যাওয়ার পথেই তার বাড়ি। সে অনুভব করে, কখন নিরু এসে গেছে কাছাকাছি। জ্যোৎস্নার জায়গা প্রায় কাছাকাছি।

—বেণু, আমাদের বাড়ি চল্, বাবা তোর সঙ্গে আলাপ করবেন।

মনে পড়ল, নিরুদের বাড়িতে প্রথম যাওয়া। জ্যোৎস্না আর সে। স্টেশন থেকে বেশ কিছুটা উজিয়ে পূবদিকে। মস্ত বাড়ি, ভাঙা ভাঙা, চার পুরুষ আগেকার। পাশে ছুটো মজা ডোবা দেখিয়ে নিরু বলেছিল—সদর-অন্দরের দীঘি। আগে মস্ত বড় ছিল, ছিল টলটলে জল। বাড়ির মধ্যে অনেকগুলো ভাগ, ভিন্ন ভিন্ন অংশ পিতৃপুরুষের বংশধরেরা। নিরু বলেছিল :

—পলিটিক্স্ আমাদের হাড়ে-মজ্জায়, আমাদের আকাশ-বাতাস, রোদ্দুর, ও ছাড়া আমরা কেউ বাঁচিনে।

পুরো পরিবারটাই রাজনীতিক। বাবা-মা ছুজনেই কংগ্রেসে কাজ করেছেন। ছুই কাকাই বিপ্লবী—একজন অপারেশনে মৃত, একজন ফেরারী। বড়দা স্থভাষ বস্থর দলে, মেজদা আর. এস. পি.—ছোড়দা কমিউনিস্ট। আগে আণ্ডারগ্রাউণ্ড ছিল—রাশিয়া যুদ্ধে যোগ দেবার পর থেকেই বাড়িতে। দিদি দাদার সঙ্গে, নিরু ছোড়দার দিকে, যদিও পার্টিমেম্বর নয়, সিমপ্যাথাইজার মাত্র। এখন তার পরীক্ষার পালা চলছে। ছোটভাই পাকাপাকি কিছু হবার আগেই যুদ্ধে চলে গেল। নিরু হেসেছিল :

—আমাদের সে দারুণ মজারে, ভাইবোনেদের বন্ধু-বান্ধব এলেই আমরা পরস্পর ভাবি—ইস্, ওর পার্টিতে এতজন। রীতিমত জেলাসি। ছুটির দিনে খেতে বসে প্রাণখুলে কথা বলিনে, পাছে পার্টির কথা ফাঁস হয়ে যায়।

—তোর ছোড়দা আণ্ডারগ্রাউণ্ড ছিলেন, কেউ ধরিয়ে দেয়নি তখন ?

জ্যোৎস্নার এম্বিধ প্রশ্নে নিরু থতমত, বিব্রত :

—না না, তা কেন ? ভাই বোনের ভালোবাসাটা যাবে কোথায় ? তা ছাড়া বাবা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী। বাবার থেকে আমরাও সেটা ইন্‌হেরিট করেছি।

একটু থেমে বলেছিল: ছোড়দা আণ্ডারগ্রাউণ্ড ছিল গ্রামে। খুব অসুস্থ হয়ে ফিরেছিল। দিদি সেবা করেছিল, দাদা, মেজদা। আবার দাদা-মেজদাই লেগে যায় : বলে, পীপল্‌স্ ওয়ার স্লোগানটাই ফাঁকি।

—তুই তো মানিস: এই যুদ্ধই জনযুদ্ধ। ছোড়দার ভক্ত তুই। অথচ তোরাই আগে বলেছিস্—এই যুদ্ধে একটি মানুষ নয়, একটি পয়সাও নয়।

জ্যোৎস্নার অভিযোগে নিরু বলেছিল :—তা ভাই, যুদ্ধটা অন্যদিকে টার্ন নিলো যে। সোভিয়েট রাশিয়া হেরে যাবে, একথা ভাবতে ভালো লাগে কারুর ? তোরাই বল্।

বেণু-জ্যোৎস্না সেদিন নিজেদের মন ছুঁয়েছিল তলিয়ে। ওদেরও ভালো লাগেনি। মনে হয়েছিল, মানুষের ভবিষ্যৎ নিয়ে এমন একটা পরীক্ষা-নিরীক্ষায় যে দেশ সমগ্রভাবে ব্যাপ্ত, তাদের হেরে যাওয়া উচিত নয়।

যেহেতু বনানী কোনো দলঅন্তর্গত নয়, নিরুপমাদের বাড়ির সকলের ব্যবহার শোভন। ওর লেখায় হাত আছে বলে সকলেরি ইচ্ছা স্ব-দলে আনে। কিছু লিটারেচার, টাইপ করা কাগজপত্র বনানী পায় সকলের কাছ থেকেই। ছোড়দা দিয়েছেন উপরন্তু, "কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো" আর রজনী পামদত্তের "ইণ্ডিয়া টু-ডে।"

মেসোমশাই বাঁধানো "ইয়ং ইণ্ডিয়া।"

বনানী এলে সবচেয়ে খুশি মেসোমশাই। তাঁর যৌবনদিনের তাঁর বিশ্বাসের, কাজের কথা শোনবার মত উত্তরপুরুষ বা নারী নেই নিজের সংসারে। ছেলেমেয়েরা যে যার মত অন্য অন্য পার্টিতে।

বাবাকে শ্রদ্ধা করলেও সকলেরি গা এড়ানো-আড়াল, তাঁকে দেখলেই পলায়নী বৃত্তি।

—জানো বেণু, আমাদের সময়ে সংযম মস্তবড় কথা। ব্রহ্মচর্য চারিত্রিক দাঢ্যতা।

—শুনেছি, টেররিস্ট আন্দোলনেও তা ছিল।

—তা ছিল। আমরা তিন ভাই-ই একে মেনেছি। কিন্তু সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে গণসংযোগ ছিল না। আমাদের গণসংযোগ অপূর্ব। গান্ধীজীর কাছ থেকে আমরা এই শিক্ষাই নিয়েছি : দেশের আপামর সাধারণ মানুষদের কাছাকাছি থাকতে হবে। অশনে-বসনে ভঙ্গীতে তাদের মত। আমরা চুল ছেঁটেছি ছোট ছোট, খদ্দরের ধুতি-পাঞ্জাবি, কারুর ফতুয়া—খালি পা—সকালে উঠেই গীতা পড়ি, চরকা কাটি। বুকের মধ্যে ভারতমাতা, আশেপাশে দেশের সাধারণ মানুষ।

—মেসোমশায়, গীতায় মুশকিল হ'ত না ?

—মুশকিল, মুশকিল কেন হবে ? বিস্মিত তিনি :—বরং গীতা থেকে আমরা শক্তি সংগ্রহ করেছি। বিশ্বাস অর্জনে এবং লালনেও গীতা আমাদের রক্ষা করেছে। যখনি কোনো আন্দোলন সার্থকতা পায়নি বলে মনে হয়েছে, ভেঙে পড়তে গিয়েও পড়িনি—আমাদের বল দিয়েছে গীতার উক্তি :

"কর্মণ্যে বাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।"

—সে কথা বলছি না। আপনার মনে এ প্রশ্ন উঠত না যে, এতে করে দ্বি-খণ্ড হয়ে যেতে পারে আন্দোলন, ভাগ হতে পারে।

—না, কখনো না। বিস্মিত মেসোমশাই উত্তেজিত : একথা কেন বলছ তুমি ?

বলবে কি বলবে না ভেবেও বলল :

—দেশের মানুষ হিন্দু-মুসলমানে আধাআধি। বরং মুসলমান বেশী। আপনার মনে হয়নি, গীতা হাতে করে দেশপ্রেমে নামলে অবিশ্বাস করে একদিন মুসলমানরা সরে যেতে পারে ? এই-যে মুস্‌লিম লীগের বাড়-বাড়ন্ত—

থেমে গেল বনানী। মেসোমশাই। মুখ থেকে কথা সরছে না। বনানীর মনে হল, তার প্রশ্নটা ঢিল হয়ে পড়েছে, মেসোমশায়ের বিশ্বাসের জলে—আলোড়ন উঠেছে।

নিরু খুব খুশি। পথে বলল:

—চমৎকার বলেছিস্। বাবাদের আবার গণসংযোগ কীরে? একটা সায়েন্টিফিক্ থেসিসই নেই। গণসংযোগ আমাদের। আয় না আমাদের দলে।

—ও-বাবা, দলে-টলে আমি ভীত—যে কোন দলেই। তাছাড়া নিরু, প্রাপ্যকে অস্বীকার করতে নেই। গান্ধীজীর অবদান অস্বীকার করলে তোরাও ভুল করবি।

সেদিন এসে দেখল, নিরুদের সঙ্গে বসে অপরিচিত যুবক। চলে যাবে কিনা ভাবছে, নিরু বলল:

আয়, আলাপ করিয়ে দিই। আমার বন্ধু, বনানী রায়, পিস্তুতভাই অনিমেষ চৌধুরী।

অনিমেষ উঠে দাঁড়ালো, করজোড়ে বলল: নমস্কার।

প্রতি-নমস্কারে বনানী একটু বে-সামাল হয়ে গেল, একটু থতমত ভাব, স্বল্পে ব্রীড়া। অথচ এমন হয় না তার, সপ্রতিভতা থাকেই আলাপে। নিরুর ছোড়দা হেসে উঠল:

—অনি, অনেক এটিকেট শিখেছিস তো কলকাতায় এসে। আদমী সেই জংলীদেশের। নিরুর বন্ধুকে নমস্কার করতে হবে, আমরা কেউ ভাবতেই পারিনে।

—ছোড়দা, অনিমেষ মুচকি হাসল: এ-তোমার কলকাত্তাই এটিকেট নয়। সম্ভাষণহীন বঙ্গদেশ। ভুলে যাচ্ছ, আমার সেই জংলীদেশেই সৌজন্যবাণী ক্ষণে ক্ষণে উচ্চারিত: সেলাম আলেকুম—আইয়ে তস্রীফ্ লাইয়ে, আদাব অর্জ হ্যায়। সেদিক থেকে দেখলে আমার বলা উচিত ছিল: বনানীর দিকে তাকাল:

আমার নমস্কার নিতে আপনার আজ্ঞা হোক্।

ত্রয়ী-ভ্রমণ এখন প্রায় দুজনে। লেকে না গিয়ে ওরা নামল ময়দানে। সেখান থেকে হাঁটা। কথা বলতে বলতে বেড়াতে বেড়াতে দুজনেই চলে এসেছে অনেকটা, খেয়ালই হয়নি। হঠাৎ খেয়াল হল, সামনেই গঙ্গা। বনানী বলে উঠল :

—বাঃ, এমন একটি স্থান আছে কলকাতায়, আগে নজরে পড়েনি কেন ?

—বসবেন ? বসুন না একটু। অনিমেষের কণ্ঠে অনুনয়। দুজনে বসল, মাঝখানে কিছুটা জায়গা ছেড়ে। বনানী কিঞ্চিৎ উজ্জ্বল :

—অনেকদিন পরে এত ভালো লাগছে আমার। পদ্মাকে মনে পড়ছে।

—রবীন্দ্রনাথের পদ্মা থেকে কিছুটা আবৃত্তি করুন না।

বনানী : হে পদ্মা আমার
তোমায় আমায় দেখা শত-শতবার

হঠাৎ থেমে গেল। হেসে বলল : পদ্মা নয়, গঙ্গা।

দুজনেই থেমে। কী-যেন ভাবছে দুজনেই। অনেকটা বাষ্পীয়, অবয়বহীন, ঠিক আকার নিয়ে উঠছে না প্রতিমায় ভাবনারা। অভাবিত, অজানিত অতল রহস্য ঘেরা কিছু ঘটবে : এমন ভাবনায় দুই অস্তিত্ব জারিত।

বনানী সচেতন হল। এমন নৈঃশব্দ বাঞ্ছনীয় নয়। একটু প্রগল্‌ভতার সুর লাগিয়ে কুশলী সংলাপ রচনায় সচেষ্ট :

—আপনি যে বড়ো আপনার প্রিয় শেকস্‌পীয়র কোট করলেন না ?

—আপনিও রবীন্দ্র-কবিতার আবৃত্তি শুরু করেও থেমে গেলেন।

—সত্যি, আমরা এমন থেমে গেলাম কেন, বলুন তো ?

—এক একটা সময় আসে, যখন অপর-উক্তি ব্যক্ত করতে ইচ্ছা করে না। মনে হয়, বলি—যত অবিস্মরণীয় আবৃত্তি যোগ্যই হও, প্লীজ, থামো। আমাকে নিজেকেই বলতে দাও।

—অথচ বলাটা কিছুতেই পছন্দ হয় না। শব্দগুলো নাড়াচাড়া এদিকে সাজাই, ওদিকে—হল না, অন্য শব্দ আবিষ্কার প্রয়োজন। একটা কঠিন কবিতার জন্মের মত।

অনিমেষ: কবিতার জন্মদান অভিজ্ঞতা আমার নেই। তবু এইখানে আপনার পাশে বসে মনে হচ্ছে, কোনো গভীর কথা গভীর করে বলা খুবই কঠিন। আপনার ওই কঠিন কবিতা লেখার মতই।

অনিমেষের গলা গভীর হয়ে খাদে নেমে থম্‌থম্‌ করছে। বনানীর কানে লাগে, বেহাগের খাদ পঞ্চমে নেমেছে গলা, নিখাদ ছুঁয়ে উঠবে মধ্য সা তে। পা—না সা কে শুনতে পেল সে।

তুজনেই চুপ। সংলাপ শেষের দ্বিতীয় নীরবতা স্তব্ধতার অতল জলরাশি থেকে অবয়বহীন ভাবনারা আকার পরিগ্রহ করে উঠে আসবার জন্য আকুলি-বিকুলি করতে লাগল। এতক্ষণ যে সব ভাষা বলেছে, সে ভাষা নয়, কুশলী নয়, সাজানো নয়। সে-ভাষা—অন্য ভাষা—জল-অতলের জাতু-মাখানো। ওদের তু'জনকেই নাড়া দিচ্ছে সেই অনুচ্চারিত ভাষা। ভূমিকম্পে যেমন মাটি কাঁপে তেমনি কেঁপে উঠল পায়ের তলাকার মাটি—তুলে উঠল পায়ের আশেপাশে ছড়ানো সবুজ তৃণদল, ছোট ছোট ঘাসফুল নাল-সাদা-সমুখের গঙ্গা ফুলে উঠল, জলে ঢেউ লাগল—তুজনেই তুজনের দিকে তাকিয়ে রইল স্থির-নয়নে। কোনো কথা না বলেই উঠে দাঁড়াল। পায়ে পায়ে পার হল অতবড় ময়দান। পায়ের তলাকার সবুজ তৃণের মতই রিমঝিম্‌ করা আচ্ছন্ন। কোনো কথা না বলেই তুজনে ট্রাম ধরল। একজন গেল দক্ষিণে, আর একজন উত্তরে।

পরবর্তী তু'তিন দিন অনিমেষ বনানীর অপেক্ষমাণ হয়ে ফিরে গেল। কলেজে নেই, নিরুপমাদের বাড়িতেও নয়। ঠিক্‌ করল আজ আর যাবে না। ইউনিভার্সিটি থেকে বেরিয়ে অন্য মন হঠাৎ দেখল চড়ে বসেছে দক্ষিণের বাসে। কলেজের কাছাকাছি নেমে দূর থেকেই দেখল বনানী দাঁড়িয়ে। অনিমেষকে দেখে এগিয়ে এলো:

—অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি। কথা আছে। ট্রামে চড়ল, নামল ময়দানে। অনিমেষ মৃদুকণ্ঠ :

—কদিন ফিরে গেছি। আপনি বোধহয় তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরেছেন।

—কদিন কলেজে আসিনি।

—অসুখ করেছিল ? ঈষৎ উদ্বিগ্ন কণ্ঠস্বর।

—শরীর না মন। মন বড় চঞ্চল ছিল।

অনিমেষ চকিতে মুখ তুলে তাকাল বনানীর দিকে। সে মুখে বিদ্ধ, অত্যাশ্চর্য আবেগ, যন্ত্রণা এবং যন্ত্রণা নয়, চিন্তা, আরো চিন্তা, নানাবিধ টানা পোড়েনের জালবুনুনী।

—এইখানে বসা যাক্। বনানী বলল।

দুজনে বসল পাশাপাশি, সেদিনের মতই মাঝখানে ফাঁক রেখে।

—আমি আপনাকে কিছু বলতে চাই।

—বলুন।

তবু নীরবতা। অনিমেষের মনে হয়, ব্যক্ত করতে বনানীর কষ্ট হচ্ছে, যন্ত্রণা। মুখ নিচু করে শুষ্ককণ্ঠে বলল :

—নাই বা বললেন। কথাটা নিশ্চয় খুব সুখের নয়।

—সুখের বা দুঃখের কথা নয়। একটা গোপন কথা আছে আমার। আপনার কাছে কনফেস্ করব।

—কিন্তু. কেন করবেন বলুন ? আমি পাদ্রী নই।

অনিমেষকে বড়ো চঞ্চল লাগল।

—বন্ধু তো বটেই। আমার গোপন কথাটা শুনবেন না ?

—নিরু জানে ?

—না নিরু কেন, জ্যোৎস্না, লতিকা, বেলা, বাণী, রেবা আমার কোনো বন্ধুই জানে না—শুধু একজন ছাড়া। সে জানা ছাড়া উপায় ছিল না।

—তাহলে আমাকে জানাচ্ছেন কেন ?

—আমি আপনার কাছে স্বচ্ছ হতে চাই। আমি কোনো মিথ্যার ওপর সৌধ আর গড়তে চাইনে।

অনিমেষের বুকে সুখ-হিল্লোল বয়ে গেল। তারি প্রসাদ লাগল কণ্ঠে। স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলল :

—আপনি আমার কাছে খুব স্বচ্ছ। কুলুকুলু গঙ্গার মতই।

—মানুষ সম্বন্ধে অত সহজ উক্তি করবেন না।

বনানী ম্লান হাসল : তাছাড়া গঙ্গার বুকেও বান ডাকে, জল ফুলে ওঠে, তীর ভাঙে।

—সে আর কতটুকু? নদী যা গড়ে, তার তুলনায় ভাঙনকে উপেক্ষা করা যায়। আমার জীবনের মটো কী জানেন—প্রাণদায়িনী যা পাব—অঞ্জলি ভরে নেব—কী পাইনি ভেবে অর্ধমৃত হবো না।

—আমার কথাটাও শুনুন। আমি ফাঁকি দিতেও চাইনে, পেতেও নয়। দুঃখ, কষ্ট, আঘাত সইতে পারি, ফাঁকি আমার সয় না।

—আপনাকে যত দেখছি, অবাক হয়ে যাচ্ছি। সফিস্টিকেটেড ও নেইভ একসঙ্গে। দাঁড়ান বাঙলা করি, পরিশীলিত, নেইভের কী বাঙলা করি বলুন তো, সরল বললে বলাই হয় না।

—নগ্ন নিষ্পাপ বা অপাপবিদ্ধ।

—আপনি আমার কাছে অপাপবিদ্ধ।

মুহূর্তে রক্তিম তবু প্রতিবাদ করল :

—এমন লজ্জা দেবেন না। মানুষকে বড়ো করে দেখা ভালো, কিন্তু, সত্যের ঊর্ধ্বে কখনো নয়—তাতে ভয়ঙ্কর ঠকে যেতে হয়।

উত্তেজনা শান্ত হতে বলল :

—আমরা দুজনে এমন একটা জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছি যেখানে আর পদক্ষেপের পূর্বে ভিতরে-বাহিরে ফাঁক না থাকা ভালো। আমার মনে হচ্ছে, আপনার কাছে আমার উন্মুক্ত হওয়া দরকার।

—অর্থাৎ আপনি কনফেস্ করবেন।

—আমাকে বাধা দেব না।

—বেশ। বাধা দেব না। আপনি নিজেকে উন্মুক্ত করুন।

বনানী : আপনাকে আগেই বলেছি, ছেলেবেলায় আশ্রিত হয়ে বেড়েছি। আশ্রিত জীবনের যত বঞ্চনা আমার অভিজ্ঞতায়

আছে। আমি মানুষের কালো দিকটাকেও খুব কাছে থেকে দেখেছি।

অনিমেষ: কিন্তু, সে কালো আপনাকে গ্রাস করতে পারেনি। আপনার মধ্যে আলোর ঝর্ণা।

বনানী: মিথ্যে বলব না, দাদামশায়, দিদিমা, সেজমামা, মণি-মাসির ভালোবাসাও পেয়েছিলাম—আপনার মতই ওদের বুকের মধ্যে জড়ো করেও ধরেছিলাম—কিন্তু, বঞ্চনার দিক্‌গুলো—বড়ো নিষ্ঠুর। বাবার ব্যর্থতা-মায়ের হাহাকার আমাকে ছোট করে রাখছিল। বড়ো হ'তে না হ'তেই মেয়ে জন্মের বঞ্চনাগুলো বড়ো আকার নিতে লাগল। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেকার ফাঁকি; দারুণ বিভীষিকা। এদিকে রবীন্দ্রনাথ পড়ছি। আমাকে টান লাগাত নিখিলেশ আর জ্যাঠামশাই। মনে মনে ঠিক্ করেছি—এমনি কাউকে পেলে, তবেই সমর্পণ করব নিজেকে, নাহলে নয়।

বড়ো হয়েছি। আত্মীয়জন বিয়ের কথা চালাতে চান। আমি না বলি। রীতিমত বিবাহ-বিরোধী ভূমিকা। কেউ ভাবলেন: অতি-মাত্রায় স্বাধীনতা প্রিয়—কেউ দেখলেন: আজন্ম ব্রহ্মচারিণী হবার সাধনা।

আমার সেজমামাকে আমি শ্রদ্ধা করতাম। স্বচ্ছ, পরিষ্কার আবেগগুলি বলিষ্ঠ। সেই সেজমামার এক বন্ধু ছিলেন।

বনানী এই বাক্যবন্ধটি উচ্চারণ করেই স্তব্ধ হল। অনিমেষের মনে হল: অদ্ভুত এক কষ্টের সেতুর ওপর পা রাখল বনানী। যন্ত্রণাকর অভিজ্ঞতার ওপর। হাত স্থির, মুখ শুকিয়ে নীল, গলা শুকনো। অনিমেষের বুকে বাজল। হাত বাড়িয়ে ধরল হাত। অগ্রহায়ণের ঈষৎ শীতস্নিগ্ধ দিনেও সে হাত ঠাণ্ডা, ঘামে ভরে গেছে।

অনিমেষের হাতের উত্তাপে হাত রেখে বনানী উষ্ণ হল: —সেজমামা তাকে আশ্চর্য ভালো বাসতেন। বন্ধুত্ব, ভালোবাসা, শ্রদ্ধা মিলিয়ে সে অপরূপ। তখনো চোখে দেখিনি, শুধু কানেই শুনে চলেছি। একটু একটু শুনি আর ভাবি—এই সেই। অদেখা

মানুষটির কাছেই নিজেকে সমর্পণ করে বসেছি নিজের অজান্তেই—বুঝতেও পারিনি। একদিন দেখা হল। আমি অনুভব করলাম; আমার চোখের দিকে তাকিয়ে তাঁর চোখেও জ্বলে উঠল আলোর শিখা।

বনানী মধ্যখণ্ডন করল। এতক্ষণ বলে চলেছিল শূন্য দৃষ্টিপাতে। অনিমেষের মুখে তাকাল: —আপনার হয়তো খুব অবাক লাগছে। ভাবছেন এমন রোমান্টিকতা সেই ত্রয়োদশশতকে দান্তেকেই মানিয়েছিল—যখন তাঁর বয়েস ছিল নয়, আর বেয়াত্রিচের আট—বিশশতকের তিন-চারের দশকে এ বস্তু পান্‌সে, জোলো।

আসলে সব ভাবনারি দুটো দিক থাকে। কখনো বস্তুতান্ত্রিক দিকটা ক্ষয়ে গিয়ে তাত্ত্বিক ভাবনার আকাশ ছোঁয়া দিকটা বড়ো বেশী খুলে যায়। খুব ছোট বয়সে মস্ত ঘা খেয়েছিলাম রূপা নামের একটা ছেলের কাছ থেকে। এমন রূঢ়-স্থূলের দাপাদাপি অনেক যন্ত্রণা দিয়েছে—তাই আকাশ ছোঁবার একটা বাসনা তিলে তিলে প্রবল হয়ে—বুঝতে পারিনি এই বাসনাও প্রবল হলে সরে যেতে পারে পায়ের তলাকার মাটি।

অনিমেষ নীরব। তার মনে হচ্ছে, নীরবতাই বাঞ্ছনীয় এক্ষেত্রে। মন্তব্য থেকে ফিরে বনানী এলো কাহিনীতে:

—তাঁর মাসতুত বোন শিশির আমার বন্ধু। আমার মনের কথা ধরতে পারল। অব্যক্ত আর্তনাদ করল:

—বেণু এ হয় না, হয় নি। তুমি তাসের ঘর গড়ে তুলছ, তা ভাঙবেই। আমি তার কথা পুরো অনুধাবন করতে পারলাম না। ভাবলাম, দাদার প্রতি ভক্তিতে আমাকে আণ্ডার-এস্টিমেট করছে।

এতক্ষণ একটানা কথা বলে বনানী ক্লান্ত হয়ে পড়ল। ক্ষণকাল থামল। পরবর্তী কথাগুলো বল্‌বার আগে দম নিয়ে নিল যেন।

বনানী: তারপর সেইদিন। শিশির আমাকে ডেকে নিয়ে বলল:

—চলো, বেড়াতে যাই।

ধারোয়া নদী। তার লাল টুকটুকে বালুর বুকে বসলাম আমরা। দূরে ক্ষীণ জলরেখা। শিশির প্রশ্ন করল :

—তোমার ভালোবাসার জন্যে তুমি কতদূর যেতে পারো, বেণু?

—মরতেও পারি। অবলীলায় বললাম।

—যদি জানতে পারো, ভালোবাসাটা তোমারি একতরফা মাত্র, অন্যতরফ একেবারেই নিঃস্পৃহ, তবুও?

—এমন কথা কেন বলছ? শিশিরের প্রশ্নটা যেন রক্তাপ্লুত।

—জানি বলেই বলছি। আমার ওই মাসতুত ভাইটি আজ নয়। বছর তিনেক হল একজনকে ভালোবাসেন। একেবারে মরণ-বাঁচন সেই ভালোবাসা।

বুকের শুষ্কতা বুক থেকে উঠে। বললাম :

—তাঁর সেই দৃষ্টি।

—ও তোমার মনের দেখা বেণু। আর ভদ্রলোকও দিনরাত্তির একঘোরে মত্ত আছেন। সেই ঘোর লেগে আছে চোখে।

আমার মনে হল শিশির নিষ্ঠুর। নিষ্ঠুর তার প্রশ্নগুলি, রক্তাক্ত তার বক্তব্য। আমি মরীয়া। বলে উঠলাম :

—শিশির, তুমি হয়তো ঠিক জানো না, হয়তো সেই ঘোরটা ইতিমধ্যেই ভেঙে গেছে।

শিশির দীর্ঘশ্বাস ফেলল : মেয়েটি এখন এখানেই আছে।

আমার মনের মধ্যেটা হঠাৎ তোলপাড় করে উঠল। আমি নিজেই বুঝে উঠতে পারিনি কী বলতে চাইছি। আর্তকণ্ঠ :

—মেয়েটিকে একবার দেখাতে পারো, শিশির?

—পারি। কিন্তু, তুমি বড়ো কষ্ট পাবে।

মৃতের মত মুখ আমার।

—আর আমার কী কষ্ট। আর কোনো কিছুই আমাকে কষ্ট দিতে পারে না।

শিশিরের হাত ধরলাম। জানি না, কেন আমি এত উদ্‌ভ্রান্ত? যে আমি ভয়ংকর অবিশ্বাসী কম্‌পিটিশনে। যে আমি অত্যন্ত আস্থাশীল

আপন আত্ম-গৌরবে। সেই আমি কেন যে আকুলকণ্ঠে বলে উঠলাম :

—দেখাতে পারো? আজকেই। এই মুহূর্তেই? এখনি?

শিশির হঠাৎ মুখ নিচু করল। কেমন যেন নিজস্ব গোপন-কক্ষের দুয়ার অনিচ্ছায় খোলার মত হৃদয় খুলে, ব্যথা-যন্ত্রণা-কাতর এবং ক্রুদ্ধ, অসম্ভব ক্রুদ্ধ আর্তনাদ করল চাপা :

—সে তোমার পাশেই।

অতর্কিতে আমার মাথা ঘুরে গেল যে আমি ভেবেছিলাম আমার কোনো কষ্টই নেই আর। সেই আমি অননুভূত যন্ত্রণায় বিদ্ধ হতে লাগলাম। আমি যেন সেই কুরুক্ষেত্রের দগ্ধভূমির ভীষ্ম—আমাকে অজস্র শরসন্ধানে জর্জরিত করে রেখেছে। হাওয়া নেই—আলো নেই—বাতাসহীন নিরন্ধ্র অন্ধকার। আর একটু থাকলেই মরে যাবো। এমন এক চেতনা, সংজ্ঞা হারাতে গিয়েও হারাতে দিল না। আমি উঠলাম। ছুটলাম, ছুটে কিছুদূর এসে দ্রুত চলতে লাগলাম। পিছনে শিশিরের কণ্ঠস্বর।

—বেণু, বেণু পড়ে যাবে। দাঁড়াও। থামো।

বেশ কয়েকদিন শিশিরের কাছে যাইনি। শিশিরও আসেনি। প্রথম অজানা জ্বালা, অজানা যন্ত্রণা। তারপর বুকের মধ্যে গম্‌গম্ করে বাজল অশ্রুত কান্না। কী হল আমার! রাতে বালিশ ভিজে যায়। তারো পরে কান্না শেষের শান্ততা ছড়ালো আমার অস্তিত্বে। নীল আকাশ, উঁচুনিচু লালমাটি। নন্দনপাহাড়, ধারোয়া নদী, দূরের ডিগরিয়া। গাছপালা—লতা-ফুল-ফল-পাখিরা। আমার প্রিয় মানুষগুলি, যাদের মনে হয়েছিল বিষে জারিয়ে নীল। প্রায় মৃত—তারা মরণের খোলস ঝেড়ে ফেলে দেখা দিল—যদিও একটা বেদন-মাধুরী রইল লেগে। ঠিক করলাম—শিশিরের কাছে যাব।

শিশির নিষ্প্রভ মুখে সংসারের কাজ করছিল। আমাকে দেখে ঝল্‌মল্ করে উঠল। কাজ ফেলে রেখে আমরা বেরিয়ে এলাম।

—আমি ভেবেছিলাম তুমি আর আমার কাছে আসবে না।

—তোমার দোষ কী শিশির ?

মাঠে বসলাম দু'জনে। শিশিরের চোখ দিয়ে জল পড়ছে :

—আমার হাতেই তোমাকে এই দুঃখ পেতে হবে, ভাবিনি।

—পাগল। আমি হেসে উঠলাম :

তুমি আমাকে দুঃখ দিলে কোথায় ? এ দুঃখ আমার নিজের তৈরী।

আমি তার হাতে হাত বুলিয়ে দিলাম।

—শিশির, আমার মুগ্ধতা একলা মনের তৈরী। ফানুসের মত শূন্যে উড়ছিল, শূন্যেই জ্বলে গেল। আমাদের বন্ধুত্ব দু'জনের হাতে গড়া—তাছাড়া যাচাই তো হয়ে গেল।

শিশির আবেগে বলে উঠল :

—আজীবন আমাকে এইভাবে মনে রাখবে ?

—যদি তুমি আগে চলে যাও, তবে মৃত্যুর পরেও। আর আমি যদি আগে যাই—

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে শিশির বলেছিল : আমিও।

শিশির অনেক চেষ্টা করেছিল। আলাপ করিয়ে দিয়েছিল। যদিও তার মুখ রক্ত সরে সাদা। বিবাহ-প্রস্তাবও এলো। তিনি গল্স্ওয়ার্দি উদ্ধৃত করেছিলেন। একজনের মুখ সরে গিয়ে জেগে উঠছে আর একজনের মুখ। শেফালিকা, অশোকা, বাড়ির অন্য সব মেয়েরা অস্বাভাবিক চুপ্‌চাপ্‌। ওদের অনুভূতিগুলো টান টান। নতুন কিছু ঘটতে যাচ্ছে ওদের চোখের সামনে। কিন্তু, কিছুই আর আমাকে নাড়া দিতে পারল না। অবাক্ হয়ে দেখলাম, তিনি আমার সমস্ত ইচ্ছা থেকে, চিন্তা থেকে সম্পূর্ণ অপসৃত। সে এতদূর যে তাঁকে আমার বন্ধুর প্রেমিকরূপে দেখা খুব সহজ হয়ে গেল। আমিও চেষ্টা করলাম, যাতে ওদের বিবাহ হয়।

এতক্ষণ অনিমেষ মুখ খুলল :

—সফল হয়েছেন ?

—না। ভালোবাসলেও শিশিরের মনে সামাজিক সংস্কার পুরো

মাত্রায়। হিন্দুসমাজের সমস্ত বিধিনিষেধ খুব সত্য মনে করে। কতদিন যে বলেছে, হিন্দুসমাজে কাজিন বলে কিছু নেই। সব ভাইবোন।

—তাহলে এমন অঘটন ঘটল কেন?

—যাঁরা ভাগ্য মানেন, বলবেন, ভাগ্যের পরিহাস। আসলে ট্র্যাজিক ঘটনায় উর্ণনাভে জড়ালো শিশির। ওদের বাবা মারা গেলেন। অনেকগুলি ভাইবোন। প্রথম আশ্রয় জ্যাঠামশায়ের বাড়ি। জ্যাঠাইমার মাথায় বাজ ভেঙে পড়ল, তাঁর নিজেরি পঞ্চকন্যা। সেখান থেকে তাড়া খেয়ে দিদিমার কাছে দেওঘরে। দিদিমা বুকে করেই রাখলেন, অন্যেরা অসন্তুষ্ট। দিদিমা ছাড়া অন্য যে মানুষটি এগিয়ে এলেন স্নেহে, হৃদ্যতায়, তিনি ওই মাসতুত ভাই। তখন শিশিরের বয়েস বারো—ভদ্রলোক আঠারো। ওদের পরবর্তী জীবন এইভাবেই কাটবে।

—যা সত্য, তাকে স্বীকার করতে আপনার বন্ধু ভয় পাবেন কেন?

—ভয় নয়। জীবনের অন্যদিকটাও সত্য। ওর মা, ভাই-বোন সকলের স্নেহ-সম্মান হারাবে, অথচ ও তাদের ভালোবাসে। তাদের ভালোবাসা হারালে যে শূন্যতা—তার মধ্যে ওরা দুজন ওয়েসিস্ গড়ে তুলতে পারবে না বলে ওর ধারণা। তাছাড়া নিজের মধ্যেই আছে দ্বিধা।

অকস্মাৎ বনানী জিজ্ঞাসা করে বসল:

—আচ্ছা, আপনার মনে এ প্রশ্নটা উঠছে না, যখন শিশির চেষ্টা করল, তিনিও বিবাহ-প্রস্তাব দিলেন, আমি রাজী হলাম না কেন?

—হলেন না, আপনি যতটা রোমান্টিক তার চেয়েও বেশী ধ্রুপদী। আপনি অনুভব করেছিলেন এর মধ্যে যতখানি নির্মাণ-প্রচেষ্টা ততখানি শিল্পশর্ত নেই। নেই সৃষ্টির সেই এক্সট্যাসী এণ্ড এ্যাগনী। ভালোবাসাও তো শিল্প, সুন্দর এক শিল্প। বুঝতে পেরেছিলেন সৃষ্টি না থাকলে শুধু নির্মাণে আপনার শিল্পীসত্তা গৌণ হয়ে যাবে। আর চিরা-চরিত থোড়-বড়ি-খাড়ায় আপনার রুচি নেই।

বনানী অবাক্ অনিমেষের মুখে তাকিয়ে। বলল:

—আশ্চর্য !

দুজনেই দুজনের দিকে চেয়ে স্থির নয়নে। প্রায় অনিমেষেই। দুজনের বুকের মধ্যেকার জলে গুনগুন গুঞ্জনে গুঞ্জরিত সেদিনের সেই অন্য ভাষা। তার সূক্ষ্ম শিকড়গুলি জল অতল থেকে উঠে, রঙ, রস নিয়ে। পেলবতায় সুগন্ধে পাতা হতে চায়। বীজ মুখ খুলতে চায়—দুটি পাতায়।

একসময় বনানী দেখতে পেল তার হাত অনিমেষের হাতেই—করতলবদ্ধ। হাত ছাড়িয়ে উঠে দাঁড়াল। পা বাড়িয়ে বলল :

—আজকের দিনটা আমার চিরদিন মনে থাকবে !

অনিমেষ : আমারও।

বনানী : আজ কি তারিখ যেন ?

অনিমেষ : ১৯শে নভেম্বর, ৩রা অগ্রহায়ণ।

জ্যোৎস্না : জেল থেকে ফিরে দেখছি জল অনেকদূর গড়িয়েছে। বেণুটা ইডীয়েট, অনিমেষের ফাঁদে পড়ে গেছে।

বাণী : তা মন্দ কি ? ভালোই তো !

জ্যোৎস্না ক্ষিপ্ত : কী বলছিস ? শেষ পর্যন্ত সেই ওঁছা লেখকের মত একটি মেয়ের সব প্রবলেমের সলিউশান একজন পুরুষে ?

রেখা : ভাইসি-ভার্সা। পুরুষের প্রবলেমেরও সমাধান হচ্ছে একটি মেয়েতেই।

জ্যোৎস্না : তোরা হাসিস্ না। সীরিয়াস্‌লি নে ব্যাপারটাকে। আমার গা জ্বলে যাচ্ছে।

লতিকা : আহা ! অমন করে দেখছিস কেন ? আমরাও আমাদের মা-বাবাকে ভালোবাসি, ভাই-বোন—তারপরেও বন্ধুর দরকার হয়। দেখিস্—বেণুর হয়তো ভালোই হবে।

জ্যোৎস্না : বাণী বলছে ভালো। তুই-ও বলছিস্। কেন ভালো হবে, কারণ দেখা।

লতিকা : নতুন কিছু পাবে বেণু, অন্য কিছু। আমাদের সকলকে নিয়ে তার যে জীবন। তাতে সে নতুনকে খুঁজে পাচ্ছে না।

জ্যোৎস্না : বুঝেছি। সেদিন আমাকে তুই কী-যে একটা বোঝাচ্ছিলি—বোধহয় তোদের ইংরেজী অনার্সের তত্ত্ব। ইউরোপ আমেরিকায় জীবন নাকি মোমেণ্ট টু মোমেণ্ট। বেণুর বুঝি সেই নবমুহূর্তের জন্যে পাগল হওয়া জরুরী ?

লতিকা হেসে : রাম কহো। এসব উচ্চস্তরের তত্ত্বকথা অনার্সের ছেঁদো কলাপাতে পড়ে না হে—পড়ে গ্রাণ্ডের গ্রেট ইস্টার্নের বহুমূল্য চায়না ক্লেতে। আমার সেই পরিচয়—আসর—ঘোরাফেরা করা মামা আমাকে বোঝাচ্ছিলেন, আমি বুঝছিলাম না একবর্ণও।

জ্যোৎস্না : আর তুমি না বুঝেই নিচ্ছিলে আমার ওপর একহাত। উঃ, তোরা যে কী সাংঘাতিক হ'তে পারিস সাহিত্যের বেসাতি করা মানুষরা।

লতিকা : বন্ধু, আমার উদ্দেশ্য অতি সৎ—সাহিত্য পড়ানো—ভালো রেজাল্ট করলে ডক্টরেট করব, কলেজে পড়াব—ভালো না করলে স্কুল। সাহিত্য রচনার শখ নেই। আমি বেণু নই।

ঘুরে ফিরে সেই বেণু। জ্যোৎস্নাকে বিচলিত দেখে লতিকা বলল : রাগ করছিস কেন ? কেন মেনে নিচ্ছিস না, নতুন এক্সপীরিয়েন্স হবে ওর। অনেক কাছাকাছি হলেও বন্ধুত্ব আর প্রেম ঠিক্ একবস্তু নয়।

জ্যোৎস্না কঠিন উচ্চারণ করল :

—সব এক্সপীরিয়েন্সই প্রথমে নতুন। উত্তেজক, মোহ জাগানো। একদিন সব এক্সপীরিয়েন্সই পুরনো হয়ে যায়, পাতা ঝরে যায়। বেণুর প্রেমের অভিজ্ঞতা পুরনো হয়ে যাবে। তারপর ?

বেলা হাসল : মাদারহুড্।

জ্যোৎস্না রেগে : তারপর শ্বাশুড়ী, দিদিমা, ঠাকুমা। এ্যাবসার্ড্।

লতিকা : অতশত জানিনে। মন্দ কী, বেণু যদি কিছুদিনের জন্যেও অনুভব করে :-

সব পাখি ঘরে আসে—সব নদী—ফুরায় এ জীবনের সব লেনদেন
থাকে শুধু অন্ধকার—মুখোমুখি বসিবার—বনলতা সেন।

যে বিকালে জ্যোৎস্নাদের কথোপকথন বেণুকে নিয়ে সেই বিকালেই বনানী বলল অনিমেষকে :

—আজ শিশিরের চিঠি এসেছে।

—কী খবর ?

—ও লিখেছে, বেণু, তুমি এমন বোকামি করলে কেন ? অনিমেষবাবুকে অতীত-জীবন জানাবার এমন কী দরকার ছিল ? আড়াল এবং মোহটাও জরুরী। আমার এখানে দ্বিমত।

—আপনার কী মত ?

—সব আড়াল সরে গিয়ে খোলা আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে রোদ্দুরে ; বাতাস—রোদ-জল-ঝড়ে যেটুকু মোহ, যেটুকু মুগ্ধতা—তাই সত্যি। আর সব কল্পনার ফানুস কত ফাঁকি জানতে আমার বাকি নেই।

—আপনার সঙ্গে আমি একমত।

হঠাৎ বনানী কৌতুকী, উচ্ছলা :

—আমি আমার পূর্বকথা জানালাম। আপনার পূর্বকথা জানালেন না তো ?

অনিমেষ ডাইনে-বাঁয়ে মাথা বাঁকাল :—নেই।

ম্লান হল কৌতুকোজ্জ্বল মুখ। অস্ফুটে বলল :

—একেবারেই কিছু নেই ? কৈশোর এমনি কাটল ? কোন সংকট না ?

—আমাকে নিশ্চিত খুব বোকা ভাবছেন। আন-রোমান্টিক ; আন-ইন্টারেস্টিং।

—না না, তা বলছিনে। লজ্জিত বনানী।

একটা হাসি তিরতির ছড়ালো অনিমেষের মুখে। সে হাসিতে জোয়ার লাগে বনানীর বুকে। হাসিমুখেই বলল অনিমেষ :

—থাকলে খুশি হন ?

জোয়ারলাগা গাঢ় গলা, নিম্নকণ্ঠ বনানী : মন্দ কী !

—তাহলে আপনার ভাষায় জলঅতলটা নাড়াচাড়া করি।

অনিমেষ শুরু করল :

আমি গ্রামের ছেলে। তাও বাঙ্‌লার গ্রাম নয়। জন্মেছি সাঁওতালপরগনার ছোট্ট এক গ্রামে। একেবারে শাল, পলাশ, মহুয়া, আমের অরণ্যে আমার শৈশব, কৈশোর কেটেছে। আমার সমস্ত স্মৃতি, সত্তায় তার রঙ, গন্ধ, মর্মর জড়ানো—ভবিষ্যতেও থাকবে। এদিক থেকে আমি নেহাতই সাঁওতালী।

বনানী বলল : আপনার মধ্যে সেইজন্যই অফুরন্ত আদি প্রাণ ! সতেজ, সবুজ, সরল, প্রাণবন্ত। অনিমেষ হাসল :

ভাগলপুরই আমাদের মস্ত শহর। সেই গ্রামে একটু বড় বয়সের মেয়ে মাত্র দিদি একটু ছোটরাই ছোট বোন। কলকাতাকে দেখলাম বড়ো হয়ে। মামাবাড়িতে তেমন আসা-যাওয়া ছিল না। কলেজে পড়তে এসেই কলকাতাকে আবিষ্কার। একেবারে অভিভূত।

—অথচ দেখুন, কলকাতাকে জন্মাবধি দেখে আসছি, সে আমাকে তেমন নাড়া দেয়নি।

—বড়োবাজারের বড়ো বড়ো বাড়ি। ফুটপাথ ঘেঁষে চলি, হাঁ করে তাকাই। প্রথম দেখা মিউজিয়াম, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, হাইকোর্ট, সেনেট হাউস, মাথা ঘুরতে থাকল।

বনানী খিলখিল হেসে উঠল।

—ভাগ্যিস সেদিন দেখেন নি। দেখলে গাঁইয়া বলে খারিজ করে দিতেন তক্ষনি।

এবার মুচ্‌কি হাসার পালা বনানীর।

—সত্যি, অবাক কাণ্ড। আমি খাস কলকাত্তাইয়া। প্রথম বিস্ময় জাগাল মফঃস্বল শহরের নদী পদ্মা। আপনি শাল-পলাশের মহুয়ার রঙ-গন্ধে বিভোর মুগ্ধ হলেন শহর কলকাতায় চোখ রেখে। মর্মর সব

সৌধ, নদীর ওপারের ব্রীজ, ময়দানের পাশ দিয়ে চলে যাওয়া বাঁধানো চওড়া চৌরঙ্গী।

—আরো কিছু। শুধু চোখ নয়, মনও। কলকাতার কলেজ, ইউনিভার্সিটি। কলেজ স্ট্রীটের বইপাড়া, ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী, নাট্যরঙ্গমঞ্চ, সিনেমা হল, সমস্ত মিলেই।

—বেশ, কথার ফাঁদে আসল কথাই যাচ্ছে হারিয়ে। গল্প কই ?

—এই যে আসছি। কলেজে পড়তে এসেছি। বাবা আত্মগরবী মানুষ—মামাবাড়ি থাকলেও, মেসে ভর্তি করলেন। তার জন্য আমাকে ট্যুইশান নিতে হল। মাঝে মাঝে আসি কসবায়। নিরুর সম্পর্কিত এক বোনের সঙ্গে দেখা। নাম সোনালী। মনে হয়েছিল—নামটা মিষ্টি, গলার স্বর মিষ্টি, মিষ্টি চোখের নরম চাহনি।

ঔৎসুক্যে : তারপর ?

—তারপর দু'একটা কথাবার্তা হয়েছিল, ভালোও লেগেছিল।

একদিন শুনলাম সোনালীর বিয়ে ঠিক্। নেমন্তন্নও পেলাম।

—বুকে বাজেনি ?

—এমন কিছু উক্তিযোগ্য নয়।

—তাহলে আপনার কেমন ভালোবাসা ?

—দাঁড়ান দাঁড়ান। আপনার আর তর সইছে না। ভালোবাসা তো বলিনি, ভালোলাগা। ভালোবাসা পর্যন্ত গড়াল কোথায় ?

—কেন ? গড়াতে বাধাটা কোন্‌খানে ?

—বাধা মধ্যবিত্ত জীবন-যাপনে। আমাদের মধ্যবিত্ত, নিম্ন-মধ্যবিত্তই বলা ভালো। মেয়েদের সঙ্গে সহজ মেলামেশার অবকাশ কম। যাকে কিছুই চিনলাম না, তাকে ভালোবাসি কী করে ?

—লাভ অ্যাট্ ফার্স্ট সাইট আপনি মানেন না। মানলে মিষ্টি মেয়েটি বুক ছেয়ে থাকত।

—কখনো মানি, কখনো নয়।

—খুব সুবিধেবাদী আপনি।

—হাঁ। বিশেষ সুবিধের মানুষ আমি নই।

আচম্‌কা বনানীর প্রশ্ন :

—নিরু সম্বন্ধে আপনার কী অভিমত ?

অনিমেষ বিস্ময়াহত। বুঝতে পারল, বনানীর মনে কোন্ কথা চক্র হয়ে ঘুরছে। সচকিত হয়ে ও বলল :

—নিরু খুব ভালো মেয়ে।

—নিরুও আমার কাছে আপনার অনেক প্রশংসা করেছে।

—নিরুর চোখ সরল। বুঝতেই পারেনি আপনার কুশলী চোখের কাছে তার ভাইয়ের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি ধরা পড়ে যাবে।

—আমি ঠিক্ সেকথা বলতে চাইনি। লজ্জিত বনানী।

—জানি। নিরু আমার কাজিন নয়। আমার মামাত বোন। বড় গম্ভীর অনিমেষের গলা। আর এই গম্ভীর গলার উক্তিতে, লজ্জিত বনানী নিমেষে মরমে মর্মাহত। বলে উঠল :

—সত্যি, কী আজেবাজে কথায় চলে যাচ্ছি। আমায় মাপ করবেন। সোনালীর গল্পটা শেষই হল না। দাঁড়ান খেই ধরিয়ে দিচ্ছি, নিমন্ত্রণ পেলেন।

অনিমেষ : নিমন্ত্রণ পেলাম, এলামও। একটা কবিতার বই প্রেজেন্ট করলাম বিবাহিত জীবনের শুভকামনা জানিয়ে।

বনানী : তারপর ?

অনিমেষ : তারপর, আমার কথাটি ফুরোলো, নটেগাছটি মুড়োলো।

ভান নয়। সত্যিই ক্রুদ্ধ বনানী :

—থাক। আর বলতে হবে না। তারপরের কথা আমারও জানা। কেনরে গোরু নটে খাস্। সত্যিই অবাক্ লাগছে আমার। মিথ্যেই সেক্সপীয়র পড়লেন। এমনি এমনিই রোমিও-জুলিয়েট ? অথচ জুলিয়েটের আগে অন্য এক মেয়েকে ভালোবেসেছিল রোমিও।

—কী করব বলুন, আমার বরাতটাই মন্দ। অতীব মন্দ। আমার ভাগ্যে কিছুই ঘটল না। জুলিয়েটের দর্শনই প্রথমে পেয়ে গেলাম। আর এই জুলিয়েটই আমার—আদি—মধ্য—ও অন্ত।

মুহূর্তে রক্তবর্ণ বনানী এমন স্পষ্ট উচ্চারণে। তার আরক্ত মুখের ওপর স্থির চোখ ফেলে অনিমেষ শুধাল :

—আপনি নিজের দিক থেকে স্বচ্ছ ?

বনানীও গভীর। মাত্র বলতে পারল হাঁ।

—তবে এত ভাবনা করছেন কেন ? কেন, এত ক্ষত-বিক্ষত করছেন নিজেকে ? আমি শুধু এই কথাই বলতে চাই ; একটা কথা বলবার জন্য আমি কতদিন থেকে উদ্‌গ্রীব, অস্থির হয়ে আছি—আমি সর্বতোভাবে সারেণ্ডার করবার জন্য প্রস্তুত।

কথা শেষ করেই অনিমেষ বনানীর দুই হাত নিজের দু'হাতে তুলে বদ্ধ করল। বদ্ধতায় ওদের দুজনেরি অনুভব সেদিনের সেই অন্য ভাষার বীজ-মুখ-খোলা দু' পাতার ছোট্ট চারাগাছটা মাথা ঝাঁকা দিয়ে উঠল। রক্ত রঙের কচি কিশলয় মেলে দিল রোদ্দুরে। বাতাসে দুলে উঠল। সেই দুলে ওঠা ঢেউ বুক থেকে উঠে দুজনের দেহতটের কূলে কূলে এসে লাগল। ঢেউটা ছড়িয়ে পড়ল কোষে কোষে।

বনানী : সেদিন ওকথা বললে কেন তুমি ? ভালোবাসায় কি সারেণ্ডার করার কথা আসে ?

অনিমেষ : যখন জানা হয়ে যায় ভালোবেসেছি, আর ফিরে প্রত্যভিবাদনে ধন্যও হয়েছি—তখন ওছাড়া আর কি হতে পারে ? তখন যুগ্ম-ভালোবাসা হাতে ধরে যেখানে নিয়ে যাবে, যেতে হবে।

বনানী : যদি সেল্‌ফ্‌-রিয়ালাইজেশানে বাধা ঘটে।

অনিমেষ : সত্যিকার রিয়ালাইজেশানে বাধা ঘটে না, ঘটে ইগোইজমে।

বনানী : ধরো আমার ইগো একটু প্রবল। প্রখর অহং।

অনিমেষ : তোমাকে নম্র হতে সাহায্য করব।

বনানী : যদি না হই, যদি উগ্রই থাকি কাঁটা উঁচিয়ে। কিছু ক্ষতও করি, তখনো সারেণ্ডার করতে পারবে ?

অনিমেষ : যতক্ষণ জানব কাঁটার বাধা এহ বাহ্য—গোলাপটাই

সত্য। তারপরেও চেষ্টা করতে ছাড়ব না। বল্‌ব, বনানী, তুমি যুগ্ম-ভালোবাসা থেকে সরে যাচ্ছ, নার্সিসাস হয়ে যাচ্ছ।

বনানী বিমনা, বিষণ্ণ :

—সারেণ্ডার কথাটা সমর্পণেরই আধুনিকীকরণ। একদিন সমর্পণ ভাবনায় মর্মান্তিক হয়েছি। তাই ওই শব্দে আমার ভয়।

অনিমেষ : আমি তোমার ওই অধ্যায়টি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনুচ্চারিত থাকতে চাই। তবু বলছি, তুমি তখন নিজেকে যোগাযোগের কুমুর মত ভেবেছিলে। অথচ তুমি কুমুর মতোই নও। তোমার মধ্যে যুক্তিবুদ্ধির অঙ্গাঙ্গী আকর্ষণ—সেই তোমাকে অযৌক্তিকতা থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বনানী বলল :

—আমি আজকাল ভাবি, ভালোবাসা সহজ নয়—ইচ্ছে করলেই কাউকে ভালোবাসা যায় না—কিন্তু, আণ্ডারস্টাণ্ডিং আরো কঠিন। আমি চাই স্বচ্ছ আবেদন। কোনদিন যদি ভালোবাসা ভেঙে যায় আমাদের, চলে যায় আকর্ষণ, যেন লুকোচুরি না করি, যেন জানাতে পারি বন্ধুর মত।

হঠাৎ গলা ভেঙে গেল :

—এমন দিনও আসতে পারে, যেদিন আমাদের ভালোবাসাও মৃত হয়ে গেল।

অনিমেষ : হয়তো পারে।

বনানী : সেদিন কী করবে তুমি ?

অনিমেষ : বিদায় নিয়ে যাবো।

বনানী ( আর্ত কণ্ঠ ) : বিদায় নিয়ে যাবে ? কিছু চেষ্টা করবে না ?

অনিমেষ : কাঙাল হয়ে যাব যে। তখন আমাকে আর সহ্য করতে পারবে না।

বনানী : অপরাধী করবে না আমাকে ?

অনিমেষ : কোনোদিনও না। কখনো নয়। বনানী, যদি

আমাদের সরেও যেতে হয় কোনোদিন—আজকের দিনগুলো আজীবন স্মরণে রেখে দেব। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত চেষ্টা করেও ভুলতে পারব না—ফাঁকিহীন, মিথ্যাহীন, এক অপরূপ মাধুর্যে তুমি আমাকে ভরিয়ে দিয়েছিলে।

বনানীর চোখ ছলছলিয়ে উঠল। অনিমেষ তার দু'হাত নিজের দু'হাতে তুলে বুকে রাখল, বুক থেকে তুলে চোখে রাখল, তারপর ছোঁয়াল ঠোঁটে, ফের রাখল হাতেই।

—গড়ার সবে শুরু। শুরু দিনেই কেন ভাঙনের ভাবনা ভাবছ?

—কী জানি—বোধকরি, সব কিছুর জন্যেই মনকে প্রস্তুত রাখা ভালো।

—তার চেয়ে আমরা প্রস্তুত হই আরো নিবিড়তার জন্যে। উপস্থিত তুমি শুধুই বনানী নও, আমিও নই শুধু অনিমেষ। আমাদের দুজনের মধ্যেই মিশ্রণ-ক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে।

আবার সেই মৃদু তিরতিরে হাসি ছেয়ে ধরল অনিমেষের মুখ—আর সে হাসির দিকে চেয়ে আশ্চর্য বান ডাকল বনানীর বুকে। সংশয় ছিট্‌কে সরে গেল দূরে—আর সেই অন্যভাষার চারাগাছটা রক্তবর্ণ কিশলয়দের সবুজে ডুবিয়ে রূপান্তরিত করতে লাগল। কয়েকটা ডাল বেরুল, বেশ কিছু পত্র-পল্লব।

বনানী লিখল বাড়ি ফিরে।

শিশু তরু দুলছে। শেকড় দু'ভাগ
নামায় দুই হৃদয়ের জলে।
কিংবা দুই হৃদয় জল থেকেই ওঠা ওপরে।
কিশলয়, সবুজপাতা, কুঁড়িমুখ
সারাদিন, সারারাত ডালপালায় সারেঙ্গী
র্সা র্সানা র্সা র্সা র্গা র্গর্মা র্গর্মর্পা র্মর্গা র্রনা র্সর্রর্সা

ঝুম্ ঝুম্, ঝম্‌ঝম্ নাচন
রক্ত নাচের ঘুঙুরে।

যদিও শিশু তরুর আন্দোলনে ছিল সারেঙ্গীর ছড়টানা বেহাগনীড়ে, ছিল নৃত্যছন্দ রক্ত চ্ছলোচ্ছলে—তবু তারা জেনেছিল বালক তরুটি বৃক্ষ হবে—আর সেই বৃক্ষত্বে আমন্ত্রণ অনেকের। যারা বেণুর জীবন জুড়ে—যারা আছে অনিমেষের জীবনে এবং আরো অনাগত দিনের অনেক অভ্যাগতদের নিয়ে।

হেই সামালো। হৃদয়-জোয়ার সামালো হে। বেশী জোয়ার কোনো কাজের কথা নয়। অল্পদিনেই সামলে উঠল বনানী-অনিমেষ। জলরাশি থেকে উঠে পা রাখল স্থলরাশিতে।

বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ। বাবা-মার সঙ্গে পরিচয় করানো। পরিচয় সুধাময়ী, শরৎকুমার, কিশোর কান্তের সঙ্গে। বন্ধুরা হৈ হৈ করল :

—বাবুটাবু বলতে পারব না, মিঃ চৌধুরীও নয়। রীতিমত তুমি এবং অনিমেষ।

অনিমেষ : গ্র্যাণ্ড। আমিই জিতে যাচ্ছি। তোমরা শুধু অনিমেষ ডাকবে। আর আমি ? জ্যোৎস্না, লতিকা, রেবা, বাণী, বেলা।

নিরুপমা : অনিদা, কিন্তু কৃষ্ণ হতে চেষ্টা কোর না। মডার্ন রাধিকা শেয়ার করবে না। খণ্ডিতাও নয় মানিনীও না।

জ্যোৎস্না : মনে রেখো, আমরা সেকালের সখিবৃন্দ নই। বন্ধু। স্ব স্ব প্রধান। আমাদের ডিফরেন্ট্ ক্যারেক্টর্।

অনিমেষের সঙ্গেই এলো। কতদিন এসেছে নিরুপমাদের বাড়ি, কখনো এমন হয়নি। পা তুলতে ভারী, মুখে উদ্বেল চিন্তারা। সেদিকে তাকিয়ে অনিমেষ হাত ধরল, মৃদু চাপ দিল :

—ভয় কী! মার চিঠি তো পড়েছ, খুব ভালো চিঠি লিখেছেন।

নিজের ওপর বিরক্তি। কেন সহজ ভাবে নিতে পারছে না ? সেও তো অনিমেষকে পরিচয় করাতে নিয়ে গিয়েছিল। নিজের ব্যাপারটাকেই কেন বা ভাবছে যাচাই ? আদ্যিকালের মেয়ে সংস্কার

ভাবনাই তাহলে কাজ করে চলছে তার ওপর। অনিমেষের হাত ছাড়াল, মৃদু হাসল, ঢুকল সহজ ভাবেই। নিরু এসে দাঁড়াল, হেসে বলল,

—আমি আর যাব না। তোমরাই যাও।

—মা, এই বনানী।

পূর্ণশশী বসেছিলেন তক্তপোশে, উঠে দাঁড়ালেন, হেসে বললেন :
—জানি, বেণু।

বনানী প্রণাম করতে চিবুকে আঙুল স্পর্শ করলেন, পরে চুম্বন করলেন স্ব-আঙুল। মায়ালতা অনিমেষের মাথায় হাত রেখেছিলেন। পূর্ণশশী দুজনকে দু'পাশে বসালেন। কিছুক্ষণ কথাবার্তা। ওঠবার সময় বললেন :

—আবার এসো। আমি যতদিন আছি একবার করে আসবে। গান শুনব তোমার। তোমার কবিতা শুনব।

আনন্দিত বনানী। ভালোবাসার অমল আলো একশিখা থেকে জ্বলে আরেক শিখায়। শিখায় শিখায় মালা। স্মিত মুখে মুখ তুলে চাইতে, পৃথিবী দুলে উঠল। উঃ কী জ্বালাময় দৃষ্টি পূর্ণশশীর দু'চোখে। তিনি কি মস্ত কিছু হারাচ্ছেন? সর্বনাশ হয়ে যাচ্ছে তাঁর? বিস্ফারিত নয়নে তিনি কি দেখছেন তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীকে? এই যন্ত্রণা চোখে, অথচ গলায় অমন উদার আহ্বান কেন? তবে কি পূর্ণশশীও দেখতে পাননি স্ব-যন্ত্রণা? অবচেতনেই দাবানল দগ্ধ করছে তাঁকেও?

হায় বনানী—এ কোন্ পৃথিবীতে পা দিলে তুমি সাধ করে? বড়ো সাধে। প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যে তোমার একবুক বিতৃষ্ণা। তুমি ভেবেছিলে: ভালোবাসার অমল আলো এক শিখা থেকে জ্বলে আরেক শিখায়—প্রদীপে প্রদীপে মালা।

বেরিয়ে এসেই বলল : আমি বাড়ি যাব।

অনিমেষ বিব্রত এবং চিন্তিতও—এমন উদ্‌ভ্রান্ত কেন বেণু? পূর্ণশশীর দৃষ্টি যাকে দেখেছিল বনানী, তা ছিল অনিমেষের দৃষ্টির আড়াল। প্রথম পরিচয়ে প্রতুলচন্দ্র ও মায়ালতার অন্তর্দৃষ্টিও তাকেও

ভাবিয়েছিল (কে হে ছোকরা, তুমি আমাদের সারাজীবনের আশাতরুটির মূল্য বুঝতে পারবে কি কোনোদিনও ?) অথচ বনানী দেখতে পায়নি। খুশি খুশি বনানী দেখেছিল বাবা-মার আশীর্বাদ। মাথায় হাত রাখা সস্নেহে।

তবে কি লাভ এট ফার্স্ট সাইটের মত বিরাগও বিরাজ করছে পাশাপাশিই। শুনে নিরু বলেছিল :

—তুই ভেবেছিলি ভালোবাসা সেই স্বর্গীয় দেবদূত, ডানায় ভর দিয়ে নেমে একজনের চোখ থেকে আরেকজনের চোখে। অনিদা ভালোবেসেছে বলেই অনিদার প্রিয়জনেরা মুহূর্তেই ভালোবাসবে তোকে ?

—নিরু, স্বর্গের কাছে মর্ত্যের এই তো চাওয়া। স্বর্গ মানে মানুষের সূক্ষ্ম, সুন্দর অনুভবগুলি।

নিরু বলল : কবিতা লিখিস বটে কিন্তু ভেবে দেখিস নি, পৃথিবীটা কবিতা নয়। কখনো ছিল না, এখনো হয়নি। যত চাঁদ তারা থাক আকাশে, নদীতে জল যতই ছলোছল করুক, বাতাসে যত মর্মর। কবে এই পৃথিবী সত্যিকারের কবিতা হয়ে উঠবে আমি জানিনে।

আরো বলেছিল :

—বেণু, পৃথিবীতে মানুষের মূল্য কোথায় ? দরকষাকষিতে। কতখানি ডিমাণ্ডের সাপ্লাই যোগাবে তুমি, তাইতেই তোমার কদর। তুই ভাবছিস, শুধু পিসিমাই তোকে যাচাই করে গেলেন। তা নয়, আমাদের এই সিস্টেমে অনিদাও ছাড়া পায়নি। আমি জানি, মাসিমা-মেসোমশায়ও ডিমাণ্ডসাপ্লাইয়ের হিসাবেই দর কষেছেন অনিদার। বেচারা হয়তো পাসমার্কই পায়নি।

১৯৪৩এর বাঙলা। চারদিকে হাহাকার। ১৯৪২ থেকে ধূমায়িত হতে হতে আকাল, মনন্বন্তর। কাতারে কাতারে মরছে—যারা মরেনি ধুঁকছে। কলকাতার বুকেই তারা, তাদের পেটে-পিঠে

এক, মরা-চোখ, মুখে কথা নেই। জ্যোৎস্না, বনানী, বাণী, লতিকা, মায়ালতা-সুধাময়ীদের মাথা গুনতি একখানা রুটি—একমুঠো ফ্যানে ক্ষুদ তাদের বাঁচাতে পারে না। তারা বাঁচল না। এমন কি নিরুপমাদের ক্যান্টিনও নয়।

অনেক ফোটো উঠল। মরা মায়ের স্তনে মুখ গুঁজে পড়ে থাকা জ্যান্ত শিশু। অনেক কবিতা :

ছড়ানো হাত, সাদা শাঁখা
এ হাত ধুয়েছে চাল সুগন্ধী
লক্ষ্মীর ঝাঁপিটা কোথায় রেখেছ ?

কিন্তু, তারা বাঁ'ল না, তারা মরল। মৃত, মৃত হয়ে গেল। আকাল-প্রতীক হল তেরশ পঞ্চাশ। কোন শিল্প, কোন সাহিত্যই তাদের বাঁচাতে পারল না। কোন নাটক, কোন সঙ্গীত নয়।

বনানী আবার ক্লান্ত। অনিমেষ ওকে বোঝায় :

—তুমি যে মন্বন্তরের চেহারা দেখছ, তা বাইরে থেকে আসেনি। আমাদের সমাজব্যবস্থার মধ্যেই সে আছে। যারা মরছে, মরবে, তারা সেই রক্ত করবীর রাজার এঁটো। যতদিন রাজা আছে, রাজার পারিষদেরা আছে—ততদিন ওরাও আছে এই চেহারায়। একটা রুটি, একমুঠো ক্ষুদ, কী করবে ওদের ? কী করবে একহাতা খিচুড়ীতে ?

১৯৪৪ও যায় যায়। প্রতুলচন্দ্র বললেন মায়ালতাকে :

—বেণুকে বলো, আর কেন দেরী করছে ওরা। প্রায় দু'বছর হতে চলল।

মায়ালতা বলেন—বিয়ে করবে কি দু'জনেই তো বেকার। তাছাড়াও এত তাড়া কীসের। আর একটু বোঝাপড়া হোক্।

প্রতুলচন্দ্র : দু'বছরে বোঝাপড়া না হলে দশবছরেও হবে না। বিয়ের আগেকার আর পরেকার বোঝাপড়া এক নয়। সংসারে কত বস্তু আছে।

মায়ালতা দীর্ঘশ্বাস ফেলেন—তাই মনে হয়, যত দেরী হয় ততই

ভালো। বেণুটা কী-যে করল। আমরা গরীব, ওরাও প্রায় তাই। লতিকার মার খুব ইচ্ছে ছিল। ওর গান, ওর লেখা কত ভালো বাসতেন। ওকে ওঁরা দাঁড় করিয়ে দিতেন।

প্রতুলচন্দ্র: অনিমেষের মাও ভালোবাসেন। দু'বার এসেছেন, দুবারই গান শুনেছেন, লেখা পড়েছেন।

মায়ালতার দীর্ঘশ্বাস দীর্ঘতর:

—সে সব বিয়ের আগেই। আমাদের মত পরিবারে অন্য চাহিদা। রান্না-রান্না, ঘর গুছনো, গুরুজনদের সেবা, ছোটদের যত্ন—অন্য দাম আর নেই।

প্রতুলচন্দ্রও জানেন সেকথা। কিন্তু, বেণু সাধ করেই তাঁদের ইচ্ছা ও সম্মতির বাইরে এমন ঘটিয়েছে, তাঁরা নিরুপায়। বেকার জীবনে বিবাহের দুর্গতি তিনি জানেন, কিন্তু, বিবাহের বাইরের এমন অসামাজিক মেলামেশাতে তাঁর অসম্মতি।

—বেণু, আমার মনে হচ্ছে এবার তোমাদের বিয়েটা হওয়া উচিত।

বনানী চমকিত: বাবা, আর কিছুদিন সময় দাও আমাদের—ওর একটা চাকুরি-বাকুরি হোক, আমিও লিখে কিছু টাকা পাই।

—তার দরকার নেই। বিয়ের পর তুমি এইখানেই থাকবে, যেমন আছ। অনিমেষের যা ইচ্ছে—মেসে বা আমাদের কাছেও থাকতে পারবে। আমি এবিষয়ে অনিমেষের বাবাকে চিঠি লিখব।

বনানী বুঝল অনুনয় অবান্তর। বাবার শুধু বলা নয় নির্দেশ। তার রক্তশূন্য মুখের দিকে তাকিয়ে অনিমেষ মূঢ়, বিভ্রান্ত:

—বেণু, তুমি কি আমাকে পুরো বিশ্বাস করতে পারছ না? বনানী আকুল হল, হাত ধরল অনিমেষের।

—অনি, একথা কেমন করে বলতে পারলে তুমি? আমাদের মেয়েদের জীবন—আমি বাতাসে গন্ধ পাচ্ছি অন্য একজীবনের। ভালোবাসা আর বিবাহ এক নয়।

"দেয়ার আর মোর থিংস ইন্ হেভেন্ অ্যাণ্ড আর্থ, হোরাশিও, দ্যান্ আর ড্রেম্ট্ অফ্ ইন্ ইয়োর ফিলজফি।"

অতঃপর বনানী রায় চৌধুরীর কয়েকটা মাস ঘটনাবহুল হল। অনিমেষের এম, এ, পরীক্ষার অল্পই বাকি, তবু বিবাহিতা স্ত্রীর প্রতি কতর্ব্য পালনকল্পে গোটা দুই ছাত্র যোগাড় করতেই বেণু আপত্তি জানাল, একটা তার ছিল আগেই। বনানী রায়-চৌধুরীকে আজকাল দেখা যাচ্ছে ফ্ল্যাট ফাইল হাতে কাগজের অফিসে হানা দিতে। কখনো দৈনিকের রবিবাসরে কলম লেখা, কখনো সাপ্তাহিকে মাসিকে কবিতা গল্প। সবজায়গাতেই দাবী :

—আর অ্যামেচার থাকতে রাজী নই, আমাকে যথাযোগ্য পারিশ্রমিক দিন।

মায়ালতা খুশি। একটা বাস্তব শক্ত চেহারা দেখা যাচ্ছে বনানীর। যা চেয়েছিলেন সারাজীবন। তাছাড়া বনানী তাদের কাছেই আছে। অনিমেষ বেশীর ভাগ মেসেই কাটায় কয়েকটা দিন তাঁদের অভ্যাগত জামাইটিকে অধ্যয়ন করছেন তাঁরা। কেমন যেন মন ভরে না মায়ালতার, ঠিক্ কী দোষ খুঁজে বার করতেও পারেন না। প্রতুলচন্দ্র দেখছেন, নতুন প্রজন্মের পুরুষ। পুরুষমানুষের এই চেহারা তাঁর ধারণায় ছিল না। অনিমেষ জবরদস্ত স্বামী তো নয়ই, সাধারণ স্বামীর দাবীও নেই। বিবাহশেষেও অনিমেষ স্বামী অপেক্ষা অধিক প্রেমিক।

বনানী রায়চৌধুরীর বাইশবছরের জীবন ঘিরে যত কল্পনা ছিল, চিন্তা ছিল, তত বাস্তবতা ছিল না। দু'তিনবার পতিগৃহে বাস করে সেই বাস্তবের সাক্ষাৎ মিলল, পরিমার্জন। বুঝতে পারল, ব্যক্তি বনানী এখানে অস্তিত্বহীন। তার মূল্য বধূ নামক সমষ্টির মধ্যে, বধূজনোচিত কর্তব্য ও দায়িত্বের যে একটা ছক কাটা আছে—সেই ছকের অনুশাসনে। অল্পদিনের মধেই জ্ঞান চোখের উন্মীলন হল—সঙ্গেই বুঝতে পারল অনিমেষের অবস্থাও তার চেয়ে বেশী সুখের নয়। সেও ইনডিভিডুয়াল নয় এই বাড়িতে।

অথচ বনানী বিশ্বাস করতে চাইত : ভালোবাসার অমল আলো একশিখা থেকে জ্বলে আরেকশিখায় বিশ্বাস নড়ে গেল তার। মনে হল, তাদের এই মধ্যবিত্ত পরিবারগুলোও বিত্ত নির্ভর। বক্তি, ব্যক্তিসত্তা, বা ব্যক্তিস্বাধীনতা এইসব গালভরা কথাগুলো একেবারেই মানায় না।

বাস্তবের পরিমার্জনে নিজের বাবা-মাকেও দেখতে পেল অন্যচোখে—অনেকটা অনিমেষের চোখে।

আর একটা অভিজ্ঞতাও অন্যতর। প্রাক্‌বিবাহ ভালোবাসা এবং বিবাহ-পরবর্তী ভালোবাসায় অনিবার্যভাবেই। যদিও দুজনেই দু'জনকে অনুধাবন চেষ্টা—তবু বনানীর অনুভব : সেতারে সেই গভীর মীড়টি বাজেনি। কঠিন, নিষ্ঠুর আঙুল প্রায় তার টেনে ছিঁড়েও আনতে পারেনি সেই মীড়। বনানী চায়, তাদের স্থূল যা কিছু উঠে মুখ তুলে তুলে—সূক্ষ্ম যা কিছু মুখ। নাবিয়ে নাবিয়ে একটি চুম্বনে—অর্থাৎ ডিমার্কেশন লাইনটাই যাবে ভেঙেচুরে। সেনসুয়ালিটি নয়, স্পিরিচুয়ালিটিও নয়, মিশে অভেদ, অভিন্ন।

এই রকম সবসময় মনোরমার মুখখানা হাসিতে ঝলকে ওঠে :

—বেণু, কবিতার কতখানি মুড়লি তোরা? সবটা? বনানী অহংকার করে না, করতে পারে না, অস্ফুটে বলে :

—বড়ো কঠিন মেজদি। আমরা চেষ্টা করছি।

সুরমার মুখ বলে : নাই বা হল পারে যাওয়া—চেষ্টা তো করছিস্। ইট ইজ এ প্লেজার টু সেল টোগেদার।

কিন্তু, বনানীর ভাবনা, তাদের চেষ্টা অ্যামেচারিজমের অন্তর্গত। এখনো শিল্পের বৈদগ্ধে পৌঁছয়নি। প্লেজার বড় কথা নয়। চাই ধন্যতা।

—বেণু, তোমাকে সারপ্রাইজ দেবো।

অনিমেষের হাত মুঠো। মুঠো খুলে বেণু বার করে দু'খানা টিকিট নিউ-এম্পায়ারের। রবিশঙ্করের সেতার, সঙ্গতে আল্লারাখা।

শুরু হল আলাপ ধীর, শান্ত, করুণ বিস্তার। গতি একটু করে বাড়ছে আর রসের বদল হচ্ছে। বুকের মধ্যে থেকে থেকেই মোচড় দিচ্ছে বনানীর, চোখ সজল। সমুখেই ধ্যানী রবিশঙ্কর। একাকী রবিশঙ্কর। নিঃসঙ্গ রবিশঙ্কর। মাত্র সঙ্গীতের সঙ্গকামনায় বিভোর রবিশঙ্কর। তারপর গৎ, সঙ্গত আল্লারাখার। জোড় আর ঝালায় ক্ষিপ্র দ্রুততা—শুরু হল সওয়াল-জবাব। একটু একটু বাজছে সেতার, থামছে—হাসি হাসি মুখে রবিশঙ্কর আল্লারাখার দিকে তাকিয়ে; মুহূর্তে তবলা তুলছে সেতারের সেই বলনছন্দ, হাসিমুখ আল্লারাখা রবিশঙ্করের মুখে তার দৃষ্টি নিবদ্ধ। সমস্ত হল ফেটে পড়ছে মুহুর্মুহু হাততালিতে। তার মনে হল: ওদের যুগ্ম-ভালোবাসা মঞ্চ থেকে নেমে নুয়ে বসন্তের সুখ-হিল্লোলের মত ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে সকলের হৃদয়। ফুটিয়ে তুলেছে, অশোক-পলাশ। পুলক লাগল সারা অঙ্গে। বনানী অনিমেষের হাতে হাত রাখল; অনিমেষ হাত ভরে নিল মুঠোয়।

সমস্ত পথটাই নির্বাক। সেই বর্ষামঙ্গল দেখবার মত। প্রথমে তার খুব আনন্দ হয়েছিল, কিন্তু হল থেকে বেরিয়ে ভরে উঠেছিল বেদনায়—এমন দ্বৈত হতে না পারলে ঢেউ ওঠে না যে ভালোবাসায়। দ্বৈতের সওয়াল-জবাবে পুলক লাগলেও, সকলের মত মনহরণ হলেও তার চিত্ত উধাও হয়েছিল আলাপ-অঙ্গে। সঙ্গীত যেখানে অনন্য, শুদ্ধ, শান্ত। যেখানে নাট্য অঙ্গে নেই, অভিনয় অংশ নেই—আহত ধ্বনিগুলি এক মহাস্তব্ধতার কাছে সম্পূর্ণ নিবেদন। অকস্মাৎ তার মনে হয়, শ্রেষ্ঠ আছে দ্বৈত অপেক্ষাও একাকিত্বে। কিন্তু, বনানী হে, সেই একাকিত্বের আকাশে অনেকক্ষণ বিচরণ যে সম্ভব নয়—তাকে নামতেই হয় ধরাতলে—দ্বৈতের আসরে।

১৯৪৫ সালের কয়েকটা মাস সুখেই কাটল। লেখা ছাপানো, কাগজের অফিসে যাতায়াত, লেখকদের সঙ্গে আলাপ, দু'একজন লেখিকাও। এঁদেরি কারুর সঙ্গে বনানী যেতে শুরু করেছে প্রগতি-

লেখক-সঙ্ঘে। একদা পরিচয় সভায় যেতে সাধ ছিল তার—হয়নি। এখানে একদিন বিষ্ণু দেকে দেখল, শুনল আলোচনা। প্রগতি-লেখক-সঙ্ঘ ছাড়াও, আই, পি, টি, এ, তার সঙ্গেই রবিশঙ্কর, মিউজিক্যাল কনফারেন্স, চার্লি-চ্যাপলিন, আর্ট-একজিবিশন মিউজিয়ামে, আর্ট কলেজে।

অনেক দিনের পরে লতিকাদের বাড়িতে। নিরু ছিল না সঙ্গে—অনিমেষও নয়।

লতিকা বলল: ইস্, কী ডুমুরের ফুলই না হয়েছিস। দেখাই পাওয়া যাচ্ছে না।

জ্যোৎস্না: আজ প্রোগ্রেসিভ রাইটার্স অ্যাসোসিয়েশন তো কাল আই, পি, টি, এ, খবর পেয়েছি কখনো কখনো পার্টির সেল মীটিং এ যাচ্ছিস।

লতিকা: নিরুর খবরদারীতে চলে যাচ্ছিস তুই, আমরাও ছাড়তুম না। জোর টাগ্ অফ্ ওয়ার চলত, কিন্তু, করব না।

—কেন?

লতিকা: নিরুর সঙ্গে নিরুর ভাইও আছে। পেরে উঠব না। তার জোর বেশী।

জ্যোৎস্না: প্রগতি-টগতি যাই কর বেণু, ভুলবিনে, আমরা মেয়ে আমাদের একটা স্বতন্ত্র ফ্রন্ট আছেই।

লতিকা: বেশীর ভাগ ইনটেলেকচুয়াল্ বামপন্থায় আগ্রহী। শিল্পীর পক্ষে ওটা ততক্ষণই ভালো যতক্ষণ না সে তার কবজায় চলে যায়। শিল্পী সবসময়ই স্বতন্ত্র থাকবে, সমস্ত মতবাদের উর্ধ্বে। মনে রাখিস্ সেকথা।

মাসিমার সঙ্গে দেখা করতে বললেন, বড্ড রোগা হয়ে গেছ বেণু। মাসিমা দীর্ঘশ্বাস চাপলেন। বেণু পালিয়ে বাঁচল।

ফেরার সময় ট্রামে বসে বনানী ভাবে: বন্ধুরাও কত ভুল করে। সে কারুর কবজাতেই চলে যায়নি, নিরুর নয়, অনিমেষেরও নয়।

ক্লান্তি থেকে মুক্তি পাবার জন্যই সাহিত্য দর্শনের সঙ্গে গঠনমূলক কাজকে জরুরী ভেবেছিল। কাজ করতেই নিরুপমার সঙ্গে আসা। পরিচয়ও অনেকের সঙ্গে। সঙ্গে গেলেও সে জানে: গভীর পার্থক্য তার ও নিরুর মাঝখানে। নিরু কাজে বিশ্বাসী, প্রচুর কাজেই তার আনন্দ। মন্বন্তরে ক্যান্টিনে ক্যান্টিনে কাজ করেছে। এখন গ্রামে যায়। বেণু দু'চারবার গ্রামে গিয়েই অসুস্থ হয়ে পড়ল—শরীর তার কোনোকালে সুস্থ নয়। তাছাড়া, মিথ্যে বলতে ভালো লাগে না তার, চায়ও না। একথা স্বীকার্য—কাজের আকর্ষণের চেয়ে শিল্পের আকর্ষণই বেশী। ভালো লেখা, ভালো বলা, ভালো ছবি, ভালো গান—এখনো তাকে টানে।

জ্যোৎস্না, লতিকা, বাণী, বেলারা ভাবে, হঠাৎ করে সে এক ঝোঁকা পার্টি প্রেমিক হয়ে গেছে, আর নিরুপমা ক্ষুব্ধ:

—তোর কাছে কত আশা ছিল, অথচ তুই কিছুই করলি না। অনিদাটাকেও না বুর্জোয়া বানিয়ে তুলিস্।

বেণু ভাবে, কেউ তাকে ঠিক্ বোঝে না।

জোড়াসাঁকো থেকে ফিরছে দুজনে। পঁচিশে বৈশাখের উৎসব চলেছে। ডালহৌসী ঘুরে ট্রাম এসপ্লানেডে ওরা নামল। রাসবিহারীর ট্রাম ধরবে। একটু এগিয়েই নজর পড়ল ছোটখাট জনতা হকারদের ঘিরে।

—টেলিগ্রাম, জবর খবর, হিটালারের হার।

অনিমেষ কিনল একখানা। ট্রামে বসেই পড়ল দু'জনে। ৯ মে আত্ম-সমর্পণ করেছে জার্মানী। যদিও পরাজয়-সূচনা দেখা দিয়েছিল আগেই। নাজী-জার্মানীর পরাজয়ে ইউরোপ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে। সারা পৃথিবীর শান্তিকামী মানুষরা ভাবছে—এবার শান্তি।

বনানী: আমার কার কথা মনে পড়ছে, জানো?

অনিমেষ: কার কথা?

বনানী: রম্যাঁ রল্যাঁ। প্রথম যুদ্ধে এই মানুষটি প্রাণপণ

করেও বলেছিলেন, "শান্তি, যুদ্ধের উর্ধে।" তিনিই হলেন এই যুদ্ধের প্রথম শিকার। আজ নিশ্চয়ই বিধ্বস্ত ফ্রান্স আনন্দ করছে। কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সাধারণ মানুষের সঙ্গে পথে নেমে পড়েছেন: সার্ত্র, কামু, ফ্রেডরিক জোলিও, আইরিন কুরী; অথচ রল্যাঁ নেই। তিনি কন্সেন্ট্রেশন ক্যাম্পে। পালাতে পারবেন কিনা, জানি না।

বনানীর খুশি অথচ বিষণ্ণ মুখের দিকে তাকিয়ে অনিমেষ বলল: —আমার মনে হয় পারবেন না। রল্যাঁর চরিত্র অনেকটা গান্ধীজীর মত।

ঘরে ঢুকেই দেখে নিরুপমা। জড়িয়ে ধরল বনানীকে।

—বেণু, শান্তি, শান্তি। আমার কী আনন্দ হচ্ছে, কী বলব। নাচতে ইচ্ছে করছে।

—বেণুকে জড়িয়েই একপাক ঘুরে নিলো নিরুপমা।

—অনিদা, ভাবতে পারো, সোভিয়েতের পথে পথে মানুষ। শহরে, গ্রামে, আনাচে-কানাচে, ছেলে-মেয়ে, পুরুষ-নারী, বৃদ্ধ, বৃদ্ধা। গান গাইছে, নাচছে, খাচ্ছে, খুশিতে ফেটে পড়ছে। বার্লিনের পতন হয়েছে—আর যুদ্ধ নেই, সারা দুনিয়ায় শান্তি।

নিরুপমার প্রত্যেকটি কথা যেন এক একটি খুশির তুবড়ি। আলো ছিটকে পড়ছে খুশির। আলোর ফুলকারি।

বনানীর সব বন্ধুই খুশি। সব আত্মীয়, সব পরিচিত জন। ভারতবর্ষ, বঙ্গদেশ, সারা কলকাতা খুশি। লতিকা হেসে উঠল: আমাদের শনিবারের আড্ডাটা আবার জাঁকিয়ে করা যাবে। সন্ধ্যা হতেই ফিরতে হবে না।

জ্যোৎস্নাও খুশি: সন্ধ্যা নামতেই বাড়ি ফেরবার তাড়া থাকবে না।

সুধাময়ী উজ্জ্বল: আঃ কী আরাম। কলকাতা আবার আলোয় আলো হবে। থেকে থেকেই সাইরেন বাজবে না ভয় দেখিয়ে।

মোক্ষম প্রশ্ন তুললেন মায়ালতা: কিন্তু, কালোবাজারীরা জব্দ হবে তো? চাল, তেল, কয়লা, কাপড় সস্তা হবে কি? আর যে পারা যায় না। সংসার সামলাতে নাজেহাল হয়ে যাচ্ছি।

খুশির দিন সহজেই যায় ফুরিয়ে। ফুরোলো। মে থেকে জুন, জুলাই দু'টো মাস বাদেই আগস্ট। ৬ আগস্ট আণবিক বোমা পড়ল হিরোশিমায়। বনানী বলল :—যুদ্ধ তো শেষ হয়ে গেছে। মিছিমিছি নিরীহ মানুষগুলির ওপর কেন এই অত্যাচার? শুনছি, শহরটা পুরো ধ্বংস হয়ে গেছে। লক্ষাধিক মানুষ মারা গেছে—এই ভস্মস্তূপের ওপর যে দু'চারজন বেঁচে আছে—তারাও প্রতিবন্ধী হয়ে থাকবে, ক্রিপল। আমি ভাবতে পারছি না।

—আমিও না। কোন কারণ নেই ফেলার। মনে হচ্ছে, একটু শাসিয়ে একটা পরীক্ষা করা হল। প্রেসিডেন্ট ট্রুমান আমেরিকা-বাসীর কাছে এর সাফল্য নিয়ে রেডিয়ো ভাষণ দিয়েছেন।

দু'টো দিন যেতে না যেতেই নাগাসাকি। এবার বেণুর গলা ভেঙে গেল, চোখের কোলে জল :

—কোনো দেশেরই সাধারণ মানুষ যুদ্ধ বাধায় না। তারা বাধ্য হয়েই হাতের পুতুল হয়ে যায় রাষ্ট্রশক্তির। যুদ্ধ শেষ হবার পরেও কেন এই লাঞ্ছনা? শুধু জার্মানীই অপরাধী নয়। আমেরিকাও এই কাজ করল।

—বেণু, কোন একটা গোটা দেশ অপরাধী হতে পারে না। সব দেশেই শুভবাদী মানুষ আছেন, স্রোতে ভাসা মানুষের সঙ্গে মিলিয়ে। হয়তো অনেক আমেরিকানই এই বিস্ফোরণের বিরুদ্ধে।

—আমি বুঝতে পারছি না কিছু, অনি, কিছুই বুঝতে পারছি না। মাথাটা ঘুরে যাচ্ছে।

বনানীর জানা ছিল না সেদিন, আণবিক-আবিষ্কারকদের কতজন ছিলেন ভারাক্রান্ত গভীর দুশ্চিন্তায়। ১৯৩৯এর জানুয়ারীতেই তারা দেখতে পেয়েছিলেন আকাশ কালো করা ঘন মেঘ নুয়ে পড়েছে পৃথিবীর ওপর। বাতাসে যুদ্ধের বারুদ গন্ধ। জার্মানীর গটিনজেন নগরে একা সমবেত ছিলেন তাঁরা। আইনস্টাইন, নীলস্ বোর, অটোহান। অটোহানের মনে হয়েছিল—এই আবিষ্কার যদি চলে যায় অস্ত্রের কবলে তাহলে নিশ্চিত এই আবিষ্কার ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে।

বনানী-অনিমেষের সেদিন জানা ছিল না : হিরোশিমা-নাগাসাকি দিন দুটো কী পরিমাণ কালো দিন ছিল, আইনস্টাইন, নীল্‌স্ বোর, অটোহান, ফ্রাঙ্ক, জিলারের ( Szilard ) কাছে। আণবিক বোমা বিস্ফোরণের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেও ব্যর্থ হলেন তাঁরা। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের কাছে যে চিঠি লিখলেন জিলার ( Szilard ) যাতে সই দিলেন আইনস্টাইন ভয়ংকরত্ব জানিয়ে, খোলা হল না সে চিঠি। রুজভেল্টের টেবিলেই পড়ে রইল—মৃত্যু হল তাঁর।

অনিমেষ চৌধুরী এবং বনানী রায় চৌধুরীর সেদিন এও জানা হয়নি : জিলারের অকৃপণ প্রয়াস ও ব্যর্থতা। দীর্ঘদিন ধরেই চেষ্টা করেছেন যাতে আণবিক অস্ত্র এভাবে প্রয়োগ না করা হয়। তাঁর ব্যর্থতা বৈজ্ঞানিক মাত্রেরই ব্যর্থতা। এই সৎমানুষটি বড়ো বেদনায় পদার্থবিজ্ঞান থেকে সরে গেলেন জীববিজ্ঞানে। আর তাঁর উচ্চারণটি হল মহৎ উচ্চারণ—এই ট্র্যাজেডি সমস্ত মানুষের।

যে ৭ আগস্টে যন্ত্রণাতুর বনানী এবং শুভবাদী অনেক মানুষ-মানুষী—সেই ৭ আগস্টেই আমেরিকার এক বৈজ্ঞানিক তাঁর ডায়ারীতে লিখেছিলেন : "প্রফেসর হান্ অ্যাটমিক ফিউসানের ভয়ঙ্কর ধ্বংসসক্ষমতা সম্পর্কে অবহিত হবার পর অনেকগুলো রাত কাটিয়েছেন বিনিদ্র, ঘুম হয়নি, আত্মহত্যার কথাও ভেবেছেন।" ৬ আগস্টের পর বন্ধুরা তাঁকে পাহারা দেন অনেক রাত পর্যন্ত।

—আচ্ছা অনি, যে অ্যাটমিক এনার্জী দিয়ে ধ্বংসের কাজ করা হল, তা দিয়ে ভালো কাজও তো করা যায়।

—নিশ্চয়। এনার্জী বা শক্তি অ্যাবসল্যুট তত্ত্ব। তুমি তাকে যে ভাবে ব্যবহার করবে।

বনানী : আগে ভাবতুম, সাহিত্য আর দর্শনকে জানলেই জীবনকে জানা যায়—যদিও, শিল্প-সঙ্গীত এসে যায় সঙ্গেই। আসলে ভাবতাম—এস্‌থেটিক্‌সের ওপরেই জীবন দাঁড়িয়ে। এখন বুঝতে পারছি, জীবন দাঁড়িয়ে সময়ের ওপর। সেই সময়টাকেই চিনতে পারছি না। শুধু

নন্দনবোধে চেনা যায় না। কেন যে বিজ্ঞান পড়িনি, মূর্খই থেকে গেলাম।

বেণু, তুমি মিথ্যেই নিজেকে কষ্ট দিচ্ছ। আমরা সকলেই এই দোষে দোষী। সকলেরি পড়াশোনা একপেশে।

—তুমি তো বিজ্ঞানই পড়েছ, সাহিত্যে যথেষ্ট রুচি সত্ত্বেও। সঙ্গীত জানিনে, শিল্পকলাও কম বুঝি, দর্শনেও তোমার চেয়ে কম অধিকার।

বনানী : আজকের এই যুগান্তকারী বিজ্ঞানের দিনে, বিশশতক যে এরি সঙ্গে জড়িয়ে। হিরোশিমা-নাগাসাকির ব্যাপারটা আমাকে স্থির থাকতে দিচ্ছে না। আমাকে একটু পাঠ দিতে পারো? কিন্তু, আমি কি বুঝব কিছু? বিজ্ঞানের অ আ, ক খও যে জানিনে।

অনিমেষ : বিজ্ঞান এত বৃহৎ, ব্যাপক, বহুধা বিভক্ত আমিই বা তার কতটুকু বুঝি। আমি টেক্‌নিক্যাল্ দিকে যাব না। সাহিত্য, শিল্প, দর্শনের মত বিজ্ঞানেরও আছে, "দ্য সোস্যাল এণ্ড ইনটেলেকচুয়াল ব্যাকগ্রাউণ্ড।" বাঙলা পরিভাষায় কী বলা যায়, বলো তো?

অনিমেষ থেমে থাকল এমন ভঙ্গীতে, যে তার দ্বারা এর বাংলা প্রতিশব্দ হতেই পারে না। আসলে সে চায় বনানী উৎসাহী হোক। শব্দ কটি মনে নাড়াচাড়া করল বনানী, বলল: "সামাজিক ও বৌদ্ধিক পরিবেশ।"

অনিমেষ :—মানুষ স্পেশালাইজেশনে ছু'একটা দিকেই এগিয়ে যায়—জেনারালাইজেশনে মোটামুটি পরিচয়, নানাদিক ছুঁয়ে ছুঁয়ে। সেই মোটা পরিচয়ের আগে বিজ্ঞানের সামাজিকও বৌদ্ধিক পরিবেশ" জানলে, তোমার পক্ষে সুবিধের হবে।

অনিমেষ বলে চলল। তার কিছু বুঝল, আর কিছুটা বনানী বুঝতে পারল না। এটুকু বুঝল—মডার্ন যুগ নেমেছিল গ্যালিলিও গ্যালিলেইয়ের সঙ্গে। তার পরেকার আবিষ্কারগুলি মানুষের সংস্কৃতি ও সভ্যতার আরোহণের জন্যেই—"ফর দ্য অ্যাসেন্ট অব ম্যান"। মানুষ এর স্বীকৃতিও দিয়েছি। প্রথম শংকার কারণ ঘটল ত্রিশ

দশকের আবিষ্কারগুলি যখন মুখোমুখি ১৯৩৯এর রাজনৈতিক-সামাজিক পরিবেশে।

বনানী বলল : আসলে আণবিক যুগটার শুরুই যে আকাশ যখন মেঘাচ্ছন্ন। বিজ্ঞান তো অপরাধী নয়। অপরাধ তার অপব্যবহার। একটু থামল, থেমে বলল :

—ভাবছি, কতখানি মর্মাহত আইনস্টাইন। ব্যক্তিগত শোকের মত।

১৯৪৫এর শেষ সাতমাস আর ১৯৪৬ এর শুরু কয়েকমাস বড়ো ব্যস্ততার মাস। যুদ্ধ শেষ, হিরোশিমা-নাগাসাকি, ভারতের নেতাদের মুক্তি, সারা বাংলা জুড়ে তেভাগা আন্দোলনের প্রস্তুতি, আই, এন, এ, বন্দীদের চাঞ্চল্যকর সংবাদ : সুভাষচন্দ্রের ইণ্ডিয়ান্ ন্যাশনাল আর্মি, আজাদ হিন্দ বাহিনী, যাঁরা বিজয়ীর বেশে ভারতে প্রবেশ করতে পারলেন না। ইংরেজের হাতে আত্মসমর্পণ করতে হল ব্রহ্মদেশে। নানা জল্পনা-কল্পনা : নিশ্চিত হবে কোর্টমার্শাল। এর মধ্যে ৪৬এর ২১শে ফেব্রুয়ারী বোম্বাইতে নৌ-বিদ্রোহ।

—বেণু, আর দেরী নেই। তেভাগা আন্দোলন চাষীদের। নৌ-বিদ্রোহে কংগ্রেস, লীগ আর আমাদের লালঝাণ্ডা একসঙ্গে উড়েছে। আর দেরী নেই। বিপ্লব আসছে। বিপ্লব আসবেই। নীলসমুদ্র লাল হয়ে যাবে।

উচ্ছল নিরুপমা, উজ্জ্বল। তার সমস্ত অস্তিত্ব যেন আনন্দের ঢেউ। সে ঢেউ বেণুর মনেও তরঙ্গ তুলল। এই সিঁড়িভাঙা সমাজটা তারও পছন্দ নয়। সেও চায় বৃহৎ এক পরিবেশ খোলা আকাশের নিচে ; বহুজনের সমৃদ্ধ সমবায়ে। সেখানে আছড়ে পড়ুক সমুদ্রের প্রাণবন্ত ঢেউ ; পড়ুক সূর্য, চন্দ্র, তারার উজ্জ্বল স্নিগ্ধ, স্মিত আলো। আলোয় আলোকময় হোক।

স্বাধীনতার সঙ্গেই উঠে পড়েছে দেশভাগের কথা। গান্ধীজী

রাজী নন খণ্ডনে। দেশভাগ হলে তাঁর মৃতদেহের ওপর দিয়ে হবে। মিঃ জিন্না রাজী নন, অখণ্ড ভারতে। স্বাধীনতা হস্তান্তরিত হবে কার হাতে? কংগ্রেস না লীগ? তাহলে খণ্ডন: পাকিস্তান চাই। সেদিন জোরদার হয়ে উঠেছে সমবেত আলোচনা।

কিশোর বললেন: শরৎ বসু আর হকসাহেবের যুক্তবঙ্গের মতটা আমার বেশী পছন্দ।

প্রতুলচন্দ্র: সেজশালা, তাহলে আমাদের চিরকাল মুসলমানদের অধীন হয়েই থাকতে হবে। আমাদের চেয়ে জনসংখ্যায় ওরা বেশী সবসময়ই আপারহ্যাণ্ড নেবে।

কিশোর: তা মনে হয় না, গড়বার ব্যাপারে আমাদের সাহায্য ওদের নিতেই হবে। আমরা ওদের চেয়ে অ্যাড্‌ভান্‌স্‌ড্‌।

বনানী: আর একসঙ্গে গড়তে গড়তে বৈরীতা যাবে খসে।

জ্যোৎস্না: তোর কল্পনা অর্থাৎ মনের ইচ্ছেটা তাই। কবি কিনা।

বনানী: কল্পনা নয়। অভিজ্ঞতা। আই, এন, এ তেও প্রচুর মুসলমান আছেন।

প্রতুলচন্দ্র: বৈরীতা যাবে না। সুযোগ এলেই হয়ে যেতে চাইবে মুসলিম-রাষ্ট্র। সবসময় মারামারি।

শরৎকুমার: সে কথা ঠিক, মারামারি হানাহানি চলতেই থাকবে। তার চেয়ে আধখানা ভালো। নেই মামার চেয়ে কানামামা।

মায়ালতা ক্ষীণ কণ্ঠেই বললেন: আসলে আমরা যারা পূর্ববঙ্গ বা উত্তরবঙ্গের, ভাগাভাগির কথায় বুক ভেঙে যায়। যতই কলকাতায় থাকি। শরৎকুমার, সুধাময়ী, জ্যোৎস্না সকলেই মায়ালতার কথার তাৎপর্য অনুধাবন করলেন। খণ্ড বাংলা তাঁদেরও পছন্দ নয়, কিন্তু এমনতর বুক ভেঙে যাবার মত বেদনা তাঁদের নেই। হঠাৎ আলোচনাটা থেমে গেল। কিছুক্ষণ পরে অনিমেষ বলে বসল:

—বাঙালী মুসলমানদের কিন্তু পূব পাকিস্তানে খুব মতি নেই।

শরৎকুমার: না থাকবার কারণ?

অনিমেষ: জানে অগ্রভাগ চলে যাবে পশ্চিম পাকিস্তানের

দিকেই। ওরা মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না। মার খাবে ভাষা, সংস্কৃতি।

প্রতুলচন্দ্র: তাহলে লীগের এত বাড়-বাড়ন্ত কেন? কায়েদে-আজমে এত ভক্তি?

অনিমেষ: ওই নেই মামার চেয়ে কানামামা। আমার মনে হয় বাঙালী মুসলমান এখন পাকিস্তানে সম্মতি দিলেও মনের গভীরে একথা গেঁথে রাখবে। তাছাড়া ভৌগোলিক সংস্থানটাও ওদের পক্ষে। ওরা চুপ করে থাকবে না চিরকাল।

কিশোর: তুমি কী বলতে চাও?

অনিমেষ: বলতে চাই, খুই বেশীদিন নয়; একটু পায়ের তলায় মাটি পেলেই বাঙালী মুসলমান বিদ্রোহ করবে। সংস্কৃতির জন্যে, ওরা মরতেও দ্বিধা করবে না। রবীন্দ্রনাথ ওঁদেরও হবেন।

এমন ভাবে বলল, যেন ভবিষ্যদ্বাণী করল।

কবিতা নয়, গল্পও নয়। রবিবাসরীয় কলম লিখছিল। লিখছিল, শুভবাদী রাষ্ট্রের কথা। সেই আদিকাল থেকেই দেখা যাচ্ছে, রাষ্ট্রশক্তি সর্বাধিক। শিল্পী, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, যাঁরা সত্য বলতে গিয়ে স্রোতের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে এর বিষদৃষ্টিতে পড়েছেন, রেহাই পাননি। সোক্রাটিসকে বিষপান করতে হয়েছিল, গ্যালিলেও অনেকদিন ছিলেন কারাগারে, দান্তেও হয়েছিলেন পরবাসী। অবশ্য আজকের দিনের বৈজ্ঞানিকদের মত ট্র্যাজিডির হিরো, বোধকরি গ্রীকযুগেও কেউ ছিলেন না। তবে সেদিনের ট্র্যাজিডির মতই সর্বব্যাপী ট্রাজিডি আজকেও, সমস্ত মানব-সমাজের। তাই শুভবাদী মানুষ-মানুষীর কাছে সেই রাষ্ট্রই জরুরী—যে হিউম্যান স্পিরিটকে বিক্রি করে না; কুসংস্কারে আচ্ছন্ন নয়—যেখানে সমস্ত মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণতা পায় দেহ-মন-বুদ্ধি-নন্দনবোধের সমবায়ে।

—বেণু, বেরুচ্ছিস নাকি?

—হ্যাঁ বাবা, কাল ছুটি, আজকেই লেখাটা দিয়ে আসি।

—আমার কিন্তু, খুব ভালো বোধ হচ্ছে না, বেশী দেরী কোর না। তাছাড়া অনিমেষকে আজ আসতে বললে পারতিস্।

—কি কাজ আছে যেন বলছিল। হয়তো কাল আসবে।

—সর্বনাশ। কাল জিন্না ভারতব্যাপী ডাইরেক্ট অ্যাক্শানের কল দিয়েছেন। কাল কী হবে, কেউ জানে?

বেণু বলে উঠল :

—কী হবে আবার। মীটিং হবে, মিছিল বেরুবে। মিছিলে শ্লোগান দেবে—পাকিস্তান চাই।

—আমার কিন্তু, মনে হচ্ছে, কাল মারামারি হবে!

—বাবা, তুমি অহৈতুক ভয় পাচ্ছ। দেখো, বিশেষ কিছুই হবে না।

বনানীর বিশ্বাস ছিল তাই। ভেবেছিল, ভয়ঙ্কর কিছুই হবে না। শুধু বনানী নয়, অনেক মানুষেরি ছিল সেই বিশ্বাস। আবার অনেকেই ভেবেছিলেন, অঘটন কিছু ঘটবে। পাড়ায় পাড়ায় প্রস্তুতি চলেছিল দাঙ্গা রোখবার। দাঙ্গা বনানী আরো দেখেছে, কিন্তু, তার মনে হচ্ছে, মানুষ অনেক বেশী সচেতন হয়েছে, এইতো সেদিন হয়ে গেল নৌ-বিদ্রোহ, রসীদ-আাল-দিবস।

বিশ্বাস নড়ে গেল। বিকাল হতে না হতেই খবর : দাঙ্গা শুরু হয়ে গেছে। মিছিল ধর্মতলায় এসেই শুরু হয়ে গেছে। মিছিল ধর্মতলায় এসেই শুরু করেছে দাঙ্গা। এখানে আগুন, ওখানে খুন—তার সঙ্গে ধর্ষণ। দাউদাউ জ্বলছে কলকাতা। দোকান লুঠ দু'পক্ষই তৈরী। ১৬ আগস্টের রাতটা আল্লা হো আকবর, লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান আর বন্দেমাতরম্ ধ্বনির উন্মত্ততার সাক্ষী হয়ে রইল। শুধু ১৬ আগস্ট নয় তিনচারদিন যে উন্মাদনা চলল—বনানী ভাবতে পারছে না, মানুষের কৃত বলে। প্রেসের অন্য সংবাদ নেই, কাগজের অন্য ছবি নেই, লোকমুখে অন্য কথা নেই।

অসম্ভব উতলা বনানী : অনিমেষের সংবাদ নেই। কস্‌বা থেকে

ছোড়দা এসে জানিয়ে গেছে, নিরুপমা আর রাবেয়া পার্টির কাজে বর্ধমান গিয়েছিল, এখনো ফেরেনি। লতিকারাও তো পার্কসার্কাসে, তাদের খবরও পাওয়া যাচ্ছে না।

জ্যোৎস্না বেরিয়েছে, যদি ফোনে অনিমেষ বা লতিকাদের সংবাদ পাওয়া যায়। হঠাৎ বনানীরা চমকে উঠল :

—বাবুগো, মেরুনি, মেরুনি, আমার দুধের বাচ্চা, কুনু দোষ করেনি, ওর বাপজান নেই।

আট দশ বছরের দুধের বাচ্চাটাকে গলা টিপে ম্যানহোলে ঢুকিয়ে দিচ্ছে, মা কাঁদছে বুক চাপড়ে।

জ্যোৎস্না-বনানী প্রতিবাদ করতে গিয়ে ধাক্কা খেল।

—জানেন কী, একশ জন মেয়ের ওপর বলাৎকার করেছে ওরা। আপনারা ওকালতি করছেন ?

মাটাকে টেনে নিয়ে গেল। দোষী-নির্দোষীর হিসেব নেই সেই মত্ততায়। খুনের বদলে খুন, ইজ্জতের বদলে ইজ্জত, অন্যায়ের বদলে অন্যায়। ডিমের ঝুড়ি গড়াগড়ি, বুড়ো মানুষটাকে রাসবিহারী থেকে টেনে ফার্ন রোডের ভেতরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে জোয়ান ছেলেরা দল বেঁধে।

বিশ্বাস নড়ছে, বিশ্বাস টল্‌ছে, বিশ্বাস পুড়ে ছাই !

চতুর্থদিনে অনিমেষ এলো। লতিকাদেরও খবর পাওয়া গেছে। ১৬ অগেস্টের সারারাত পাশের বাড়ির এক মুসলিম পরিবারই লুকিয়ে রেখেছিলেন তাদের। তারপর সতেরোর মাঝরাতে অনেক কষ্টে পাচার করেছেন ভবানীপুরে। এক কাপড়ে এসেছে ওরা। মস্ত বাড়ি ছেড়ে আত্মীয় বাড়ির আশ্রয়ে—ভাড়ার কথা পরে ভাবা যাবে। প্রাণ নিয়ে, মানসম্ভ্রম বাঁচিয়ে আসতে পেরেছে, এই ঢের। বাঁচিয়েছেন মুসলমান বন্ধুই।

ডাইরেক্ট অ্যাকশানের পঞ্চমদিনে দরজার গোড়ায় গাড়ি থামবার শব্দ। বনানী দ্রুত উঠোন পার হয়ে দরজা খুলল—নিরুপমার চিন্তাই

মনকে ছেয়ে আছে—নিরুপমাই—বিধ্বস্ত নিরু। মুখের আলো নেভা, যেন মৃত।

হাত ধরে নিরুকে আনল, বিছানায় বসিয়ে পাখার সুইচ অন্ করে দিল। কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে গেলাস্ দিল হাতে :

—জল খা, নিরু।

নিঃশেষে জল খেয়ে গেলাস নাবিয়ে রাখল :

—খবর পাচ্ছি, বর্ধমানে বসেই। ঠিক্ কতটা বুঝতে পারছি না। একটু ভালো খবর পেতে রওনা দিলাম। হাওড়া স্টেশনে নেমে হতভম্ব—একটাও যান-বাহন নেই। কী করে আসব? আমি অন্তত, তোর কাছে, রাবেয়া আমীর আলি অ্যাভেনিউতে। হঠাৎ রাবেয়া বলল :—নিরু, দেখ্।

তাকিয়ে দেখি, একটু দূরে দুদল দুদিকে। একদিকে গেরুয়া-পরা-সন্ন্যাসীরা—অন্যদিকে লীগের ঝাণ্ডা উড়ছে। দুজনেই দুজনের দিকে তাকালাম। আমি পা বাড়ালাম, এগিয়ে এলেন দুজন সন্ন্যাসী :—আসুন, মা, আসুন।

রাবেয়াও পা বাড়িয়েছে লীগের ঝাণ্ডার দিকে। সেদিক থেকেও দৌড়ে এলেন কয়েকজন। আমরা দু'জনে দুজনের দিকে ফিরে তাকাতেও পারছিনে।

মাথার চুলে হাত চালিয়ে দিয়ে টেনে ধরল, যেন সমস্ত চুল ছিঁড়ে ফেলবে।

—সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। বেণু, এই কয়েকটা দিন আগেই আমরা রসীদ আলী দিবস করলাম—হিন্দু—মুসলমান ছাত্রছাত্রী, রক্তপাত হল মিলিত আমাদের। ভয়ে সেদিন চৌরঙ্গীপাড়ার সাদা চামড়ার মানুষরা কেঁপেছে। আর আজ, রাবেয়ার মুসলিম লীগে বিতৃষ্ণা, তাকে তবু যেতে হল লীগের গাড়িতে—আর আমি এলাম হিন্দু-সন্ন্যাসীদের তদারকিতে।

নিরুপমার লম্বাটে ডৌলের মুখ আরো লম্বা হয়ে পড়েছে ঝুলে। যেন জিরাফের গলা। মুখের আলো নেভা, ভূত দেখেছে।

বিশ্বাস নড়ছে, বিশ্বাস টলছে।

আগুন থামছে না—আগুন জ্বলছেই। এক আগুন থেকে আর এক আগুন। আগুন অনির্বাণ। কলকাতা, নোয়াখালি, বিহার, পাঞ্জাব। দিন যায়, মাস যায়, প্রায় বছরের কাছাকাছি। হিংসায় উন্মত্ত ভারতবর্ষ। নিত্য নিষ্ঠুর হত্যা, নিত্য দানবিক অত্যাচার—শিশু, বৃদ্ধ, অসহায়ের ওপর। নিত্য নারী ধর্ষণ দল বেঁধে।

বিশ্বাস নড়ছে,—বিশ্বাস টলছে, বিশ্বাস পুড়ে ছাই।

কেমন যেন এক ভাগ হয়ে গেছে, সূক্ষ্ম চুলচেরা হিসাব। পার্কসার্কাস, পার্কস্ট্রীট, রাজাবাজার, শেয়ালদ'র পিছনের বস্তিগুলো মেছোবাজার, মর্গীহাটা ওদিকে যায় না এরা। ওরাও আসে না ভবানীপুর, বালীগঞ্জ, শ্যামবাজার, হাতীবাগানে। বনানী বরাবর পার্কসার্কাসের মধ্য দিয়েই উত্তর কলকাতায় যেত: এখন যায় না। যেতে পারে না, ধর্মতলা স্ট্রীটে নেমে, সেই আলোচনা সভাটিতে, মস্ত একতলার উঠোন পার হয়ে দোতলায় প্রগতি-সাহিত্য-সঙ্ঘের সভাটিতে। ছোট্ট এক বৃত্ত, সেই বৃত্তেই ঘোরাফেরা। কুৎসিত এক সন্দেহে, সেই সন্দেহেই চমকে পিছন ফিরে দেখা।

রাসবিহারী অ্যাভেনিউতে জনসংখ্যা বাড়ছে। তার সেই খোলামেলা ভাব আর নেই। যশোদা ম্যান্‌সন্‌ উপচে পড়ছে। কমলা গার্লস স্কুল ভর্তি। প্রায় বাড়িতেই আত্মীয়দের আনাগোনা। একটু জায়গা করে সরে যাওয়া। শুধু কলকাতার মানুষই নড়াচড়া করছে তা নয়। কলকাতাতেই মানুষ বাড়ছে। ঝাঁকের পর ঝাঁক আসছে, পুব বাঙলা, উত্তর বাঙলা থেকে। আসছে আত্মীয়-বন্ধুর বাড়িতে, আশ্রয়-শিবিরে। উদ্বাস্তু ক্যাম্পগুলো থইথই। একদিন যারা ছিল এই বাঙলার, রূপসী বাঙলার হৃদয়ের মানুষ: আজ তারাই উদ্বাস্তু, রিফিউজী।

আর উপায় নেই। নেই মামার চেয়ে কানামামা। অখণ্ড থাকল

না ভারতবর্ষ। থাকতে দিল না তার মানুষরাই, হিন্দু, মুসলমান, শিখ নির্বিশেষে। বনানী শুধুমাত্র বিদেশী সরকারকে দোষারোপ করা পছন্দ করে না। ফাটল নিজেদের মধ্যেই। গফুর মামার প্রতি দাদামশায়ের স্নেহ যেমন দেখছে, দেখছে প্রীতি ; অপ্রীতিও দেখেছে। বুদ্ধি-শুদ্ধির বাবাকেই দেখেছিল চাবুক কষাতে একটা বাচ্চা মুসলমান ছেলেকে, বৃষ্টিতে রান্নাঘরের দাওয়ায় উঠে পড়েছিল বলে। সমস্ত খাবার নাকি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। বেণু সেদিন ভেবে পায়নি. মানুষের ছায়ায় কী করে খাবার নষ্ট হতে পারে মানুষের।

৯ আগস্ট র‍্যাডক্লিফের হাতে কাটা হল বঙ্গদেশ, তার দুদিন পরেই পাঞ্জাব। ভেতরে ভেতরে চূর্ণ বনানী। থাকল না অখণ্ড বাংলা, থাকল না অখণ্ড ভারত। পাঞ্জাব-সিন্ধুর পুরো সিন্ধুদেশ গেল কাটা। দু'চোখে ব্যথা নিয়েই বলল অনিমেষকে :

—ভারতের মানচিত্র গেল বদলে। ভূগোল আলাদা হল, ইতিহাসও পৃথক হয়ে যাবে।

তবু ১৫ আগস্ট পথে নেমেছিল। নেমেছিল সে, অনিমেষ, নিরুপমা, জ্যোৎস্না, হিমানিশ। লতিকা, বাণী, বেলারাও এসেছিল। থইথই কলকাতা। সারা কলকাতার মানুষ পথে। লোকে লোকারণ্য। ভ্রান্ত মানুষ, ক্লান্ত মানুষ, রক্তাক্ত, পীড়িত আর্ত মানুষ, এই রুদ্ধশ্বাস জীবন থেকে মুক্তি চায়। কতদিনের আকাঙ্ক্ষার ধন স্বাধীনতা। কতদিনের সংগ্রামের আশ্বাস স্বাধীনতা। উড়ছে ত্রিবর্ণ পতাকা। বাড়িতে বাড়িতে পতাকার মালা। জাতীয় পতাকা আজ রাষ্ট্র-পতাকা। রাত বাড়ছে, বাড়ছে মানুষ। রাসবিহারী অ্যাভেনিউ এখন রাস্তা নয় : নদী। মহাসমুদ্রে মেশবার জন্য উত্তাল। রাত বারোটা বাজল। রেডিয়োয় বাজল জওহরলালজীর কণ্ঠস্বর। স্বাধীনতা। বেণুও হেসে উঠেছিল :—নিরু, জ্যোৎস্না, আমরা আজ স্বাধীন। আনন্দ সমুদ্রে সেও হয়ে যেতে চেয়েছিল একটি ঢেউ। হতে চেয়েছিল নন্দিত-বিহ্বল।

বুকের গভীরে ব্যথা ছিল তবু। আগস্টকে বনানী জীবনে বেদনার মাস বলেই জানল। তার প্রথম ব্যথার আগস্ট ১৯৪১এর ৭ আগস্ট। সেদিন অস্তিত্বের পরমাত্মীয়কে হারিয়েছিল। দ্বিতীয় বেদনার আগস্ট, ১৯৪৫এর ৬ আর ৯ আগস্ট, হিরোশিমা-নাগাসাকি দিবস। তৃতীয় শোকের আগস্ট ১৯৪৬এর ১৬ আগস্ট, ডাইরেক্ট অ্যাক্‌শানের দিন। ১৯৪৭ এর ১৫ আগস্ট এলো দুঃখ-সুখের মালা গলায় দুলিয়ে। স্বাধীনতা! এই স্বাধীনতার জন্যে কত মৃত্যু, কত দুঃখ বরণ, কত বছরের পর বছর কাটানো কারাগারে। স্বাধীন হয়েও সে তবু ভুলতে পারেনি তার দুঃখকে। এ কোন্ স্বাধীনতা? রক্তাক্ত দ্বিখণ্ড বাঙলা ভাগ হয়ে গিয়ে পূর্ব পাকিস্তান আর পশ্চিমবঙ্গে ছট্‌ফট্‌ করেছিল তার বুকের মধ্যে। বড়ো বেশী রক্ত মাখা হয়ে গেল। বুকের মধ্যেই শুনতে পেয়েছিল, ছলোচ্ছলো কান্না :

—বেণু, ভালো আছ?

আর পদ্মার মায়া ঘনানো রাজশাহীকে দেখতে পাবে না। আর বসা যাবে না তার জলের ধারে, করা যাবে না কুশল প্রশ্ন। এই সব ভেবে পঁচিশ বছর বয়সেও দু'হাতে মুখ ঢেকে কেঁদেছিল বনানী। সবচেয়ে বেশী, তার আত্মীয়-বন্ধুগুলি, প্রথম জীবনের শ্রদ্ধেয়া শিক্ষিকা সুষমাদি সকলেই যে পথের ধুলোয় নামল। এদের যে ভোলা যায় না। রক্তের গভীরে এঁদের সঙ্গে বন্ধন।

মায়ালতা বললেন : নন্দরাও চলে এসেছে। ট্যাংরা না কোথায় যেন? কিশোরের কাছে চিঠি এসেছে। যাবি নাকি দেখা করতে?

নন্দ মাসিমা। তেরো বছর বয়সের দু'টো মাসের সাহচর্য-স্মৃতি। খুঁজে খুঁজে এলো। মস্ত এক নর্দামা, থিক্‌থিক্‌ করছে, তার পাশেই। মাত্র একখানা ঘর, ভাঙাচোরা খোদল খোদল—তাতেই ছেলে-মেয়ে-স্বামী-ননদ শাশুড়ি। নন্দরাণী-বনানী পরস্পরের দিকে তাকিয়েছিল নির্বাক। বাচ্চাগুলোর হাতে লজেন্স, বিস্কুট দিতে গিয়ে হাত কাঁপতে লাগল। এর চেয়ে কিছু চাল হলে ভালো হ'ত। ছোট ছেলেটা কাঁদছে বসে :

—ভাত খাবো—ভাত।

নিঃশব্দে সময় কাটল। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বনানী একসময় বলল :

—উঠি। আবার আসব।

—আসিস্। নন্দরাণী বলল ততোধিক দীর্ঘশ্বাসে।

দ্বিতীয় দিনে নন্দরাণী অনেকখানি সহজ। সামলে নিয়েছে। চেষ্টা করছে মানিয়ে নিতে। তবু তারা সকলেই আসতে পেরেছে। কত মেয়ে যে স্বামী হারিয়েছে, সন্তান, কতজনের গেছে সম্ভ্রম। নন্দরাণী হেসে অভ্যর্থনা করল :

—আয় বেণু, বোস্।

বলে চলেছিল একটানা। কেমন করে আসতে পেরেছে। কত মেয়ে কতমূল্য দিয়েও বাঁচাতে পারেনি, বাপ, ভাই, স্বামী, সন্তান।

বনানী হঠাৎ ব্যাকুল, হাত ধরল নন্দরাণীর।

—নন্দমাসি, অন্য কিছু বলো।

—অন্য কী বলব রে? অন্য কিছুই নেই।

—আছে আছে। এমন কিছু বলো, যাতে ঘৃণা না ধরে যায় মানুষের ওপর।

দপ্ করে জ্বলে উঠল নন্দরাণী। দপ্‌দপ্ চোখ, সারা শরীর কাঁপছে থরথরিয়ে। কলকাতায় বাস করা এই মেয়েটা কী বুঝবে তাদের যন্ত্রণা? হলেই বা আত্মীয়। বালীগঞ্জের সুরক্ষিত ব্যূহে বসে শুধুই দেখেছে—আগুনের মধ্য দিয়ে পুড়ে আসতে হয়নি। ভুলে গেল, বেণু অভ্যাগত। চীৎকার করে উঠল :

—ওদের ওপর এত দরদ, ওরা আবার মানুষ? ওদের ওপর ঘেন্না না ধরলে জানব, তুই আমাদের কেউ নোস্, হিন্দু নোস্।

—জানি। অনেক দুঃখ পেয়েছ তোমরা—ঘর বাড়ি, টাকা-কড়ি, গয়নাগাঁটি, গোরু বাছুর, জমিজমা, সব গেছে—এক কাপড়ে এসেছ—শুধু প্রাণটুকু নিয়ে—তবু একটু খুঁজে দেখ। একটু ভেবে।

নন্দরাণী অবাক্। বনানী যেন ডুবে যাচ্ছে অগাধ জলে। বাঁচবার

জন্যে, আঁকড়াবার জন্যে কিছু চাই তার। একখণ্ড ভেসে যাওয়া কাঠ বা ঐ জাতীয় শক্ত কিছু।

একটু দম নিয়ে বলল :

একটা মেয়ের কথা জানি। আমাদের সঙ্গেই এসেছে। মেয়েটা সুন্দরী। একরাতে মশাল জ্বালিয়ে একটা দল ওদের দরজা ভাঙল। লুকোতে পারল না, একেবারে শোবার ঘরে। ওকে দেখে লোক-গুলোর চোখ জ্বলছে, জিভে লালা। বলির পাঁঠার মত থরথরিয়ে কাঁপছে মেয়েটা। হঠাৎ কী-যে মাথায় খেলে গেল—আলনা থেকে একটা শাড়ী টেনে নিয়ে বাচ্চাটার মুখে গুঁজে দিল, দিয়েই আছাড় খেয়ে পড়ল বুড়ো সর্দারটার পায়ে :—বাপজান, আমি আপনের বিটি। বিটির ইজ্জত বাঁচান। আর ওই আপনের জামাই-নাতি, উয়াগরেও আপনের হাতে দিলাম, প্রাণ রাখেন ওদের। আর যা আছে, নিয়া সব দিয়া দেন।

একটু থামল নন্দরাণী। বনানীর বুকের মধ্যে হাতুড়ির ঘা। না জানি এরপর কী শুনবে।

—জানিস্ বেণু, মানুষ-যে কী, তাই বুঝলাম না এখনো। গল্প কথার মতই সর্দার হাঁক ছাড়ল :

—খবরদার। কেউ এগোবা না। কেউ হাত দেবা না আমার বিটির গায়ে। দিলে জান থাকবে না। জামাই-লাতির গায়েও হাত লয়। টাকাকড়ি, গয়না-গাঁটি, বাসন-কোসন, ধান-পান, গোরু-বাছুর নিয়া যাও। আমি পরে যাচ্ছি।

মেয়েটা উঠে সিন্দুকের চাবি এনে দিল। কানের দুল, গলার হার, হাতের ছ'গাছা চুড়ি খুলে দিল বুড়োর হাতে।

সবাই চলে গেলে সর্দার বলল :

—বিটি, আমাগরেরো নিয়ম-কানুন আছে। কথা হয়েছে, পাকিস্তান ছাড়ি যাতি হবে তোমাদের। তোমরা হিন্দুস্তানেই যাও।

—যামু বাপজান। আপনে যেদিন ক'বেন।

পরদিনই বুড়ো সর্দার ওদের নিয়ে রওনা দিল। নিজে এলো

বর্ডার পর্যন্ত। বর্ডারে পৌঁছে যোগমায়া বলল: নমস্কার—না, আদাব। আপনেরে জীবনে ভুলুম না।

সর্দার জামার চোরা গোপ্তায় হাত ঢুকিয়ে কী যেন বার করল, যোগমায়া অবাক্—তার "হাতের ছ'গাছা চুড়ি, সর্দারের ভাগে পড়েছিল—তার হাতে দিয়ে সর্দার বলল:

নিয়া যাও, কামে লাগবা নে। নিরাশ্রয় হয়্যা যাচ্ছ।

একটু চুপ করে থেকে শেষ কথা বলেছিল:

—আল্লা তোমার মঙ্গল করবনে। খোদা হাফিজ।

বৃদ্ধ মুসলমানের কথাই শেষকথা নয়। আল্লার মর্জি বুঝতে পারেনি বনানী, বোঝেনি করুণাময়ের করুণা। বাতাসে পোড়া গন্ধ। সে দেখছে: এখনো মানুষ ছুটে আসছে, আগুনে পোড়া ঝলসানো। মাসের পর মাস কেটে গেল, আগুন তবু নিভল না। আসছে আশ্রয় হারা, উদ্বাস্তু। শুধু আসছে নয়, আসবে। আজ-কাল-পরশু, সপ্তাহ, মাস, বছর, অনেক হাজার দিনের পরেও আসবে। বিশ্বাস করবে, থাকবে; বিশ্বাস ভাঙবে ছুটে আসবে। এসেও সমস্যা মিটবে না। ক্যাম্পে, উদ্বাস্তু ভাতায় সমস্যা যাবার নয়। মানুষের জঙ্গলে মানুষ। অরণ্য আদিম, ভয়াবহ। প্রেমের নামে, অহিংসার নামে এই আদিমতার হাত থেকে অব্যাহতি পেল না মানুষ। বনানী অসীম আশা আকাঙ্ক্ষায় উদ্‌গ্রীব ছিল গান্ধীজীর নোয়াখালি, শান্তি-সফর, বিহারের শান্তি-সফরের দিকে তাকিয়ে। কিন্তু, কোথায় শান্তি? কোথায় মৈত্রী হিন্দু-মুসলমানের? যত খণ্ডনই হোক্ সমস্ত মুসলমান চলে যাবেন না, ভারতবর্ষ থেকে পাকিস্তানে। সমস্ত হিন্দুই চলে আসবেন না ভারতবর্ষে। অনেকেরই আপন দেশ বুকে টান লাগাবে। দেশের মাটির মায়ায় অনেকেই যাবেন থেকে। অতঃপর কী হবে তাঁদের যদি না প্রীতি-সৌহার্দ্যে পরস্পরকে আলিঙ্গন করতে পারেন? ঈদের আলিঙ্গন, বিজয়ার আলিঙ্গন কী ধুলায় যাবে মিশিয়ে?

ম্লান বনানী, অনিবার্যভাবেই ভেঙে পড়া। কী হল সেই

ওয়েলিংটন স্কোয়ার থেকে বেলেঘাটার পদযাত্রায়। মহিলা-আত্মরক্ষা-সমিতি, পা মিলিয়েছিল শান্তি মিছিলে। জ্যোৎস্না, নিরুপমা, বনানী, বাণী, বেলা, এমন কি ধনী কন্যা লতিকাও বাদ যায়নি। ওদের মিছিলের ওপর গোলাপ জলের ফোয়ারা ঝরেছিল, ফুলের পাপড়ি অনেক। স্লোগান মুহুর্মুহু আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে—"হিন্দু মুসলিম ভাই-ভাই—ভুলো মৎ ভুলো মৎ।" গান্ধীজী বসেছিলেন মঞ্চে, পিছনেই সুরাবর্দী সাহেব। তবু ভুল হল, ভ্রাতৃত্ব ভুললো মানুষ। দ্বিখণ্ডনে হন্যে হয়ে এদিকের মানুষ ওদিকে—ওদিকের মানুষ এদিকে।

আগস্টের গোলমালের পর বনানী অনিমেষকে মেসে ফিরতে দেয়নি। অতএব অবস্থান সেই দু'খানা ঘরের একখানা ঘরে। অনিমেষের ছাত্র পড়ানো ছিলই—একটা চাকরিও যোগাড় হল অনেক কষ্টে। চাকরি হতেই বলল :

—বেণু, এত গায়ে লাগালাগিটা খুব ভালো নয়। একটা ঘর দেখি, এখানে না পাই, কস্‌বার দিকেই।

বনানী খানিকটা অবাক্ চোখে তাকাল :

—অনি, ভাবতে পারছি না যে সোস্যাল ধর্মগুলোকে তুমিও এই চোখে দেখ। তোমার বাবা-মা কাছে থাকলে আমার একথা বলা তুমি পছন্দ করতে না। ভুলে যাচ্ছ, আমি এক মেয়ে, আর বাবার শরীরও ভালো নয়।

অতএব ত্রয়ী পরামর্শ। জ্যোৎস্না বলল :—আমার পড়বার ছোট ঘরটা আমি খালি করে দিতে পারি। তক্তপোশ পড়বে না, চিলে-কুঠি। বিছানা পাতবে আর তুলবে সকালে। একটা দরজা, একটা জানালা মোটে! তোমরা ভেবে দেখ।

অনিমেষ : আরে, এ-যে মেঘ না চাইতে জল। কাছেও হল, গায়ে লাগালাগিও হল না।

জ্যোৎস্না : তোমাদের মন বোঝাবুঝি, মনোমালিন্য, ঝগড়া-ঝাঁটি, বেপরোয়া হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে না মাসিমা-মেসোমশায়ের চোখের

কানের কাছে। একমেয়ে তো, বেণুর একটুখানিকেই ওঁরা খুব বাড়িয়ে দেখেন।

অনিমেষ হাসল : আমরা ঝগড়া করি, এখবর কে দিল ?

জ্যোৎস্না : সাইকোলজি। ওটা নাকি ভালোবাসারি অঙ্গ। বেণু, ঝগড়ায় তেমন দড়ো নয়। জানিনে, তুমি কতদূর যাও।

অনিমেষ : কাছেই থাকবে, জানবে নিশ্চিত। একটা কথা, ভাড়া নিতে হবে কিন্তু।

জ্যোৎস্না : সার্টেনলি। তোমাদের দাক্ষিণ্য দেখিয়ে ইন্‌সাল্ট্ করব না। ভাড়া, রসিদ, সমস্ত পাকা কাজ।

অনিমেষ নিজের বাবাকে কিছু টাকা পাঠিয়ে এই সংসারের দায়ও কিছু নিয়ে নিল। ফলে, বরাবরের জন্য সেকেণ্ড ক্লাস ট্রামের যাত্রী। এই বয়সে এই দায়িত্ব বোধ, প্রতুলচন্দ্রের মনে পড়ল, তাঁর ছিল না। তিনি অনেকদিন কাটিয়েছিলেন মায়ালতার পিতৃগৃহে। কোর্টে যাতায়াত ছাড়া অন্য কিছু করেন নি। যদিও বনানীর ইন্‌টারেস্টই চরম, তবু মায়ালতা অপেক্ষা একটু অন্য চোখে দেখেন অনিমেষকে, দেখতে পারেন।

মায়ালতা : বেণুটাকে দেখছ, কেমন মনমরা, আনন্দ-উৎসাহ নেই।

প্রতুলচন্দ্র : বেণু বড়ো মুডী। মাঝে মাঝেই নিভে যায়।

মায়ালতা : সেটা আগের চেয়ে বেড়েছে। আসলে, ও সুখী হয়নি। সেইজন্যেই তোমাকে বলেছিলাম, তাড়া দিয়ো না. আর একটু বোঝাপড়া হোক।

প্রতুলচন্দ্র : আমার তো তা মনে হয় না, অনিমেষ বেশ ভালো ছেলে, বেণুকে ভালোবাসে, তার জন্যে ভাবে, কষ্ট করে।

মায়ালতা : তা ঠিক্, দায়িত্ববোধও যথেষ্ট। কিন্তু, বেণুকে সুখী করা। ও তো সাধারণ মেয়ে নয়।

কথাটা প্রতুলচন্দ্রের মনে ধরে গেল। বেণু অসাধারণ, অনন্যা। দু'জনেই ভুলে গেলেন, ৪২এর আগেই বেণু ভেঙেছিল। এখনকার

ভাঙনে যে প্রখরতা তা বয়সের, তা পরিবেশের, আরো চিন্তন আরো অভিজ্ঞতার। মাঝখান থেকে বেচারী অনিমেষ কিঞ্চিৎ অপরাধী হয়ে গেল।

তাই হয়। সম্পর্কজাত ভালোবাসায় সলতে যত জ্বলে, নেভে বেশী। আলো হবার চেয়েও ধোঁয়ায়। যদিও উস্‌কে আলো জ্বালাবার প্রয়াসও দেখা যায়।

অনিমেষ বলল : বেণু, অনেকদিন বাড়ি যাইনি, মন বড়ো টানছে। ভাবছি ক'দিন ছুটি নিয়ে ঘুরে আসব।

বনানী উৎসাহী : বেশ হবে। চলো কদিন ঘুরে আসি। এক জায়গায় থেকে থেকে স্থাবর হয়ে যাচ্ছি।

অনিমেষ ইতস্তত : তুমি যতবার গেছ, খুব স্বাভাবিক হয়নি।

বনানী ম্লান : জানিনে। আমার মধ্যে কী-যে একটা ডিফেক্ট আছে ; আমি যা নই, পেণ্ট্‌ করতে পারিনে, চেষ্টা করেও পারিনে।

অনিমেষ : ডিফেক্ট বলব না, ওই তোমার ক্যারেকটর। চতুরালিতে অনীহা। তাই বলছিলাম, নাই বা গেলে।

বনানীর ম্লান মুখ আরো আঘাত খেল। সেদিকে তাকিয়ে অনিমেষ বলল :

—আমাকে ভুল বুঝো না।

—তুমিও ভুল বুঝো না। আমাকে খুব বাজত যখন দেখতাম, আমার লেখাটাকে তোমাদের বাড়ির কেউ সীরিয়াস্‌লি নেন না। ভাবেন খেলা।

—তুমি যদি বেশী লেখ, নাম করে ফেলো, তখন আর ভাববেন না। কিন্তু, লেখাই যে ছেড়ে দিচ্ছ।

বনানী হেসে ফেলল : "বহিয়া যেতেছে সুসময়।" এই তো সেই সময়, লেখা নেই, গান নেই, ব্যক্তি বনানীই নেই, বধূ বনানী। বিশ্বাস করো, আমি তোমার বাড়ি যাবার আনন্দকে এবার একটুও ম্লান হতে দেব না।

এবার অনিমেষ ম্লান : সেদিকে একলহমা তাকিয়েই বলল :

—তাছাড়া সেই সময়ও নেই, যেসময় আমি ভাবতাম, ভালোবাসার অমল আলো—একশিখা থেকে আর একশিখায়, প্রদীপে প্রদীপে মালা। থাক্ সে কথা।

হঠাৎ বনানী অনিমেষের হাত ধরল, আকুল অনুনয় :

—আমাকে বারণ কোর না। পরিস্থিতিকে ফেস্ করতে দাও। আমি জানি, ইউ আর এ সাফারার অল্‌সো।

এক নিভৃত জগৎ। একান্তে। ভারতবর্ষের অঙ্গচ্ছেদের কাহিনী যেন পৌঁছয়নি এই নিস্তব্ধ তরঙ্গহীন লোকালয়টিতে। কয়েকঘর মুসলমান পরিবারের দু'চারঘর চলে গেছেন। রয়ে গেছেন : কাজী মহম্মদ জাফর সাহেব। অনিমেষের স্কুলের শ্রদ্ধেয় ইংরেজী শিক্ষক। তিনি দ্বিখণ্ডন তত্ত্বে অবিশ্বাসী। উদ্বাস্তুরা এখনো ভিড় জমায়নি। চিন্তাহীন এক স্বস্তির জগতে ছলছলিয়ে দিন কাটছে। বাড়ির প্রত্যেকের সঙ্গে সংযোগ—হাসি, গল্প, কোমর বেঁধে রান্না, ঘর গোছানো। সন্ধ্যেবেলায় পূর্ণশশী ফরমাস করেন, বেণু, ঐ গানটা গাও :

"আমার এঘরে আপনারি করে, গৃহদীপখানি জ্বালো হে"। কোনদিন অনিমেষের বাবা বলেন : বেণু মা, ঐটি গাও তো .

"ওহে সুন্দর, মমগৃহে আজি পরমোৎসব রাত্রি।"

ননদ বলে : বৌদি, কবিতার খাতাটা কেন আনলে না? বেশ শোনা যেত। সেদিন আমার বন্ধুকে বলছিলাম মেরী ভাবী কবয়িত্রী।

অনিমেষ বলল একান্তে : বেণু, ভয় হচ্ছে, নিজের স্বভাবের অতিরিক্ত কিছু করছ না তো?

—না। চেষ্টা করছি, আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিএর। বন্ধুত্বের মত, প্রেমের মত ভালোবাসা ছাড়াও, একজাতীয় ভালোবাসা আছে, প্রীতির-সৌহার্দ্যের। জীবনে সেটাও কম দামী নয়।

আসবার দিনে মনটা ছলছলিয়ে গেল। এই কদিনেই এঁরা আপন হয়ে গেছেন, অনিমেষের বাবা-মা, তার ছোট ছোট ভাই

বোনগুলি। বনানী অনুভব করল, তার ব্যক্তিগত জগৎ আর একটু বিস্তৃতি পেয়ে গেল—একটু বেশী ব্যাপকতা।

কলকাতায় জ্বালা, কলকাতায় যন্ত্রণা। কলকাতা জ্ঞানাঞ্জনশলাকা ছুঁইয়ে দৃষ্টি জাগিয়ে দেয়—রূপকথার সোনার খাটে গা—রুপোর খাটে পা আর রাখা যায় না। পোড়ামাটি। দগ্ধ কলকাতা। হায় কলকাতা, একী দেখালে তুমি? কদিনই মনটা ভালো নেই। শরীরটাও নয়। একটু জ্বরজ্বর ভাব। শুয়েছিল বনানী চিলেকোঠায়। জানুয়ারীর শেষদিন, শীতটাও পড়েছে জাঁকিয়ে। একসঙ্গে ঢুকল জ্যোৎস্না-অনিমেষ। অন্ধকার। আলো জ্বালাল। বনানী উঠতে যাচ্ছিল, জ্যোৎস্না বলল:

—শুয়েই থাক্না, কে আর এসেছে, আমরা বৈ-তো নয়। অনিমেষ মোড়া টেনে বসল। জ্যোৎস্না বিছানাতেই। কপালে হাত রেখে বলল: একটু জ্বর আছে, মনে হচ্ছে।

বনানী দু'জনের দিকেই তাকাল। নির্বাক অনিমেষ, জ্যোৎস্না যদিও কথা বলছে, যেন জোর করে। তার মনে হল, কিছু পরামর্শ করেই একসঙ্গে ঢুকছে ওরা। বিষণ্ণ ওর মন আরো বিষণ্ণ হল।

—জ্যোৎস্না, কী হয়েছে? অনি. কী যেন লুকোচ্ছ তোমরা।

ওদের দু'জনেরি মুখ নত হয়ে গেল। বনানী উঠে বস্ল:

—বলো, কী হয়েছে?

—আজ বিকালে দিল্লীতে গান্ধীজী প্রার্থনা সভা করেছিলেন। জ্যোৎস্না এই পর্যন্ত বলেই থেমে গেল। বনানীর চোখে ভীতি।

—তারপর?

—গর্জে উঠল বন্দুক। মাত্র কয়েকটা গুলী। গান্ধীজী আর উঠলেন না। অনিমেষ শেষ করল। জ্যোৎস্না স্তব্ধ। বনানীও স্তব্ধ। কিছুপরে বনানীর দু'চোখে জলের ধারা নামল।

আর আশা করতেও ভরসা নেই। যে মানুষ দু'টি মানবতার শুচিতা সম্পর্কে, তার ঔদার্য সম্পর্কে যথার্থ শব্দকে ধ্বনিত করে তুলতে

পারতেন, যথার্থ কর্মে দিতে পারতেন আশ্বাস, সেই মানুষ দু'টিই আজ নেই। নেই রবীন্দ্রনাথ, নেই গান্ধীজী।

আবার ওরা ঘিরেছে তার মন। নিরাশারা। বনানী অনিবার্যভাবেই ভেঙে পড়ে। কিছুই করবার নেই মানুষের। কিছু চেষ্টা, বিপরীত স্রোতে নৌকো ভাসাবার মতই। সিসিফাসের পাথর গড়ানো। অথচ কত না ছিল আশা।

বনানী চোখের ওপর দেখতে পায়: বছরের পর বছর ধরে আসা এই মানুষগুলিকে পশ্চিম বাংলার বুকে দাঁড়ানো অখণ্ড বাংলার দুই ভিন্নদেশী পরবাসী। শুধু পশ্চিম বাংলায় নয়, ছড়াতে ছড়াতে আসাম, ত্রিপুরা, বিহার, ওড়িশা, মধ্যপ্রদেশ। কিছুটা বিশ্বাসে, বৈরীতায়। বুভুক্ষু, বেকার। কাজ চাইবে, শ্রম। কিছুটা পাবে, অনেকটাই পাবে না। শ্রম না পেয়ে পেয়ে শ্রমের মর্যাদা হারাবে। সম্মান-সম্ভ্রম-পরিচয় হারিয়ে কোথায় দাঁড়াবে কে জানে? যে শুচিতা বাঁচাতে পাগল হয়ে ছুটে আসছে মেয়েরা, একদিন সেই শুচিতাকেই হয়তো বাজী ধরবে পাশার দানে। হয়তো এদেরি বোনেরা, এদেরি মেয়েরা। এদেরি ভায়েরা এদেরি ছেলেরা সুস্থ জীবন পাবে না—শ্রম না পেয়ে শ্রমকেই ঘৃণা করবে প্রকৃতির পরিহাসে। নতুন প্রজন্ম, শতশত হাজার হাজার পুষ্পে পুষ্পিত না হয়ে, হয়ে যাবে কাঁটার জঙ্গল। আর একদিন এই জঙ্গল সাফের জন্যে—

—বেণু। অনিমেষ নাড়া দিয়ে জাগাল।

—দুঃস্বপ্ন দেখেছিলে? ঘুমের ঘোরেই চেঁচিয়ে উঠেছিলে, এমন তো করো না তুমি!

বনানী বেরিয়েছিল পথে। পথটা বালুতে ভরা। দূরে দেখা যাচ্ছে বনরাজিনীলা, তারও পিছনে তুষারাবৃত পাহাড়। যে পাহাড় নয় শুভ্রতুষার কিরীটিনী, সে পাহাড় টানে না তাকে। পার হতে হবে এইসব মরুপথ, বালুপাহাড়। হ'তে হ'তে সূর্য অস্ত গেল। হঠাৎ অন্ধকার। উপর থেকে অন্ধকার, অন্ধকার উঠে আসছে নিচের থেকে। অন্ধকার ডাইনে-বাঁয়ে, সামনে-পিছনে। ঘিরে ধরেছে। হঠাৎই

কোথা থেকে ফুঁড়ে উঠল অগ্নিগিরি। মুখব্যাদান করে ধরল। জ্বলছে, ধোঁয়াচ্ছে টগবগিয়ে ফুটছে। পালিয়ে আসবে—সমস্ত অন্ধকারগুলো ডাইনে-বাঁয়ে, সামনে-পিছনে। হঠাৎই হয়ে গেল অগ্নিগিরি—আগুন নাচতে লাগল; আগুনের বিস্তৃত আলিঙ্গন—ঝলসে যাচ্ছে বনানী, পুড়ছে—বনানী আর্তনাদ করল।

বনানী উঠে বসেও হাঁফাচ্ছে। অনিমেষ একগ্লাস জল গড়িয়ে আনল। অনিমেষ কিছুটা বুঝল, কিছু বুঝল না। বুঝল বেণুর বড়ো জ্বালা। জলের গেলাস নিজের হাতেই রেখে বলল সস্নেহে—

—জল খাও, বেণু।

মরুবালুতে ঘোরা তৃষ্ণার্ত বেণু, নেতিমুখ অগ্নিদাহে ঝলসানো গেলাসে ঠোঁট ডোবালো।

সে রাতে অন্ধকার নিবিড় হয়ে এলো। শেষ বাস চলে গেল। শেষ ট্রামও গেল ঘন্টি বাজিয়ে। নিঃশব্দ, নির্জন অন্ধকার ঘরে স্তব্ধ পা রেখে দাঁড়াল নীরবতা। রাতপাখীও ডাকছে না। এমনকি আমগাছটার পল্লবেও মর্মর নেই। অন্ধকারে সকলেই যে যার শয্যায় ঘুমিয়ে। প্রতুলচন্দ্র-মায়ালতা, শরৎকুমার-সুধাময়ী, জ্যোৎস্না, হিমানীশ। বেণুর চোখে ঘুম নেই। আর ঘুম নেই অনিমেষের। সে দেখছে বিছনায় শুয়ে বনানী কোন এক অব্যক্ত যন্ত্রণায় আর্ত। তার সমস্ত চুল খোলা। হয়তো বা সমস্ত মুখ নীল।

অনিমেষ প্রত্যক্ষ করেছে বনানীর মধ্যে দুই মিশ্রক্রিয়া। হিউম্যানিটি, মানবতা, মানুষের সুখ-মঙ্গল-শান্তি, ছুটে যেতে চেয়েছে কংক্রীট, প্রস্তর-মৃন্ময় সব কর্মের, ঘর্মের জগতে একটা পর্যায়ে পৌঁছবার আগেই আবার ফিরে এসেছে তার মন, অ্যাবস্ট্রাক পারিজাত-আনন্দে, মন্ময়ের গভীর রহস্যের গহনে। কিন্তু, যন্ত্রণ অভিজ্ঞতা তার। পারছে না, একটি নিটোল বৃত্ত রচনা করতে ঐ মুখের সম্মেলনে। যা তার সাধ।

একসময় বনানী ভাঙাগলায় বলে উঠল :